কিশোর গ্রন্থাবলী

= তৃতীয় খণ্ড =

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

কিশোর গ্রন্থাবলী

—তৃতীয় খণ্ড—

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীসরোজনাথ সরকার, এম্‌-এ. বি-এল্‌.
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ছেপেছেন :
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য : **আড়াই টাকা**

সূচী পত্র

কামানের মুখে নানকিঙ ... ... একের পৃষ্ঠা
প্রলয়ের পথিক ... ... একশো পঁচিশের পৃষ্ঠা

১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই চীনদেশে জাপানী অভিযান সুরু হয়। তার সমাপ্তি ঘটে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্র পক্ষের কাছে জাপানের পরাজয়ে। এই উপন্যাস দু'খানি সেই যুদ্ধেরই আলেখ্য।

গল্প দুটি লিখেছিলাম ১৯৩৮-৩৯ সালে, তখনও মিত্রপক্ষের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধেনি। কোন পক্ষপাত নিয়ে লেখা নয়। বিভিন্ন বই থেকে যে সব উপকরণ সংগ্রহ করেছি, তাই মাঝে মাঝে সন্নিবেশ করেছি, তা থেকে লেখকের মতামত বিচার করলে ভুল হবে।

বিশ্বভারতীর চীনাভবনের পরিচালক শ্রদ্ধাস্পদ সুপণ্ডিত অধ্যাপক তান-য়ুণ-শান্ প্রথম বইখানির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন,—তার বাংলা অনুবাদ করে মূল বক্তব্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিনি, আসল ইংরাজী লেখাটাই প্রকাশ করলাম। যে সব চীনা শব্দ ব্যবহার করেছি, তা'ও তাঁর কাছ থেকেই নেওয়া। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।


কামানের মুখে
নান্‌কিঙ্‌
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

FOREWORD

Great work always results from great happenings and will itself produce great consequence in its turn.

The present Sino-Japanese war will not only be a great landmark in the history of China but also an epic event in the history of the whole world. It affords splendid materials not only for historians, but for writers and poets as materials for poetry, drama and novels as well.

I, being a Chinese by nationality, have naturally been grateful to the Indian friends for their spontaneous sympathy and generous help of all sorts, spiritual and material, and specially for encouragement; for such encouragement is of even more value to China than airplanes, artillery, ammunition or any other material aid.

And as China is not merely fighting for her own freedom but also for the peace and justice of mankind; so the sympathy and help of India is not only an act of friendship to China but also a vindication to the world of her belief in peace and human justice.

I am so glad that besides the noble voice of the great poet Rabindranath Tagore, and the just condemnation of all the great Indian national leaders, of the Japanese barbarous and brutal atrocities in China, there are poets and writers like Sree Dhirendralal Dhar who has written two books based upon the Sino-Japanese war. The first one is a story book, named 'Mahá-Chiney-Mahá-Samar,' or the great war in great China. The second book is a novel, entitled 'Kámáner-Mukhey-Nanking' or the battle of Nanking.

Sree Dhirendralal Dhar has kindly asked me to write a foreward to his second book. I have acceded to his request with pleasure and gratitude.

The story relates the adventures of four young Indians, three young men and a girl, who went to China as newspaper-reporters. We are shown the impact of the war on China through their eyes, first as civilians and later as members of the Chinese army, and a story of personal adventure is worked out against the background.

The novel has been published in instalments in a magazine and has been much appreciated by the public already. It is now being published in book form. I am sure that those who have already read the magazine will be interested in reading it again, and those who have not seen the magazine will not miss the chance of this pleasure.

It is rather difficult for me to express my deep appreciation and enthusiasm in adequate words. I sincerely wish the writer and his work all success. At last, I hope through such work as Sree Dhirendralal Dhar's the mutual understanding and aid and relationship between the two great nations, India and China, will become closer and closer so as to be of lasting benefit to the world.

—Tan Yun Shan

শব্দার্থ

'চাং-হ্বা-মিন্-কুও' = 'চাং-কুও'—চীনদেশ, 'মিন্'—লোক, 'হ্বা'—গৌরব ; = 'চাং-হ্বা-মিন্-কুও'—চীনবাসীর জয় বা জয়তু মহাচীন, ইংরাজীতে যাকে বলে Long live China.

'নি হাউ'—শুভমস্তু ; 'নি'—তুমি, 'হাউ'—কুশল ; আমাদের নমস্কারের মত।

'তুংচি'—কমরেড ; 'তুং'—সম, 'চি'—ভাব।

'কিউৎজু'—শয়তান।

'বানজাই দাই নিপ্‌পোঁ'—জাপানী মহিমা দীর্ঘজীবি হোক।

'টি জেন'—শত্রু।

'জি পান'—জাপান, 'জি-পান-জেন'—জাপানী, 'তা'—ফেলো, 'তাও'—নীচে, 'তা-তাও-জি-পান-জেন—জাপানীরা ধ্বংস হোক।

'শুই'—জল।

'ওয়েউচাং'—মিঃ প্রেসিডেণ্ট।

'চাংস্থয়েলিঙ'—জেনারেলিসিমো।

'কুও-মিন-টাং'—চীনের জাতীয় দল ; ডাঃ সান ইয়াং সেন এই দলটী গড়ে তোলেন, রুশ উপদেষ্টা বোরোডিন এর পুনর্গঠন করেন, চিয়াং কাইসেক ছিলেন এর কর্ণধার। চীনদেশে সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করাই এই দলটীর নীতি।

'সান-মিন-চু-আই'—ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের নির্দেশিত চীনাদের জাতীয় উন্নতি বিধানের জন্য তিনটী নীতি : জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও অন্নসংস্থান।



সকালবেলা সরোজ খবরের কাগজ পড়ছিল ঃ

আনন্দবাজার পত্রিকায় সেদিন চীনের লাল-ফৌজ, অষ্টম 'রুট আর্মির' অধিনায়ক কমরেড্‌ 'চু-টে'র একখানি দৃপ্ত ছবি ছাপা হয়েছে, আর তারই সঙ্গে বেরিয়েছে তাঁর একখানি চিঠি।

চিঠিখানি কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলালকে লেখা।

বড় চিঠি।—

দুর্দান্ত জাপানীরা কি ভাবে নিরীহ সহরবাসীদের উপর রাত্রির অন্ধকারে বোমা ফেলছে, বাড়ীর পর বাড়ী লুঠ করছে, আগুন জালিয়ে দিচ্ছে, শান্তিপ্রিয় বাসিন্দাদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করছে, ছেলে-মেয়ে-শিশু নির্বিচারে হত্যা করছে, মহীচীনকে কি করে মহাশ্মশান করে ফেলছে, তারই করুণ কাহিনীতে চিঠিখানি ভরা।

কমরেড্‌ চু-টে লিখেছেন ঃ যুদ্ধের ফলে আজ অসংখ্য নারী ও শিশু অসহায় ও গৃহহীন। এমন প্রচণ্ড শীতের দিনে তাদের গায়ে আজ এক টুকরো শীতবস্ত্র নেই, সব দিন তাদের দুমুঠো আহারও জোটে না। আর্ত ও আহতদের ঔষধ ও পথ্যের একান্ত অভাব। মহাচীনের এই মহা-দুর্দিনে ভারতের কাছ থেকে সে চায় সাহায্য, চায় সহানুভূতি। ভারতীয় ডাক্তার, নার্স, স্বেচ্ছাসেবক ও সৈনিক,

হিন্দুস্থান থেকে পাঠানো ঔষধ ও পথ্য তিনি সানন্দে গ্রহণ করবেন। মহাচীনে আজ উদ্ধত জাপানকে প্রতিহত করার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। চীনের বিপদে আজ সমগ্র এশিয়ার বিপদ। ধনলোলুপ জাপান আজ যদি চীন জয় করতে পারে, কাল সে হিন্দুস্থানের দ্বারে গিয়ে হানা দেবে, তারপর সে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়বে এশিয়ার একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত। আজ তাই জাপানের সেই সর্বগ্রাসী অভিযানের প্রারম্ভে সমগ্র এশিয়া-বাসীর কর্তব্য একযোগে জাপানকে প্রতিহত করা।···

সবশেষে কমাণ্ডার চু-টে জানিয়েছেন ঃ ৯ই জানুয়ারী তারিখে 'চীনদিবস' পালন করে হিন্দুস্থান তাদের প্রতি যে সহানুভূতি জানিয়েছে, সেজন্য চীনারা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাক্‌বে।

সরোজ বললে—মনে হচ্ছে চলে যাই, চমৎকার এড্‌ভেঞ্চার কিন্তু। গুম্ গুম্ করে বোমা পড়বে, কামান গর্জাবে, ধোঁয়া আর ধূলোয় দৃষ্টি ঢাকা পড়ে যাবে, প্রতি মুহূর্তে জানতে পারবো এখনও বেঁচে আছি।

ডেভিড বললে—লড়াই করতে যাবে ?

—না না, লড়াই দেখতে।

—শুধু দেখতে নয়, যারা দেখেনি তাদের দেখাতে—বলে সকলকে সচকিত করে দিয়ে এক যুবক এসে ঘরে ঢুকলো।

আগন্তুককে স্মিত হাস্যে অভিনন্দিত করে সরোজ বললে—কি রণজিৎ সিং, এদ্দিন কোথায় ছিলে ?

—ছিলোম এই সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা ভারতবর্ষেই। তবে এদ্দিন এখানে আসার প্রয়োজন হয়নি বলেই আসিনি, আজ দরকার হয়েছে এসেছি—বলে রণজিৎ একখানি সোফার উপর ঝুপ্ করে বসে পড়লো।

—দরকারটা কি একবার শুনতে পাই না ?—সরোজ জিজ্ঞাসা করলে।

—নিশ্চয়ই। তোমাদের দু'জনকেই আমার সঙ্গে চীনদেশে যেতে হবে।

—কারণ ?

—প্রথম কারণ, আমার একা যাওয়া ঠিক হবে না; একে যুদ্ধক্ষেত্র তার উপর বিদেশ, দু'একজন সঙ্গী থাকা ভাল। দ্বিতীয় কারণ, সঙ্গী হওয়া চাই কৌশলী, বুদ্ধিমান, দুঃসাহসী ও শক্তিমান। সেদিকে থেকে তোমাদের দু'জনের দাবীই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। তৃতীয় কারণ, এইমাত্র নেপথ্যে শুনলাম তোমরা যাব-যাব করছ, একটা উপলক্ষ্য হলেই যেতে পার, আমিই সেই উপলক্ষ্য

হলেম। চতুর্থ কারণ, আমি তোমাদের পুরানো বন্ধু, ফ্রান্সের ট্রেঞ্চে বহুদিন দুজনে পাশাপাশি লড়েছি, তোমাদের উপর আমার দাবী আছে। পঞ্চম কারণ···

ডেভিড বললে—থাক্ থাক্, আর কারণ দরকার নেই, কিন্তু উদ্দেশ্য ?

—উদ্দেশ্য ছবি তোলা, তার দ্বারা অর্থ উপার্জন ও খ্যাতিলাভ। বিলিতি কোম্পানীর সঙ্গে হাজার পাউণ্ডের চুক্তি করেছি, নতুন ক্যামেরা কিনেছি, যুদ্ধের ফিল্ম তুলবো। খবরের কাগজওয়ালাদের সঙ্গেও কথা বলেছি, দু'পাঁচখানা ছবি ও এক এক টুকরো খবর পাঠালে তারাও টাকা দেবে। সব ঠিক, এখন শুধু তোমাদেরকে সঙ্গী পেলেই পাস্‌পোর্টের জন্য দরখাস্ত করি।

—কিন্তু আমাদের যাবার যে একটা বড় বাধা আছে তা তুমি জান ?

—কি বাধা একবার শুনি।

—আমার এক বোন আছে, তাকে কোথায় কার কাছে রেখে যাব ?

—কেন, এই বাড়ীতে রেখে যাবে। এমন কলকাতা সহর, ঝি চাকর দারোয়ান রেখে দিব্যি থাকবে।

—কিন্তু জানতো, আমাদের অনেক শত্রু, একবার সুবিধা পেলে হয়, সব ওঁৎ পেতে বসে আছে। বোনকে একা রেখে যাওয়া কি ঠিক হবে !

—বেশ, তবে সঙ্গেই নিয়ে চল। সেখানে আহতদের সেবাশুশ্রূষা করবে, নাম হয়ে যাবে—

শেষ পর্যন্ত সরোজদের যাবার কথা পাকা করে রণজিৎ সেখানে থেকে উঠলো।

কদিন পরের কথা।—

জাহাজ চলেছে। পিছনে দুটি ফেনিল তরঙ্গের রেখা টেনে জাহাজ অগ্রসর হচ্ছে। শিবপুরের বাগান ছাড়িয়ে, সাগর পয়েণ্টের বাতিঘর ছাড়িয়ে, ডায়মণ্ড-হারবারের পুরানো কেল্লা ছাড়িয়ে, সন্ধ্যার আবছায়ায় জাহাজ সাগরে এসে পড়লো। এতক্ষণ যে শ্যামল মাটী, সবুজ গাছপালার ফাঁকে দু'পাঁচখানি খড়ো ঘর, দু'একটী লোককে চোখে পড়ছিল, সাগরের জলরাশি ধীরে ধীরে সে-সব মুছে দিল, সব জলময় হয়ে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে, সামনের সীমাহীন জলরাশির পানে দৃষ্টি ছেড়ে দিয়ে ডেক-চেয়ারে সরোজরা বসেছিল।

মাথার উপর স্নিগ্ধ চাঁদ দীপ্তিময় হয়ে উঠলো। ফ্যাকাশে আকাশে চারিপাশের বিবর্ণ অন্ধকারের পর্দা ঠেলে, জ্যোৎস্না-মাখা ফিকা নীল আভা ফুটে উঠলো। নীচে

কালো জলের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চাঁদ নেচে উঠলো। আকাশের টুকরো টুকরো মেঘের গায় ফুটে উঠলো পেঁজা তুলোর শুভ্রতা। মৃদু দমকা হাওয়া স্নেহের পরশ বুলিয়ে যেতে লাগলো। জাহাজ দুলে দুলে উঠছে। স্তব্ধ রাত্রে ঘস্ ঘস্ করে মেশিনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু জাহাজ চলছে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, সামনেও যেমন সীমাহীন জল, পিছনেও তেমনি জলরাশির সীমা হারিয়ে গেছে। উপরে মাস্তুলের মাথায় চার-পাঁচটী গাঙ্‌চিল একান্ত নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। ওদিকে সার্চলাইটের আলো ফেলতে ফেলতে তট-রক্ষী একখানি যুদ্ধজাহাজ চলে গেল। এই জাহাজের আলোর আভায় মানোয়ারী জাহাজের ডেকের উপর রক্ষিত কামানের বড় বড় নলগুলি স্পষ্ট দেখা গেল। সামনে দিগ্বলয়ের কোলে সেটা যেমন ভেসে উঠেছিল, পিছনের দিক্‌সীমার অন্ধকারে তেমনি মিলিয়ে গেল। সরোজদের জাহাজ চলতে লাগলো।

সরোজ, ডেভিড ও আয়েষা চুপ করে বসেছিল। তাকিয়েছিল সামনের পানে। আকাশ ও সাগর যেখানে গিয়ে মিশেছে, তার পিছনে পৃথিবী ছাড়িয়ে আর কোথাও যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছিল। তারা দেখছিল জোছ্‌না-ভরা আকাশের প্রতিটি তারাকে, দমকা বাতাসে অনুভব করছিল প্রতিটি ঢেউয়ের ঝাপ্‌টাকে। অনন্ত রহস্যময় জল, অসীম রহস্যময় আকাশ। ভাবছিল, আজকের ওই আকাশ এই সমুদ্র যেমন ভাবে তাদের চোখে ধরা দিয়েছে, তিন হাজার বছর আগে বিজয়সিংহের সিংহল যাত্রার সময়েও এর রূপ এমনিই ছিল, এমনি অ-কথিত রহস্যভরা, এমনি অসাধারণ। আর এই তিন হাজার বছরের মধ্যে মাটির বুকে কত ঝড়, ধ্বংস, বিদ্রোহ ও আবর্তনের রক্তাক্ত ইতিহাস রচিত হয়ে গেল।

প্রথমে কথা বললে আয়েষা, বললে—এমনি ভাবে চুপ করে বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না, কেবিনে গিয়ে একটু গল্পের বই পড়িগে।

সরোজ বললে—আমাদের তো বেশ ভাল লাগছে আয়েষা দেবী।

—আমার তো চোখ চাইতে ইচ্ছা করছে না, তবে আপনারা যদি কবি হন আপনাদের কথা আলাদা।

—মানুষ মাত্রেই কবি, আয়েষা দেবী,—সরোজ বললে—তবে কেউ কবিতা লেখে কেউ লিখতে পারে না। এই সাগর আর ওই আকাশ কোন দিনই পুরাণো হবে না, আজও ওর রহস্য নিয়ে কত বড় বড় বৈজ্ঞানিক রাতের পর রাত মাথা ঘামাচ্ছেন। ওদের অসীমতার পিছনে আছে ঈশ্বরের সবচেয়ে বড়

ইঙ্গিত : ওই আকাশের শূন্যতার মতই জগতের সব কিছুই ফাঁক', সব আড়ম্বর ও বাহিরের সৌন্দর্য একদিন ওই আকাশের মতই শূন্য ও বিবর্ণ হয়ে যাবে। আর এই অতল সাগরের নীচে কত মণিমুক্তা, কত সম্পদ যেমন ঢাকা পড়ে আছে তেমনি মানুষের সভ্যতা ও নিষ্ঠুরতার সব ইতিহাস অনন্ত কালের বুকে ঢাকা পড়ে যাবে।

আয়েষার তার্কিক বুদ্ধিটা জেগে উঠলো, বললে—কিন্তু ইতিহাস তো আজও রয়েছে।

—সে ক'দিনের ইতিহাস ?—সরোজ বললে—তিন হাজার বছর আগে কি হয়েছিল আমরা আজ কি তা জানি ? আজকের ইতিহাস কি ঠিক করে বলতে পারে বেদ কতদিন আগে লেখা হয়েছিল, কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সত্যই যুদ্ধ করেছিল কি না, সে যুদ্ধের প্রারম্ভে সত্যই শ্রীকৃষ্ণ বলে কেউ গীতার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন কি না ? বিক্রমাদিত্যের সভায় একই সময়ে নবরত্নের ন'জন পণ্ডিত ছিলেন কি না ? দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার কত লক্ষ লোককে হত্যা করে কত লক্ষ বন্দীকে ক্রীতদাস করে গ্রীসে বিক্রী করেছিল, আজকের ইতিহাস তার হিসাব দিতে পারে কি ?

ডেভিড বললে—যাক সরোজ, ওসব তত্ত্বকথা এখান থাক, আয়েষা তুমি এখন একটা গান গাও দিকি—

আয়েষা চারিপাশে একবার তাকিয়ে নিলে, কাছাকাছি লোকজন কেউ নেই দেখে স্বর ধরলো—

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ,
সেদিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি
বন্দিল সবে জয় মা জননী, জগত্তারিণী, জগদ্ধাত্রী,
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ
গাহিল জয় মা জগন্মোহিনী, জগজ্জননী, ভারতবর্ষ—

আয়েষার মিষ্ট গলা সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় মধুরতর হয়ে উঠলো।

আলাপ ঘটলো আকস্মিক ভাবে।—

ভোরের আলো-আঁধার-ঘেরা সাগরের বুকে একখানি চলমান জাহাজের ছবি নেবার জন্যে রণজিৎ ক্যামেরা ঠিক করছে এমন সময় অতর্কিতে একটি

লোক পা পিছ্‌লে একেবারে রণজিতের গায়ের উপর এসে পড়লো, রণজিৎও পড়ে গেল, সামান্যের জন্য তার ক্যামেরাটি রক্ষা পেয়ে গেল, আর একটু হলেই ক্যামেরাটি টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

উঠে পরিচ্ছদের ধূলা ঝেড়ে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি রণজিতের কাছে এসে ক্ষমা চাইল—সরি মিষ্টার, ভেরী সরি !

সকলেই লোকটির মুখের পানে তাকালো। ভদ্রলোক চীনা কি জাপানী, নাহলে শ্যামদেশীয়। বয়স হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বিত্তশালী বলে মনে হয়।

ভদ্রলোক অত্যন্ত কিন্তুভাবে রণজিৎকে আবার বললে—আপনার খুব লেগেছে মিষ্টার, সরি !

কেসের মধ্যে ক্যামেরাটি রাখতে রাখতে চোখ না তুলেই রণজিৎ বললে—না না, ও তেমন কিছু নয়।

অথচ তখনও রণজিতের একখানি পা ব্যথায় টন্ টন্ করছিল।

—আমি এজন্য সত্যই বড় লজ্জিত, মিষ্টার রণজিৎ সিং।

রণজিৎ সিং ! রণজিৎ বিস্ময়ে ভদ্রলোকের মুখের পানে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি আমার নাম জানলেন কি করে ?

—খবরের কাগজ থেকে। কালকের কাগজে আপনাদের ছবি বেরিয়েছে, খবরের কাগজের রিপোর্টার হয়ে আপনারা চায়নীজ ফ্রণ্টে যাচ্ছেন, তাই না ?

সরোজ বললে—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বললেন—আমিও যাচ্ছি চীনদেশে। চীন আমার মাতৃভূমি। আপনারা সাংহাইয়ে নাব্‌বেন তো ?—ওইখানেই আমার বাড়ী। অবিরাম সেখানে বোমা ও গোলা পড়ছে। প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই এদ্দিনে পালিয়ে গেছে। আমিও যাচ্ছি, দেখি আত্মীয়-স্বজনের কি ব্যবস্থা করতে পারি। আপনারা যখন সেখানেই যাচ্ছেন, যাবেন আমার বাড়ীতে, আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ করছি।

এক মিনিটে নিজের পরিচয় দিয়ে বিদেশী অপরিচিতকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে বসলো, লোকটির সরল আন্তরিকতা সরোজের ভাল লাগলো, বললে—বেশ, যাব'খন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ যাবেন ! মিষ্টার রণজিৎকে যেভাবে আঘাত দিয়েছি, আপনারা আমার বাড়ীতে যদি অতিথি হন, তবু মনে কিছু শান্তি পাব !

ডেভিড হেসে বললে—সে শান্তি পেতে এখনও অনেক দেরী আছে। জাহাজ সাংহাইয়ে গিয়ে লাগবে, তবে তো ?

রণজিৎ বললে—তদ্দিনে জাপানীরা হয়তো সাংহাইকে মাঠ করে দেবে।

—মাঠ করে দেবে?—কখনই নয়! তা হতেই পারে না!—ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন—কমরেড্ চু-টেকে জানেন তো, আর তাঁর অষ্টম রুট্ আর্মি? তারা থাকতে চীন জয় করা জাপানের পক্ষে সম্ভব হবে না। সেদিনকার জাপান সে কি-না আজ চীন দেশ জয় করবে—বলতে বলতে ভদ্রলোক ওদিকে রেলিংয়ের ধারে চলে গেলেন।

সরোজ বললে—ভদ্রলোক বোধ হয় আমাদের কথা শুনে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, যেভাবে চলে গেলেন—

রণজিৎ বললে—ক্ষুণ্ণ হওয়া দরকার। আমায় যে মিষ্টি আছাড়টী খাইয়েছেন, ক্যামেরাটা তো আরেকটু হলে ভেঙ্গেছিল আর কি!

—সে তো আর ইচ্ছা করে নয়, দৈবাৎ পড়ে গেলে কি করবে!—

—নেহি বাবুজী, আপ্‌লোক্ আদ্‌মি পছন্তা নেহি!

পিছনে হিন্দি কথা শুনে সকলে সচকিত হয়ে উঠলো, কে কথা বললে দেখবার জন্য দৃষ্টি ফেরাতেই চোখে পরলো কাছেই এক চীনা খালাসী একটি কাছি লোহার চাকায় গুটিয়ে রাখছে। একজন চীনা যে অমন পরিষ্কার হিন্দি বলবে তা তো মনে হয় না, তথাপি সরোজ একবার জিজ্ঞাসা করলে—আপ্ বাৎ করতে হো বাবু সাব?

খালাসীটী সরোজের কথা বুঝতে পারলো না, কোন উত্তরও দিল না।

সরোজ সন্দিগ্ধ চোখে চারিপাশে তাকালো। কাছাকাছি কেউ নেই। এক নম্বর ডেকে দুটি সাহেব বসে সিগারেট ফুঁকছে। মার্কনি ডেকের উপর বেতার চালককে দেখা যাচ্ছে, দুটি খালাসীকে হাত নেড়ে কি বুঝিয়ে দিচ্ছে। দু'নম্বর ডেকে কজন যাত্রী গল্প করতে করতে বেড়াচ্ছে। ওধারে সেকেণ্ড ক্লাশ কেবিনের সামনে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সেই চীনা ভদ্রলোক।

আয়েষা বললে—তাহলে কে কথা বললে?

সরোজ বললে—ওই খালাসীটাই বলেছে। ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে।

চিন্তিত মুখে সকলে কেবিনের দিকে অগ্রসর হোল।

ঢেউয়ের মাথায় দুলে দুলে নীল জলের বুকে জাহাজখানি এগিয়ে চলে পিছনে শাদা ফেনার রেখা টেনে আকাশের বুক চেরা ধূমকেতুর মত। চারিপাশে শুধু নীল আর নীল। দিগ্বলয়ের রেখাটি পর্যন্ত দূর দূরে সরে যায়। উন্মত্ত দানবের

মত ছোট-বড় ঢেউগুলি ছুটে আসে, ধাক্কা দেয় জাহাজের গায়, সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে জাহাজখানির চারি পাশ ঘিরে নাচতে থাকে, তারপর প্রপেলারের আঘাতে আঘাতে ফেনিল শুভ্রতার পিছনে হারিয়ে যায়। আবার নতুন ঢেউ এসে আঘাত করে। হেলে দুলে খিল্ খিল্ করে জাহাজখানি যেন হেসে ওঠে, সে-ঢেউকেও পিছনে রেখে এগিয়ে যায়। সমুদ্র ফোঁস ফোঁস করে ওঠে, আকাশের পানে ঢেউগুলি মাথা তুলে দাঁড়ায়, ভগবানকে যেন বলে—শক্তি দাও প্রভু, আরো শক্তি দাও, দাম্ভিক মানুষের এই ছোট্ট জাহাজখানির ঔদ্ধত্য আর সয় না! সর্বশক্তিমান ভগবান সে প্রার্থনা শুন্‌তে পান কি না জানি না, কিন্তু ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের জাহাজ তেমনি হেলে দুলে অহঙ্কারে এগিয়ে চলে। ক্ষিপ্ত সাগর ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের আঘাত দিতেও ছাড়ে না।

সরোজ সাগরের পানে তাকিয়ে থাকে। চির-উদ্দাম অনন্ত-নীল এই জলরাশি মানুষকে চিরদিন বিস্মিত মুগ্ধ করেছে, আজও রূপবিলাসী মানুষের চোখে তা মহীয়ান হয়ে ধরা দেয়!

রাত্রে চারিপাশ অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। নীল জলে আর নীল আকাশে শুধু ঘন অন্ধকার। সারি সারি দীপ্যমান তারা। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। জাহাজের সার্চ লাইটের আলো সে কালোর বুকে একটা রূপালী তীরের মত দেখায়। চারিপাশে রহস্যময় অবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতা, মাঝে একখানি শব্দমান জাহাজ—বিশ্বের সুরে একটা ছন্দপতন।

পূরো দশটী দিন সাগর দোলায় দোল খেতে খেতে জাহাজ পেনাংয়ে এসে পৌঁছালো।

জর্জ-টাউন সহরটাই পেনাং দ্বীপের সর্বস্ব।

ছবির মত সহর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অর্ধেকটা সহর ঢালু হয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। অনেকটা চট্টগ্রামের মত। নিঃশব্দে চলাফেরা করার জন্য পথ রবার দিয়ে ঢাকা।

এখানকার বেশীরভাগ বাসিন্দাই চীনা।

বিদেশীদের দেখার মত অনেক কিছুই এই সহরে আছে। তার মধ্যে 'আয়ার-ইতম্' মন্দিরই বিখ্যাত। তিব্বতী ধরণের অপূর্ব কারুকার্য করা এই মন্দিরটী বিদেশীর চোখে বিশেষ শ্রদ্ধা জাগায়।

জর্জ-টাউনের বিশ্ববিখ্যাত মন্দির হচ্ছে সর্পমন্দির। বিদেশী সেখানে ঢুকেই ভয়ে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায়, হাজার হাজার বিষধর সাপ সেখানে নিশ্চিন্ত মনে পড়ে

আছে। এতটুকু ফোঁস্ ফোঁস্ করে না, মানুষ দেখলেই ফণা তুলে মাথা দোলায় না, মানুষের সাড়া পেলেই চমকে ওঠে না, একান্ত আরামে তারা পড়ে আছে! পুরোহিতেরা তাদের গায়ে হাত বুলায়, হিংস্র বিষধর আনন্দে এলিয়ে পড়ে। অহিংসা ও প্রেম হিংস্রতা ও ক্রোধকে জয় করেছে।

সব দেখে শুনে ক'ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রীরা জাহাজে ফিরে এল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে জাহাজ আবার চলতে স্বরু করলো।—

রাত বেশী হবে না। ঢেউয়ের দোলায় দোল খেতে খেতে যাত্রীর দল সবেমাত্র তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, এমন সময় একটা আর্ত চীৎকার সকলকে সচকিত করে দিলে। সরোজেরও তন্দ্রা টুটে গেল।

আবার সেই আর্তনাদ!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সরোজ লাফিয়ে উঠলো, কেবিনের দরজা খুলে তরতর করে নীচে নেবে গেল।

নীচে আয়েষার কেবিন! কেবিনের দরজা খোলা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আয়েষা থর থর করে কাঁপছে। চোখে আতঙ্ক। মুখে এতটুকু রক্ত নেই।

সরোজকে দেখে আয়েষা যেন সাহস পেলে, বলে উঠলো—সরোজদা, ভূত ভূত !!

—ভূত!—সরোজ বিমূঢ় হয়ে গেল।

সেখানে তখন একে একে অনেক যাত্রী এসে জড়ো হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে ডেভিড বললে– ভূত, মানে প্রেতাত্মা ?

হাঁপাতে হাঁপাতে আয়েষা বললে—হ্যাঁ। একটা মড়ার মাথা পোর্টহোল্ দিয়ে আমার কেবিনে ঢুকেছিল। তার চোখদুটো কী ভীষণ!

আয়েষা থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

—ওঃ তুমি একটা স্বপ্ন দেখেছ, তাই বল!—বলে আয়েষাকে আর কিছু বলার অবসর না দিয়ে সমবেত কৌতূহলী লোকদের পানে তাকিয়ে সরোজ ইংরাজীতে বললে—ভদ্র মহোদয়গণ, আমরা সবে আবিসিনিয়া থেকে ফিরেছি, যুদ্ধের বীভৎসতা আমার বোন এখনও ভুলতে পারেনি। তারই ফলে মাঝে মাঝে সে এমনি বিশ্রী স্বপ্ন দেখে চমকে উঠে; এবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। রাত্রে আপনাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য আমি দুঃখিত, আশা করি আমার বোনের মনের অবস্থা বুঝে আপনারা তাকে ক্ষমা করবেন! (আয়েষার পানে ফিরে বললে) আমার কেবিনে চল, একটা ঘুমের ওষুধ দিইগে—

একটি বোমা ফেললে। কয়েকখানি বগীতে আগুন ধরে গেল। বন্দরের ওদিকে পিঁপড়ের সারির মত দেখা গেল জাপানী ইয়ুনিফর্ম।

নীচে থেকে দু-একটা কামানের গোলা এবার দু' একখানি প্লেনের পাশ দিয়ে ধূমকেতুর মত আকাশের বুকে ছুটে যেতে দেখা গেল।

রোমানফ্ আদেশ দিলেন—পাঁচ হাজার মিটার উপরে ওঠো···

উপরে উঠতে উঠতে নীচের অগ্নিশিখাগুলি ক্রমশঃই ছোট হয়ে গেল, সরোজের মনে হোল কে যেন দীপালীর আলো দিয়ে সাংহাই বন্দরটা সাজিয়ে দিয়েছে।

রোমানফ্ সুর ধরলো—ট্রালা—লালা—লা—

ফাতু গান ধরলো—জাগো,- জাগো

মহাচীন ওঠো জাগি
নবজীবনের লাগি—

বাকী প্লেনগুলি থেকে সমস্বরে প্রতিধ্বনি ভেসে এল—

নাহি ভয়, নাহি ভয়—
হবে জয় · নিশ্চয়
হবে আমাদের জয়
জয় জয়—জয়!

জাপানী প্লেনের লাল আলোগুলি ক্রমশঃ কাছাকাছি হয়ে আসছে।

তাদেরকে আরো কাছাকাছি আসার সুযোগ দিয়ে সহসা কোন একসময় রোমানফ্ আদেশ দিলে—নীচের প্লেনগুলির উপর মেশিন-গান চালাও—

গুম্ গুম্ করে আওয়াজ শোনা গেল, নীচের জাপানী প্লেনগুলির উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল, চার পাঁচখানি তখনি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে নীচের দিকে পড়ে গেল, বাকীগুলি ছড়িয়ে পড়লো ইতস্ততঃ।

রোমানফ্ এবার আদেশ করলেন – ফিরে চল।

দিক নির্দেশ করার জন্য সার্চলাইটের একটা জোর আলো ফেললো পশ্চিম দিকে। চীনা পাইলটরা সেই আলোর রেখা ধরে প্লেন ছোটালো সেই দিকে। ইতিমধ্যে কোথা থেকে একটা মেশিনগানের গুলি এসে রোমানফের প্লেনের প্রপেলারটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। রোমানফ্ চমকে উঠলো। এক লহমায় তার প্লেনটা দু'পাক ঘুরে গিয়েই মুখটা নীচের দিকে করে কল-ছেঁড়া ঘুড়ির মত নাবতে সুরু করলো; রোমানফ্ বারেক চারিপাশে তাকিয়ে নিলে, সরোজের প্লেনখানি

পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, ডান হাতখানি কপালে ঠেকিয়ে সরোজকে বিদায়-সম্ভাষণ করে মৃদু হাসলো।

শাঁ করে একখানি জাপানী প্লেন চলে গেল সরোজের পাশ দিয়ে, কয়েকটী মেশিনগানের গুলি চলে গেল এদিক ওদিকে, একদিকের পাখাতে একটা ফুটো হয়ে গেল বুঝি!

সরোজ টুপ্‌ করে একটা ডিগবাজী খেয়ে একেবারে জাপানী প্লেনখানির নীচে গিয়ে পড়লো, তারপরেই সামনের দুটী মেশিনগান থেকে গুম্‌গুম্‌ গুম্‌গুম্‌ করে কয়েকটা আলোর ঝল্‌কানি ছুটে গেল অন্ধকার আকাশের গায়ে। জাপানী প্লেনখানি অতর্কিতে একটা ডিগবাজী খেয়ে গোলাগুলিকে পাশ কাটিয়ে, একেবারে সরোজের ঘাড়ের উপর এসে পড়লো। অন্ধকার রাত্রে আকাশের গায়ে দু'খানি প্লেনে লড়াই লেগে যায়, দূর থেকে প্লেন দু'খানির লাল নীল আলো দু'টী শুধু দেখা যায়। এঁকেবেঁকে, পাশ কাটিয়ে, ডিগবাজী খেয়ে এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করছে শুধু দু'টী আলো, আর সেই আলোর এক এক দিক থেকে এক একবার ছুটে আসছে ডবল মেসিনগানের জোড়া-জোড়া আগুনের ঝিলিক।

সহসা সরোজের সামনের জাপানী প্লেনখানি জলে উঠলো। এবং তার সাহায্যের জন্য পিছন থেকে, পাশ থেকে, দশবারোখানি জাপানী ফাইটার সরোজের দিকে ছুটে এল। এক সঙ্গে এক ঝাঁক মেশিনগানের গুলি ছুটে এল সরোজের দিকে। সরোজ আর এক নিমেষও দেরী করলো না, টুপ্‌ টুপ করে একসঙ্গে কয়েকটি ডিগবাজী খেয়ে একেবারে হাজার খানেক ফুট নীচে নেবে এল। জাপানী প্লেনগুলির লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে গেল, এন্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌টের কয়েকটী গুলি মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, সরোজ আরো কয়েকটী ডিগবাজী খেয়ে আরো নীচে নেবে এল।

সাগরের মাত্র শ'খানেক গজ উপরে ক্ষণেকের জন্য সরোজের প্লেনখানি থমকে দাঁড়ালো। সামনেই রোমানফের প্লেনখানি লেজটী উঁচু করে ভাসছে, পাখার একটী কিনারায় রোমানফ দাঁড়িয়ে আছে, চারিপাশ থেকে জাপানী ষ্টীমলঞ্চগুলি ছুটে যাচ্ছে সেইদিকে। পঁচিশ-ত্রিশটি সার্চলাইটের তীব্র আলো এসে বন্দরের সে-দিকটী দিনের চেয়েও স্পষ্ট করে তুলেছে।

সরোজের প্লেনখানি এবার ছোঁ মারার ভঙ্গীতে নেবে এল, রোমানফের মাথার উপর। ক্ষণেকের জন্য ইঞ্জিন একেবারে বন্ধ করে দিয়ে সরোজ চীৎকার করে উঠলো। রোমানফ্‌ সে চীৎকারের ইঙ্গিৎ বুঝালো, লাফিয়ে উঠে প্লেনের

কৌতূহলী যাত্রীরা ফিরে গেল। আয়েষাকে সরোজ উপরের কেবিনে নিয়ে এল।

ক'মিনিট বসে থেকে আয়েষা একটু সুস্থ বোধ করলে সরোজ জিজ্ঞাসা করলো —ব্যাপারটা কি, এবার খুলে বলত ?

—একটা ভূত—আয়েষা বললে—একটা শাদা ধব্‌ধবে কঙ্কাল আমার কেবিনে ঢুকেছিল। তখন সবেমাত্র আলোটা নিভিয়ে শুয়েছি, খুট্‌ করে একটা শব্দ হোল, চেয়ে দেখি মাথার কাছে একটা কঙ্কালের আমার পানে তাকিয়ে আছে, চোখ দুটি জল্‌জল্‌ করছে। একখানি শাদা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আমার পানে। প্রথমে আমি এমন ভয় পেয়েছিলেম যে, অনেক চেষ্টা করেও মুখ দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেম না। সহসা সেই হাতটা গলায় এসে লাগতেই আমি চমকে উঠি। হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলেম। তারপর বিছানার উপর উঠে বসে দেখি কেউ কোথাও নেই, আলো জ্বাললেম, ততক্ষণে তোমরা এসে পড়েছ !

ডেভিড বললে—স্বপ্ন দেখেছ।

আয়েষা বললে—স্বপ্ন ? হতে পারে না। পরিষ্কার স্পষ্ট যা চোখ চেয়ে দেখেছি, তাকে স্বপ্ন বলবো কেমন করে ?

সরোজ বললে—আচ্ছা, আলো জেলে কি দেখলে কেবিনের দরজা খোলা ছিল ?

আয়েষা বললে—তাতো ঠিক মনে করতে পারছি না।

সরোজ চিন্তিতভাবে কেবিনের মধ্যে দুবার পায়চারী করলে, তারপর বললে —ওসব কিছু নয়, এখন তুমি ঘুমোও, আমরা পাশে রণজিৎ সিংয়ের কেবিনে রইলেম আর বোধ হয় সে-ভূত আসবে না, তোমার মনে একটা ভয় ছিল, তুমি সেইটাই স্বপ্ন দেখেছ ; ও-কথা আর ভেবো না।

আয়েষার কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সরোজরা পাশের কেবিনে চলে গেল।

পরদিন। ভোরের আলো আকাশকে ফরসা করে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই ডেকে যাত্রীর দল জড়ো হোল সূর্যোদয় দেখবার জন্য। রূপালী আভা পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ছে। ওই আলোর রশ্মি ধরে নীল জলের অন্ধকার ঠেলে সূর্য উঠবে। সুন্দর সূর্য। যে সূর্যের আলো পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে, যে সূর্য অসংখ্য

প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রতি মুহূর্তে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলছে, পৃথিবীর পিতা বহু-বৃদ্ধ সেই সূর্যকে অভিনন্দন জানাবার জন্য যাত্রীরা ডেকের উপর এসে দাঁড়িয়েছে।

আকাশের পূর্বপ্রান্তে লাল রেখা ফুটে উঠলো। রেখাটী ক্রমশঃ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো আকাশের বুকে, জলের নীলিমাকে ধাক্কা দিয়ে ছল্ ছল্ করে নেচে উঠলো তরঙ্গের মাথায় মাথায়। মনে হোল উপরের নীল আকাশে ও নীচের নীল জলে কে যেন একরাশ আবীর ঢেলে দিয়েছে, সব লালে লাল হয়ে গেল। সেই লালিত্বের বুকে হাসতে হাসতে ভেসে উঠলো একটী ছোট্ট লাল বল।

যে-সব যাত্রীরা এতক্ষণ চুপ করে রঙের খেলা দেখছিল তাদের মুখে এবার কথা ফুটলো। সাংহাইয়ের সেই চীনা ভদ্রলোকটী এগিয়ে এসে সরোজদের অভিবাদন জানালো—সুপ্রভাত, বন্ধুগণ!

—সুপ্রভাত!

—কাল রাত্রে আপনার বোন ভয় পেয়েছিল? ভূত দেখেছিল নাকি?

—ভূত আবার কোথায়? স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছিল।

হাহাঃ করে ভদ্রলোক প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলো, বললে—আপনার বোন তো বড় নার্ভাস্ মশাই, ভূতের স্বপ্ন দেখে মাঝ রাতে জাহাজ শুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে, ভারী মজার ব্যাপার তো!

আয়েষা পিছনে দাঁড়িয়েছিল, তিক্ত কণ্ঠে বললে—আপনার কাছে মজার ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে মজার হয়নি!

ভদ্রলোক অপ্রতিভ কণ্ঠে বললে—ওঃ আপনি আছেন, সরি, আমায় মাপ করুন, ম্যাডাম্!

হাসতে হাসতে ভদ্রলোক ডেকের আরেক দিকে চলে গেল।

ইতিমধ্যে আরেক দল যাত্রী বেড়াতে বেড়াতে তাদের সামনে এসে পড়লো, আয়েষাকে দেখেই অভিবাদন জানিয়ে বললে—গুড্ মর্নিং মিস্, কেমন আছেন, ভাল?

আয়েষা স্মিতমুখে মাথা নাড়লো।

তারপর একে একে যখনি যার সঙ্গে চোখাচোখি, সেই জিজ্ঞাসা করে। সারা সকালটা ভাল-থাকার কৈফিয়ৎ দিতে-দিতেই কাটলো।

দুদিন পরে সিঙ্গাপুর।

সিংহপুরই বোধহয় এর সত্যিকারের নাম, বিদেশীর মুখে সিঙ্গাপুর হয়ে গেছে। বন্দরের ধারে ছোট ছোট নৌকা করে ডুবুরীর দল জাহাজের ধারে এসে জড়ো হয়। জাহাজ থেকে কেউ দু'এক সেণ্ট ফেলে দিলে, তারা টুপ্ টুপ্ করে জলে লাফিয়ে পড়ে, জল থেকে ঠিক তুলে নিয়ে আসে সেই সেণ্টটী।

জাহাজের যাত্রীরা দল বেঁধে বেড়াতে বেরুলো।

বিরাট সহর। নানা দেশের লোক এখানে বাস করে—হিন্দু,* চীনা, ইংরাজ ও আরব। তবে বিদেশী হিসাবে এখানে ভারতবাসীর বাসই সব চেয়ে বেশী। এখানকার পুলিশ সবই পাঞ্জাবী। ইংরাজরা 'সিঙ্গাপুর বেস্' নামে এখানে এক বিরাট দুর্ভেদ্য কেল্লা তৈরী করেছে, একটী প্রকাণ্ড উড়ো জাহাজের আড্ডাও আছে।

সিংহপুরে হিন্দুদের এক বিখ্যাত 'চেট্টি মন্দির' আছে। 'টাইপুসম' নামে সেখানে এক উৎসব হয়; সেই সময় মন্দিরের সন্ন্যাসীরা জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে নগ্নপদে চলাফেরা করে দর্শকদের চমকে দেয়।

মালয় যে রবারের জন্য বিখ্যাত, শোনা যায় সিংহপুরেই নাকি প্রথম সেই রবারের গাছ রোপণ করা হয়েছিল।

জাহাজ সিংহপুর ছাড়ার পর, সেই রাত্রের কথা।—

কতক্ষণ সরোজ ঘুমোচ্ছিল জানে না, কিসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, চমকে উঠে দেখে সামনেই অন্ধকারে ধব্‌ধবে সাদা এক কঙ্কালের মুখ, একখানি অস্থিময় হাত। চারিপাশের ঘন অন্ধকারে শাদা কঙ্কাল যেন জ্বলছে, এক্স্-রে ফেললে নরদেহের প্রত্যেকটী অস্থি যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ-ও তেমনই।

সরোজ লাফিয়ে উঠলো, কিন্তু বিছানার উপর উঠে বসার আগেই অস্থিময় হাতখানি বজ্রের মত তার গলা টিপে ধরলো।

সরোজ এক ঝট্‌কা মেরে গলা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না, সে-হাতখানি যেন লোহার তৈরী। তার পেষণে সরোজের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল, বুকটা এক ফোঁটা বাতাসের জন্য আঁকুপাকু করে উঠলো, মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো, দুই চোখের মধ্যে চক্‌মকি ঠুকে কে যেন লাল-নীল আগুন জেলে দিলে,—অব্যক্ত যাতনায় সরোজ গোঁ-গোঁ করে উঠলো, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও

* ভারতবাসীরা বিদেশে সাধারণভাবে 'হিন্দু' বলে পরিচিত, তবে হিন্দু-মুসলমান ভেদ করার জন্য 'বৌদ্ধ-হিন্দু' ও 'মুসলমান-হিন্দু' বলা হয়।

সেই হাতখানি গলার উপর থেকে সরাতে পারলো না। মুখ থেকে এতটুকু শব্দ বেরুলো না, চীৎকার করে সাহায্য চাইবার এতটুকু অবসর পেল না। প্রতি মুহূর্তে সে বুঝতে পারলো, মৃত্যু তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে অজগর সাপের মত জড়িয়ে ধরছে। প্রতি পাকে পাকে তার দেহের হাড়গুলিকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে !···

ঠিক সেই সময় কেবিনের দরজায় ধাক্কা পড়লো—বাবুজী ! বাবুজী !!

যে-হাতটী সরোজের গলা টিপে ধরেছিল, মুহূর্তে তা ঢিলে হয়ে গেল। প্রেতাত্মাটী সরোজকে ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে গেল। তারপরেই দরজা খোলার শব্দ এবং দরজা ঠেলে একটী লোকের ভিতরে প্রবেশ। আগন্তুক ভিতরে ঢুকে ইলেক্‌ট্রিকের সুইচ্‌ টেপার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার আড়াল থেকে কালো পোষাক-পরা একটী লোক তার পিছন দিয়ে টুপ করে বাহির হয়ে গেল। আগন্তুক জানতে পারলো কিন্তু মুখ না ফিরিয়েই বলে উঠলো—আমার চোখে ধূলো দেওয়া শক্ত, তোমায় আমি চিনি মিষ্টার মার্কিরো !

পলায়মান লোকটী চম্‌কে উঠলো, ফিরে দাঁড়ালো, আলোর আভায় দেখা গেল —কালো আল্‌খাল্লার উপর কঙ্কাল আঁকা, মুখে কঙ্কালের মুখোস, ঐ মুখোস ও আল্‌খাল্লা দেখেই সরোজের প্রেতাত্মা বলে মনে হয়েছিল। পকেট থেকে ফস্‌ করে একটী পিস্তল বাহির করে আগন্তুককে লক্ষ্য করে মার্কিরো কট্‌কট্‌ করে দুটি গুলি ছুঁড়লো, অটোমেটিক পিস্তলের শব্দ হোল না, শুধু আগুনের ঝিলিকের আভাষ দেখা গেল। আগন্তুক তার আগেই দরজার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে।

মার্কিরো আর দাঁড়ালো না, শাঁ করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সরোজ ততক্ষণে অনেকটা সাম্‌লে নিয়ে, দুহাতে ফুলে-ওঠা গলা ডল্‌তে ডল্‌তে বিছানার উপর উঠে বসে দেখলে যিনি ভিতরে এসেছেন তিনি একজন চীনা খালাসী।

খালাসীটি বললে—আমি তো আপনাদের প্রথম দিনেই সাবধান করে দিয়েছিলেম।

সরোজ জিজ্ঞাসা করলে—লোকটি কে ?

– কে, তাতো দেখতেই পেলেন।

—দেখলেম তো একটা কালো আল্‌খাল্লা ও মুখোস, আর একটা অটোমেটিক পিস্তল।

—কদিন গায়ে পড়ে আপনাদের সঙ্গে অতো আলাপ করলে, তবু চিনলেন না ?

—তবে কি ইনি সেই সাংহাইয়ের চীনা ভদ্রলোক ?

—চীনা আবার কে,—জাপানী।

—জাপানী ?

—হ্যাঁ, আপনাদের কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে।

—তাতে ওর লাভ ?

—লাভ আপনাদের ক্ষতি করা।

—কিন্তু আমরা তো ওর কোন ক্ষতি করিনি।

—আপনারা ক্ষতি করেননি বলে যে অপরে আপনার কোন ক্ষতি করবে না, এতো কোন যুক্তি নয়।

—বিনা কারণেই ?

—কারণ যথেষ্ট আছে। আপনারা যাচ্ছেন খবরের কাগজের রিপোর্টার হয়ে। জাপানীরা চীনদেশে যে অত্যাচার করছে তার খবর আর ছবি আপনারা খবরের কাগজে পাঠাবেন। ভারতের একখানি কাগজে তা ছাপা হলেই জগতের সব কাগজেই তা বেরুবে। সারা জগতের সহানুভূতি গিয়ে পড়বে চীনাদের উপর, জাপানীদের মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা চালাবার আর উপায় থাকবে না। নিজেদের দুর্ণাম এমন-ভাবে প্রকাশ করতে দিতে জাপানীরা চায় না, সেই জন্যই ওরা আপনাদের মুখ বন্ধ করতে চায়। প্রথম দিনেই তাই মার্কিরো আপনাদের ক্যামেরাটি ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছিল।

—কিন্তু আপনি এতো কথা জানলেন কি করে ?

—জগতের সর্বত্রই চীনা দেশপ্রেমিকেরা জাপানীদের উপর নজর রেখেছে। তারাই আমাকে ওর সম্বন্ধে জানিয়েছে। ওই লোকটি আপনাদের হত্যা করার জন্যই এই জাহাজে উঠেছে, আমি তা জানতেম বলেই আপনাদের প্রথমেই সাবধান করে দিয়েছিলেম। তবু আপনারা সাবধান হননি। আমি ঠিক সময়ে এসে না পড়লে এখনি আপনি খুন হতেন।

—তবে কি এই লোকটাই সেই রাত্রে আয়েষার কেবিনে ঢুকেছিল ?

—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। দেশের জন্য নরহত্যা করা জাপানীদের চোখে পাপ নয়, দরকার হলে ওরা সগৌরবে 'হারিকিরি'* উৎসব করে। আপনাদের খুন করতে তাদের এতটুকু বাধবে না। সেই জন্যই আপনাদের

---

* যখন কোন জাপানী মনে করে তার দ্বারা দেশের কিম্বা জাতির কোন ক্ষতি হয়েছে, তখন সে আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করে, তাতেই তাদের গৌরব।

নিরাপদে সাংহাই পৌঁছে দেবার ভার পড়েছে আমার উপর। আপনারা যাচ্ছেন আমার মাতৃভূমির সেবার উদ্দেশ্যে, তাই আপনারা জাহাজেই খুন হন, এ আমরা চাই না। আপনারা একটু সতর্ক হবেন।

খালাসীটীকে বিদায় দিয়ে সরোজ কেবিনের দরজা বন্ধ করে বিছানার উপর এসে বসলো। সাম্‌নের খোলা জানালা দিয়ে দৃষ্টি গিয়ে পড়লো দিগন্ত বিস্তারী কালো জলে, তারামর অন্ধকার আকাশের পানে। কালো ঘন দুর্ভেদ্য অমানিশা মৃত্যুর মত দৃষ্টিকে চেপে ধরেছে। ওই অন্ধকার যেন মানুষের সভ্যতার ভাবী রূপ। যুগ যুগ ধরে মানুষ যে মনুষ্যত্বের চর্চা করে এসেছে, তার চেয়ে বেশী প্রচার করেছে শঠতা ও বিরোধ, হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা। নির্জন গিরিগুহায় বসে যুগে যুগে যে দর্শন ও ব্রহ্মজ্ঞান মানুষ সঞ্চয় করে এসেছে, তা মানুষের মনের পশুত্বকে জয় করতে পারেনি, তিলে তিলে তা স্ফীত হয়েছে, দিকে দিকে তা ব্যাপ্ত হয়েছে, একদিন তা আবার সমগ্র জগৎকে অসভ্যতার তমসায় আচ্ছন্ন করে ফেলবে। অসুরের কামানের মুখে দেবতার মৃত্যু ঘটবে; স্বার্থপরের বোমার আঘাতে সর্বত্যাগী প্রাণ হারাবে। জগৎ সেইদিকেই দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ইতালিয়ানরা আবিসিনিয়াকে বিষগ্যাসে ধ্বংস করে ফেললে। জাপানীরা চীনের গ্রামে ও শহরে শিশু ও নারী নির্বিচারে বোমা ফেলে হত্যা করছে—অসংখ্য নিহত মানুষের দেহের উপর দিয়ে সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। এমন না হলে একজন জাপানী গুপ্তচর রাত্রির অন্ধকারে তার গলা টিপে ধরবে কেন?

সরোজের মন চিন্তার সমুদ্রে ডুবে যায়।

দিন পাঁচেক পরের কথা। সকাল বেলা। খাবার ঘরে যাত্রীর দল সমবেত হয়েছে চা পানের জন্য, এমন সময় এলার্ম বেজে উঠলো। সচকিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে সবাই উঠে পড়লো, তরতর করে সিঁড়ি বয়ে উঠে এল উপরের ডেকে। প্রাণের ভয়ে তখন সকলের বুকে কাঁপছে, এই মাঝ সমুদ্রে জাহাজ শেষে বাণচাল হল নাকি!

উপরের ডেকে তখন মেটের আদেশ শোনা যাচ্ছে। খালাসীর দল জড়ো হয়েছে তার চারিপাশে। একখানি জীবন-তরী জলে নাবানো হয়েছে, দড়ির সিঁড়ি ফেলা হয়েছে জাহাজের গায়।

যাত্রীরা উৎসুকভাবে ক্যাপ্‌টেনকে ঘিরে ধরলো—কি হয়েছে, ব্যাপার কী?

—একজন যাত্রী জলে পড়ে গেছে।

মাত্র একজন! সকলের মন এক নিমেষে হাল্কা হয়ে গেল। সমগ্র জাহাজের তাহলে কোন ক্ষতি হয়নি, অপর সকলে নিরাপদ। সবাইকার মন থেকে আতঙ্কের কালো পর্দা কেটে গেল। সকলে গিয়ে দাঁড়ালো রেলিঙের ধারে।

জাহাজ থেমে গেছে। জীবন-তরীর খালাসীরা এপাশ-ওপাশ খুঁজছে। প্রভাতী রোদে জল ঝিক্‌মিক্ করে উঠেছে। একজন খালাসী জল থেকে একটী টুপী ও একটী কোট নৌকার উপর তুললো।

ডেভিড রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়েছিল, কোটটি দেখেই সে চমকে উঠলো—সরোজের কোট তো ঠিক ওইরকম।

ডেভিড ছু'পাশে তাকালো, রেলিঙের ধারে ভীড়ের মধ্যে সে সরোজকে দেখতে পেলে না। ছুটে গেল সরোজের কেবিনে, ঘর খালি পাড়ে আছে। ছুটে গেল মেটের কাছে, জিজ্ঞাসা করলো—কে,—ডুবেছে কে?

পরিচিত চীনা খালাসীটি পাশে দাঁড়িয়েছিল, সেই ডেভিডের কথার জাবাব দিলে—আপনার বন্ধু।

—আমার বন্ধু? সরোজ!—ডেভিডের মাথাটা ঘুরে গেল, পাশে রণজিৎকে ধরে কোন রকমে সামলে নিলে।

লাইফ্‌বোটের পিছনে তখন কয়েকটী হাঙর তাড়া করেছে। যে খালাসীটী জলে নেবেছিল, সে তাড়াতাড়ি নৌকার উপর উঠে পড়লো। তার পিছনে একটী হাঙর জলের উপর লাফিয়ে উঠলো। সে-দৃশ্য দেখে ডেভিড ছু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললে। ওই হিংস্র হাঙরগুলি তাহলে সরোজকে এতক্ষণে খেয়ে ফেলেছে। বায়োস্কোপের ছবির মত তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো কয়েকটী দৃশ্য। ডেভিড যেন চোখের সামনে দেখতে পেলে হিংস্র জলচর প্রাণীগুলি সরোজের দেহের এক-এক টুকরো মাংস কামড়ে নিতে ব্যস্ত, সরোজ ছু-একবার তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না; দেখতে দেখতে সাগরের জল রক্তে লাল হয়ে উঠলো; সরোজকে আর দেখা গেল না।

ডেভিড রেলিং ধরে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়লো। অতল সাগরের কোথায় কত নীচে সরোজ তলিয়ে গেছে তাই যেন দেখে নেবার চেষ্টা করলো। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় রোদের ঝিকিমিকি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। প্রশান্ত সুনীল জলরাশির নীচে অসংখ্য হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে অবিরাম যে দ্বন্দ্ব চলেছে, উরেপর সূর্যকরোজ্জ্বল ফেনিলতার পানে তাকিয়ে তা বোঝা যায় না। এই

জলের মাঝেই সরোজের দেহটা টুকরো টুকরো হয়ে হারিয়ে গেছে—সরোজ নেই! ডেভিডের বুকে ঠেলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

সারাদিন ডেভিড নিজের ঘরে পড়ে রইল। আয়েষা বা রণজিৎ, কাউকেই তার ভাল লাগছিল না। সরোজই ছিল তার কাছে সব—একান্ত আত্মীয়। সরোজের মৃত্যু মানে, জগতে আপনার বলতে তার আর কেউ রইল না। সরোজকে হারিয়ে ডেভিড মুহ্যমান হয়ে পড়লো।

জাহাজের কতজন এল তার কাছে সমবেদনা জানাতে। ডেভিড কাউকে চিনলো, কাউকে চিনলো না, কারুর কথা শুনলো, কারুর কথা শুনেও বুঝলো না, শুধু অর্থহীন চোখে তাকিয়ে রইল তাদের মুখের পানে,—কেবিনের দরজা দিয়ে উন্মুক্ত আকাশের পানে।

খানসামা খাবার দিয়ে গেছে, ডেভিড খায়নি। চুপ করে পড়ে আছে। বাহিরের অসীম নীলিমায় তার মন ব্যাকুল ভাবে মাথা খুঁড়ে বেড়াচ্ছে।

দিনের তীব্রতার শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা ঘনিয়ে আসে। অস্তগামী রোদের উজ্জ্বলতা সন্ধ্যার আঁচল-ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়। তার শেষ আভা নীল জলকে রক্তাক্ত করে দেয়, টুকরো টুকরো মেঘের কোলে জাগায় রক্তিম স্পর্শ। ডেভিডের মনে হয় সরোজের রক্তে সব লাল হয়ে গেছে। শুধু সরোজ একাই তো যায় নি। জলে স্থলে গগনে প্রাণীদের মধ্যে অবিরাম যে হিংস্রতার স্রোত বহে যাচ্ছে, আহার করার জন্য একজন অপরকে যেভাবে হত্যা করে চলেছে, তারই ব্যথা ও বেদনায় আকাশ ও জলধি লাল হয়ে উঠেছে। প্রতিমুহূর্তে সাগরের নীচে কোন করাত-ওলা মাছ কোন বিরাট তিমিকে আক্রমণ করে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেললো, কোথায় কোন্ তীক্ষ্ণদন্তী হাঙর বিপুল জলহস্তীর কোমল দেহকে টুকরো-টুকরো করে ভাগ করে খেলে, কোথায় কোন অক্টোপাশের শুঁড়ের ফাঁকে শঙ্কর-মাছ প্রাণ হারালো। দিনের শেষে সূর্যদেব বুঝি তারই ইতিহাস লিখে যাচ্ছেন রক্ত অক্ষরে মেঘের গায়, আকাশের রেখায় রেখায়। তীব্র ধারালো আলোয় সূর্যদেব জগৎকে দেখেন, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উপরে তুলে, নীচে নাবিয়ে, দিনের-পর-দিন, বছরের-পর-বছর ধরে। তাঁর কিরণে প্রতিভাত হয়ে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে—বনের কোন ঝোপের অন্তরালে দুর্বল কোন হরিণের উপর হিংস্র বাঘ লাফিয়ে পড়লো, কোন পাহাড়ের কন্দরে কোন অজগর এক রামছাগলকে জড়িয়ে ধরে মট্‌মট্ করে তার সর্বাঙ্গের হাড়গুলি ভেঙে ফেললো, প্রান্তরের বুকে নিরীহ কোন চড়ুই পাখী কোথায় ঘাসের উপর বসে-থাকা এক ফড়িংকে ঠুকরে খেতে ব্যস্ত। রোদ কেঁপে

ওঠে, আকাশের বুক চিরে অশ্রু নেবে আসে বৃষ্টি ধারা রূপে। মানুষ দেখে শেখে। নিজের বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও বিচারের বলে মানুষ পশুর চেয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠে, মহাকালের চেয়ে হয়ে ওঠে বেশী রুদ্র, বেশী ধ্বংসকামী। তখন মানুষ দুর্বলের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে, শক্তিহীনের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্য মত্ত হয়,—যন্ত্র ও কল নিয়ে দলে দলে লোক তৈরী হয়, অজানা-অচেনা পরস্পরকে শত্রু ভেবে হত্যার উৎসবে মেতে ওঠে। সূর্যদেব সকাল ও সন্ধ্যায় রক্তচোখ তুলে বলেন—'সাবধান, ওরে সাবধান।' সে বাণী মানুষের মনকে স্পর্শ করে না, অহঙ্কার মাথা নোয়ায় না—কামানের ধোঁয়ায় সুনীল আকাশ ঢাকা পড়ে যায়, হু হু করে বাতাস বেড়ায় কেঁদে, জ্যোৎস্নার চাঁদ মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলে।

ডেভিড উদাস মনে ভাবতে থাকে, রাত এগিয়ে চলে।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করার কথাও তার মনে ওঠে না।

সহসা—

একখানি হাত ডেভিডের গলায় উপর এসে পড়লো, ডেভিড চমকে উঠলো! আলোর যে আভাটুকু ভিতরে এসে পড়েছিল তাইতে সে দেখতে পেলে, তার সামনে একটী কঙ্কালের মুখ। ইচ্ছা হোল সকলকে ডাকে, প্রচণ্ডভাবে চীৎকার করে ওঠে, কিন্তু পারলো না, গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। মনে করলো এক ঝট্‌কা দিয়ে হাতখানি গলার উপর থেকে সরিয়ে দেয়, কিন্তু নিজের হাতখানি বারবার চেষ্টা করেও সে উঠাতে পারলো না—সে হাতখানি যেন তার নিজের হাত নয়, প্রেতাত্মার চোখ দুটি যেন তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। ডেভিড চেয়ে রইল, আতঙ্কে তার সারা দেহ অবশ হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে ডেভিডের নিঃশ্বাস রোধ হয়ে এল, দৃষ্টি হয়ে এল ঝাপ্‌সা, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো—প্রতি লহমাটী হয়ে উঠলো অসহনীয়। গলা দিয়ে বাহির হয়ে এল অস্পষ্ট গোঁ গোঁ স্বর।

পরমুহূর্তেই কেবিনের মধ্যে ডেভিডের কানের পাশে কট্‌কট্ করে পিস্তলের ট্রিগার টেপার শব্দ হোল। সঙ্গে সঙ্গে ভূতটী ডেভিডের গলা ছেড়ে দিয়ে একলাফে বাইরে গিয়ে পড়লো, তার পিছনে আর একটী লোক ছুটে গেল, তারপরেই ডেকের উপর একটা অস্পষ্ট ধস্তাধস্তির শব্দ ডেভিডের কানে এসে লাগলো। ডেভিড এবার সচকিত হয়ে উঠলো—তাহলে ভূতে গলা টেপে নি, সে মানুষ!

নিমেষে বিছানা ছেড়ে ডেভিড কেবিনের বাইরে এসে দাঁড়ালো। চোখে

পড়লো : ডেকের একধারে ছুটী লোক ধস্তাধস্তি করছে। ডেভিড তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই একটী লোক অপর লোকটির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলে, ছুটে গিয়ে ডেকের রেলিং ধরে জিম্‌নাষ্টের কায়দায় উল্টে পড়লো বাহিরের দিকে, সামনেই মাস্তলের একটি কাছি ঝুল্‌ছিল, সেই কাছিটি ধরে তরতর করে সে নেবে গেল জলের দিকে! পরমুহূর্তেই ঝুপ্‌ করে জলে একটি ভারী জিনিষ পড়ার শব্দ শোনা গেল। কৌতূহলী ডেভিড রেলিং ধরে জলের দিকে ঝুঁকে পড়লো—নীচের কালো জলে ঝিক্‌মিকে জ্যোৎস্না ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না। একটি লোক হিংস্র সামুদ্রিক জন্তু বহুল চীনসাগরের বুকে স্বেচ্ছায় লাফিয়ে পড়লো, কিন্তু মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাবার এই আগ্রহ তার কেন?

ডেভিডের কাঁধের উপর কে একখানি হাত রাখলো, ডেভিড চম্‌কে ফিরে তাকালো, দেখে—সরোজ।

সরোজ!—তার পাশে দাঁড়িয়ে সরোজ!! বিস্ময়ে আনন্দে সরোজের একখানি হাত ডেভিড চেপে ধরলো, তার চোখছুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললে—সরোজ! সরোজ তুমি!!

সরোজ মৃদু হেসে বললে—মরিনি বন্ধু, মরিনি। আমার কোট আর টুপীটা জলে ফেলে দিয়ে আমি জাহাজেই ছিলেম।

—তবে আমার সঙ্গে দেখা করনি কেন?

—দেখা করলে কি আর ওই লোকটিকে ধরা যেত?

—লোকটিকে তো ধরতে পারনি!

—এখন পারিনি, কাল সকালেই পারবো।

—সে তো জলে লাফিয়ে পড়লো, কাল সকালের আগেই হাঙরের মুখে যাবে।

—জলে সে পরেনি, ওই কাছিটি ধরে বরাবর নীচে নেবে গেল। কাল সকালেই মজা দেখতে পাবে!

ডেভিড আর জিজ্ঞাসা করলো না, পলাতকের জন্য ডেভিডের মাথা তখন মোটেই ঘামছে না। বন্ধু যে ডোবেনি, সে যে জীবন্ত তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার কথা ডেভিড শুনতে পাচ্ছে, তার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে ডেভিড অনুভব করছে - ডেভিডের ভারী আনন্দ হোল। মনের উচ্ছ্বাসে সরোজকে সে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো।

উষালোকেই ডেকের উপর একে একে ভীড় জমতে সুরু হয়েছে। প্রায় সকলের হাতেই বাইনোকিউলার; দৃষ্টি দিগন্তের শেষে ঠেলে দেবার জন্য

সকলেরই আগ্রহ। নীল সাগরের বুকে আজ বৈচিত্র্য দেখা যাবে। কোথায় নীলাম্বুরাশির উত্তর প্রান্তে একটী কালো ফোঁটা ক্রমশঃ বড় হয়ে একটী বিরাট জনবহুল বন্দরে রূপান্তরিত হবে। সেই কালো ফুট্‌কিটী আবিষ্কার করার জন্যই যাত্রীদলের ঔৎসুক্য।

একটু বিলম্বে সরোজ ও ডেভিড ডেকে এল, সকলের অলক্ষিতে কালো স্যুট পরা একটী বেঁটে লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। লোকটীর কাঁধে একটী হাত রেখে সরোজ ডাকলো—হ্যালো মার্কিরো!

মুখ ফিরিয়ে সরোজকে দেখেই মার্কিরো চম্‌কে উঠলো, পায়ের কাছে একটা সাপ দেখলে লোকে যেমন চম্‌কে ওঠে।

সরোজ হেসে বললে—চিনতে পারছেন?

—আপনি···আপনি···আপনি···না?

—হ্যাঁ, ডুবে গিয়েছিলেম। আপনাকে ধরার জন্য কাল রাত্রে আবার ভেসে উঠেছি।

কট্‌মট্ করে সরোজ ও ডেভিডের মুখের পানে একবার তাকিয়ে মার্কিরো পকেটে হাত দিলে। সরোজ সে-হাতখানি চেপে ধরে বললে—পকেট থেকে পিস্তল বাহির করার আগেই আমি আপনাকে গুলি করবো।

মার্কিরো হাসিমুখে বললে—আপনি এ সব কি বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি আমায় গুলি করবেন কেন?

—আমাদের শত্রু বলে।

—শত্রু?

—হ্যাঁ, শত্রু। আপনি আমাদের তিনজনের গলা টিপে খুন করার চেষ্টা করেছেন, দরকার হলে এখনি আপনার কেবিন থেকে আমি সব প্রমাণ দেখাতে পারি।

মার্কিরো এবার সরোজের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলে, বললে—জাপানীরা মরতে ভয় পায় না, দেশের জন্য আমরা সব সময়েই মরতে প্রস্তুত।

—তা' বলে ভূত সেজে লোকের গলা টিপে মারার নাম দেশপ্রেম নয়!

—তোমরা হাজার বছরের পরাধীন জাত, তোমরা দেশপ্রেমের মর্ম কি বুঝবে?

—আমরা পরাধীন হতে পারি কিন্তু খুনী নই।

—খুনী মানে? কোন জাত আজ পর্যন্ত খুন না করে বড় হয়েছে?

নেপোলিয়ন অহিংসা প্রচার করে ফরাসীদের বড় করেছিল ? ওয়াশিংটন বাইবেল পাঠ করে আমেরিকাকে স্বাধীন করেছে ? মুসোলিনী কি বিয়ে করে আবিসিনিয়া যৌতুক পেলে ? প্রেম, ধর্ম, শান্তি, অহিংসা—ওসব ভীরুর কথা, ওসব তোমাদের হিন্দুদের কথা, আমাদের কাছে ওসব চলবে না।*

কথা বলতে বলতে ঝট্‌ করে পকেট থেকে পিস্তল বাহির করে মার্কিরো সরোজের সামনে তুলে ধরলো। আরেকটু হলেই গুলি করতো, ঠিক সময় কোথা থেকে রণজিৎ এসে পিছন থেকে তার হাতে সজোরে এক ঝট্‌কা মারলো—সশব্দে ডেকের উপর পিস্তল পড়ে গেল, গুলি ছিট্‌কে বেরুলো।

শব্দ শুনে ডেকের সকলের দৃষ্টি পড়লো তাদের দিকে। মার্কিরো হিংস্র দৃষ্টিতে একবার রণজিতের পানে তাকালো, তারপর হাহা করে হেসে উঠেই একলাফে রেলিং টপ্‌কে একেবারে জলে লাফিয়ে পড়লো—নীল জলে সেই যে তলিয়ে গেল আর উঠলো না।

রেলিঙের পাশে লোক জমে গেল। জীবনতরী জলে নাবলো, কিছুক্ষণ খোঁজাখুজি চললো, কিন্তু মার্কিরোকে পাওয়া গেল না।

ডেভিড বললে—লোকটি তাহলে শেষ পর্যন্ত হাঙরের পেটেই গেল দেখছি !

পাশেই একটী 'কাছি' ধরে চীনা খালাসীটী দাঁড়িয়েছিল, মৃদু হেসে বললে—হাঙরের মুখে যাবার লোক সে নয়।

সাগরের দিগ্বলয়ে হংকংয়ের পাহাড় দেখা গেল।

মহাচীনের দক্ষিণ প্রান্তে এটী একটি ছোট্ট দ্বীপ। এরই মাইলখানেক দূর থেকে চীনসাম্রাজ্য সুরু হয়েছে।

হংকংকে পাশ কাটিয়ে জাহাজ চীনের বন্দর কিউলুনে এসে নোঙর করলো।

কিউলুন থেকে হংকং ষ্টীমারে আসতে হয়, পাঁচ মিনিট অন্তর ফেরী ষ্টীমার চলে। জাহাজ ছেড়ে সরোজরা এক ষ্টীমারে চড়ে বসলো।

হংকং একটী ছোট দ্বীপ, আসল সহরটীর নাম ভিক্টোরিয়া। পাহাড়ের গায়ে এটী একটী মজার সহর। সোজা সমতল পথ এখানে নেই, সব সিঁড়ির পর সিঁড়ি। সহরের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যেতে হলে হয় সিঁড়ি দিয়ে

---

* বৌদ্ধ ধর্ম অহিংসামূলক ও বিদেশী ধর্ম বলে জাপানীরা জাপান থেকে এই ধর্মের উচ্ছেদ করার জন্য কিছুদিন থেকে আন্দোলন সুরু করেছে।

উঠতে হবে নাহলে নাবতে হবে। এমন পথে গাড়ীঘোড়া চলে না, যারা হাঁটতে পারে না, তাদেরকে চড়তে হবে পাল্‌কী। সহরে গাড়ী ঘোড়া চলার জন্য সমতল রাস্তাও আছে, দার্জিলিংঙের রেলপথের মত চক্রাকারে সে-পথে অনেক ঘুরতে হয়। দড়িতে ঝুলানো এক রেলপথও আছে যাত্রীদের সহরের এ-মোড় থেকে একেবারে ও-মোড়ে এক পাহাড়ের চূড়ায় পৌছে দেয়, মাঝে একবারও থামে না। সহরটী দেখতে বেশ। এখানে একটী সুন্দর বৌদ্ধমন্দির আছে।

রণজিৎ একে একে কয়েকটী ফটো তুললো।

কিউলুনের পরেই সাংহাই। জাহাজ কিন্তু সাংহাইয়ের দিকে আর অগ্রসর হবে না বলে শোনা গেল। জাপানী প্লেন নাকি বিদেশী জাহাজকেও বিশেষ কোন খাতির করছে না, যখন তখন চল্‌তি যে কোন জাহাজের বুকে বোমা ফেলা তাদের যেন অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন,—ক্যাপ্‌টেন ইচ্ছা করলে নিজের দায়িত্বে সাংহাইয়ে জাহাজ নিয়ে যেতে পারেন, কোন বিপদ ঘটলে কাউকে দোষ দেওয়া চলবে না। ক্যাপ্‌টেন সেই কথা শুনে আর অগ্রসর হতে সাহস করছেন না।

জাহাজে ফিরে আসতেই ক্যাপ্‌টেন বললে—জাপানীরা সাংহাইয়ের চারিদিকে বোম্বার্ড করছে, ইতিমধ্যে কয়েকখানি বৃটিশ ও মার্কিন জাহাজ তারা বোমা মেরে ডুবিয়ে দিয়েছে, কন্‌সালেট্ আমাদের অনুরোধ করেছেন আমরা যেন সাংহাইয়ের দিকে না যাই। আমি তাই ওদিকে আর অগ্রসর হবনা বলেই ঠিক করেছি!

—বেশ,—বলে সরোজরা সেইখানেই নাবার ব্যবস্থা করলো।

সরোজদের সামান্য মালপত্র ষ্টীমলঞ্চে নাবিয়ে দেওয়া হোল। সরোজরাও নাববার উদ্যোগ করছে, এমন সময় একজন চীনা সৈনিক—পূরোদস্তুর কমাণ্ডারের পোষাক পরা—সরোজদের সামনে এসে বললে—গুড মর্ণিং ভদ্রমহোদয়গণ!

অভিবাদনের প্রত্যাভিবাদন করাই রীতি, সরোজ বললে—গুড মর্ণিং!

চীনাটী হেসে বললে—আমায় চিনতে পারছেন?

—আপনি·········?

—আমি এই জাহাজের একজন চীনা খালাসী, আমার নাম লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল্ ফা-সিন-তু। চীনদেশের পক্ষ থেকে প্রোপাগাণ্ডা চালাবার জন্য আমি ভারতবর্ষ, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে গিয়েছিলেম। আপনাদের সঙ্গে এই একই জাহাজে ফিরছি—বলে কর্ণেল ফা-তু টুপীটি মাথা থেকে খুলে ফেললে।

ভ্রূ পর্যন্ত টুপী থাকার জন্য এতক্ষণ চিনতে পারেনি, এবার সরোজরা চিনতে পারলো, বলে উঠলো—ওঃ আপনি !

ফা-তু মৃদু হাসলো, আবার টুপীটা মাথায় পরলো।

রণজিৎ প্রশ্ন করলো—তবে আপনি এতক্ষণ খালাসী সেজে আসছিলেন যে ?

—জাপানী গুপ্তচর মার্কিরোকে ফাঁকি দেবার জন্যে। আমার সত্যিকারের পরিচয় জানলে কোন্‌ ফাঁকে একটু সুবিধা পেলেই সে আমায় খুন করতো। অথচ আমার কাছে এমন কতকগুলি খবর আছে, যা মার্শাল চু-টে'র জানা একান্ত দরকার, সেই জন্যেই সাবধান হয়ে আসা।

সরোজদের সঙ্গে কর্ণেল ফা-তুও ষ্টীমলঞ্চে উঠলো।

লঞ্চ তাদের পৌঁছে দিলে এক বিরাট বন্দরে।

বাহিরে মোটর অপেক্ষা করছিল, শুল্ক বিভাগের লোকেরা দলবলসহ ফা-তুকে মোটরে তুলে দিয়ে গেল।

দুপাশে বড় বড় বাড়ী, রকমারি দোকান ও পথের জনতা পিছনে রেখে পালিশ-করা পিচ-ঢালা পথ দিয়ে মোটর তাদের এনে পৌঁছে দিলে এরোড্রোমে।

সেখানে একখানি প্লেন তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, তাদের পাঁচজনকে নিয়ে প্লেনখানি তখনি উঠলো আকাশে।

বোঁ বোঁ করে প্রপেলারের গর্জন তুলে প্লেনখানি ছুটলো উত্তর দিকে। হাজার ফুট উপর দিয়ে ছড়ানো দুই পাখা মেলে বাতাসের ঢেউ ভেদ করে প্লেন ছুটলো। নীচে কিছুই ভাল করে ঠাহর করা যায় না। গ্রাম ও সহর, নদী ও ধানজমী, পাহাড় ও বনানী একখানি ছক্‌ কাটা কার্পেটের মত দেখায়। মাথার উপরে, সামনে ও পিছনে, আশেপাশে বিবর্ণ বাতাস। এখানে সেখানে এক একটি মেঘের টুকরা সেই বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝল্‌মলে রোদ ঠিকরে পড়ছে প্লেনের এলুমিনিয়মের অবয়বের উপর। সেই চোখ ঝল্‌সানো রূপ, কান-চম্‌কানো গর্জন, আর ভয়-পাওয়ানো গতি দেখে পাখীর দল কলরব করে দূরে পালিয়ে যায়। নিঃসঙ্গ একক প্লেনখানি সঙ্গীহীন সন্ন্যাসীর মত চলতে থাকে, এতটুকু দোলে না, এতটুকু ঝাঁকানি লাগে না। তুল্‌তুলে নরম গদীর উপর দেহ এলিয়ে আসে, ঘুম পায়, মনে হয় যেন একান্ত আরামে মায়ের কোলে শুয়ে আছি।

প্লেন এগুচ্ছে। দিগ্বলয়ের সীমা কিন্তু এতটুকু বদলায় না। চারিপাশে আগেও যেমন নীল শূন্যতা, কয়েক ঘণ্টা উড়ে আসার পরও ঠিক তেমনিই থাকে। এদিকে ওদিকে টুকরো টুকরো ছড়ানো মেঘের পানে নজর রাখলে বোঝা যায়

প্লেন এগুচ্ছে। এক একবার নীচের সব কিছুকে ঢেকে দিয়ে শুধু ঢেউ-খেলানো জল-ভরা কালো মেঘ ভেসে উঠে,-- পুঞ্জীভূত মেঘ। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যই বা! কয়েক মিনিটের মধ্যে মেঘখানি পিছিয়ে যা পিছনের আকাশে কখন মিলিয়ে যায়। নীচের কর্পেট বিছানো মাটি আবার চোখে পড়ে, চোখে পড়ে দূরের তুষার-শুভ্র পাহাড়ের শিখরগুলি। হাওয়ায় ভেসে প্লেনখানি এগিয়ে চলে— শুধু গতি আর গতি, অনন্তকালের বুকে জীবনের অসীম গতির মত।

বিরাট সহর নান্‌কিঙ্, উত্তর চীনের রাজধানী। শুধু রাজধানী বললেই সব বলা হয় না। মাইলের পর মাইল জুড়ে বিরাট সহর, আটতলা দশতলা অট্টালিকার সারি, অসংখ্য প্রশস্ত পিচ্‌ঢালা পথ, জমকালো দোকান পশারী, সর্ব-দেশের অগণিত জনগণের ভীড়।

সরোজ বললে—এতো বড় সহর ভারতে একটিও নেই।

কমরেড ফা-তু বললে—শুধু ভারতে নয়, এশিয়াতেও দু-একটির বেশী নেই। এর চেয়েও বড় সহর ছিল সাংহাই, কিন্তু জাপানীদের গোলা আর বোমার কল্যাণে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আজ আর তার বিশেষ কিছু নেই!

আয়েষা বললে—এমন সুদৃশ্য সহর কত বছরের সাধনায় কত মানুষের চেষ্টায় গড়ে ওঠে, তার উপর বোমা ফেলতে, কামান চালাতে এতটুকু সঙ্কোচ হয় না!

রণজিৎ বললে—'সঙ্কোচ-হওয়াটা' সভ্য মানুষের একটা বিশেষ গুণ; যে জাত সভ্য নয়, সে প্রতিবেশীর সভ্যতা সইবে কেমন করে, অ-সভ্যের কাছ থেকে অন্যায় কাজে সঙ্কোচ আশা করা ভুল।

আয়েষা বললে—আপনি জাপানকে অসভ্য দেশ বলছেন, এতবড় ব্যবসা আর কোনও দেশের আছে? তাছাড়া শুনেছি ওদেশে অশিক্ষিত লোক নেই বললেই হয়!

রণজিৎ বললে—শিক্ষিত-অশিক্ষিতের সংখ্যা, তাদের দেশের গবর্মেণ্টই জগতে জাহির করেছে, সেটা যে সত্যি, তাই বা কি করে বিশ্বাস করি? নিজেদের সভ্য বলে প্রমাণ করার জন্য সেটা একটা 'প্রোপাগাণ্ডা'ও তো হতে পারে, তাছাড়া শুধু অ আ পড়তে পারলেই কি তাকে শিক্ষিত বলা চলে? আর ব্যবসার কথা যে বলছ, ব্যবসাটাই সভ্যতার মাপকাঠি নয়, বিরাট ব্যবসা করে জাপান যা লাভ করেছে, তা জগতের কোন ভাল কাজে ব্যয় হয়নি, জাপান সেই টাকায়

শুধু গুলি গোলা বোমা তৈরী করেছে,—চীন আর রুশিয়ার সঙ্গে লড়াই করার জন্য।

মোটর এসে থামলো এক বিরাট অট্টালিকার দ্বারে। ফা-তু বললে—এই হোটেলের চারতলায় আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, আজকের মত আপনারা এখানে বিশ্রাম করুন, কাল সকালে আমি আপনাদের নিয়ে যাব কমরেড চু-টের কাছে।

ফা-তু তাদের চারতলায় পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলে।

পরদিন সকালে ফা-তু এসে সরোজদের নিয়ে গেল চু-টের অফিসে।

প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রতি তলা সৈনিকদের ভিড়ে গিস্ গিস্ করছে।

প্রত্যেক ঘরের দরজায় কাঠের ফলকে একটা-না-একটা নাম লেখা আছে, আর তার সামনে মাঝে মাঝে এমন ভিড় জমেছে যে, বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

ফা-তু একটী ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই একজন সৈনিক সেলাম জানিয়ে কি বললে, ফা-তু ঘরের মধ্যে আর ঢুকলো না, ফিরে এসে সরোজদের বললে—একদল গেরিলা বাহিনীকে বিদায় জানাবার জন্য কমরেড্ চু-টে ব্যারাকে গেছেন, চলুন সেইখানেই আলাপ করিয়ে দেব।

সরোজরা সেখান থেকে বাহির হয়ে এল।

সৈন্যদের ব্যারাক সেখান থেকে বেশী দূর নয়। কয়েক মিনিট পদব্রজে গেলেই ব্যারাকে এসে পৌছানো যায়, কিন্তু ততদূর আর যেতে হোল না, সৈন্যদের হল্লা শোনা গেল, তারপরেই দেখা গেল সারি সারি সৈন্য-বোঝাই লরী এগিয়ে আসছে পথের উপর দিয়ে। যুদ্ধযাত্রী চীনাদল উল্লসিত মনে জাতীয়-সঙ্গীত গাইতে গাইতে চলেছে দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে।

এমন দৃশ্য সচরাচর চোখে পড়ে না, দেখলে শ্রদ্ধা ও প্রশংসায় মন ভরে ওঠে, রণজিৎ থমকে দাঁড়ায়, চামড়ার কেস থেকে ক্যামেরা বাহির করতে করতে বলে—একটু দাঁড়াও একখানি ছবি তুলে নি!

ফা-তু বললে—এখান থেকে তুললে তো ভালো উঠবে না।

—না, এখান থেকে তুলবো না, ওই ঢিবিটার উপর থেকে তুলবো,—বলে রণজিৎ কাছেই এক গাছের নীচে একটী রাবিশের ঢিপি দেখিয়ে দিলে।

আয়েষা বললে—আমিও যাব।

—চল,—বলে রণজিৎ আয়েষাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে পথটা পার হয়ে ওদিকে চলে গেল।

গাছের নীচে ঢিবিটার উপর দাঁড়িয়ে চমৎকার 'ভিউ' পাওয়া গেল; লরীর পর লরীর সারি, পথের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, পিছনে জমকালো সব বাড়ী সূর্য কিরণের রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আয়েষা বললে—চমৎকার !

রণজিৎ ক্যামেরার ফোকাস্ ঠিক করে নিয়ে, কট্ করে সাটার টিপলো,—এক লহমায় নশ্বর দৃশ্যটা ফিল্মের বুকে চিরস্থায়ী হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে দুখানি কালো প্লেন দেখা গেল। অনেক উঁচুতে,—ছোট দুটি পাখী যেন। কোন্ পক্ষের প্লেন তা জানার আগেই টুপ্ টুপ্ করে দুটো কালো জিনিষ নীচে পড়তে দেখা গেল। মুহূর্ত মধ্যে এলার্ম বিউগিল বেজে উঠলো, কিন্তু তখন আর সাবধান হবার সময় ছিল না।

ক্ষণিকের জন্য সৈনিকদের জাতীয় সঙ্গীত থেমে গেল, তারপরেই বোমা দুটো নীচে এসে ফাটলো - বুম্ বুম্—!

একখানি লরীর উপর একটা বোমা ফাটলো, তা স্পষ্ট দেখা গেল, কিন্তু পরমুহূর্তে ধূলো ধোঁয়া আর আর্তনাদের বিশৃঙ্খলায় সব অবলুপ্ত হয়ে গেল, কিছুই আর ঠাহর করা গেল না।

তৎক্ষণাৎ নীচে থেকে প্লেন-ধ্বংসী কামান গর্জে উঠলো।

ধূলো আর ধোঁয়া যখন কেটে গেল, বোমারু প্লেন দুখানি তখন আকাশ থেকে উধাও হয়ে গেছে। দেখা গেল: একখানি লরী কে যেন এক মুগুরের ঘায়ে চূরমার করে দিয়েছে, আরোহী সেনার দল ইতস্ততঃ ছিট্‌কে পড়েছে, আহত রক্তাক্ত! সরোজদের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে একজন, তার বুট শুদ্ধ একখানি পা উড়ে গেছে, তারই কাছে কার একখানি হাত এসে পড়েছে ছিন্নভিন্ন।

চীনা সৈনিকেরা ছুটে এল আহতদের উদ্ধার করার জন্য।

সরোজ দৃষ্টি ফেরালো অদূরে গাছের দিকে, রণজিৎ যেখান থেকে ছবি তুলছিল, কিন্তু রণজিৎ কি আয়েষা কাউকেই সে সেখানে দেখতে পেলে না, মনে হোলো কে যেন সেই ঢিবিটির পাশে পড়ে আছে। একটুকরো কাপড় দেখা যাচ্ছে। সরোজ ডেভিডের হাত ধরে ছুটে গেল সেই দিকে।

গাছের পিছনে রণজিৎ পড়ে আছে। কয়েক হাত দূরেই বোমাটা ফেটে একটা গর্ত হয়েছে, আর সেই বিস্ফোরণে রণজিৎ ছিট্‌কে গিয়ে পড়েছে গাছটার

আড়ালে, কনুইয়ের কাছ থেকে ডান হাতখানি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অজস্র ধারায় রক্ত ঝরছে! সরোজ তাড়াতাড়ি একখানি রুমাল দিয়ে কনুইয়ের উপরটা যতদূর জোরে সম্ভব বেঁধে দিলে, তবুও রক্ত বন্ধ হয় না। রণজিৎ যাতনায় গোঁয়াতে লাগলো। সরোজ কি করে তার যাতনার উপশম করবে ভেবে পেলে না, সামনে ফা-তুকে দেখে বললে—একজন ডাক্তার?

ফাতু বললে—আমি লোক পাঠিয়েছি, এখনি এম্বুলেন্স এসে পড়বে।

রণজিৎ যন্ত্রণা-কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—আয়েষার কি হোল?

সত্যিই তো রণজিতের আঘাত দেখে আয়েষার কথা তারা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সরোজ ও ডেভিড চারিপাশে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফেরালো। চোখে পড়লো সেই ঢিবির ওপাশে তিন চার জন চীনা দাঁড়িয়ে আছে। গিয়ে দেখলো, ঢিবিটির একপাশে আয়েষা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, কোথাও কোন আঘাত পেয়েছে বলে চোখে তো পড়ে না। নাড়ী পরীক্ষা করে দেখলো—নাড়ীর গতি স্বাভাবিক! সম্ভবতঃ বোমা বিস্ফোরণের শকে সে জ্ঞান হারিয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এম্বুলেন্স এল। রণজিৎ ও আয়েষার সঙ্গে সরোজ ও ডেভিড চললো সেই এম্বুলেন্সের মধ্যে। রণজিতের রক্ত পড়া তখনও বন্ধ হয়নি। তার মুখখানি ক্রমশঃ রক্তশূন্য বিবর্ণ হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে এম্বুলেন্সের এক একটি মৃদু ঝাঁকানিতে সে অব্যক্ত যাতনায় গুমরে উঠছে: সরোজ ও ডেভিড সে যাতনা দেখতে পারে না, ভাবে এর চেয়ে রণজিৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লে ছিল ভাল, এতো যাতনা বুঝতে পারতো না।

রণজিৎ কোন এক সময় মৃদুস্বরে ডাকে—সরোজ!

—কি ভাই?

—আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না ভাই। তোমরা আমার একটা শেষ কথা রাখবে?

—কী?

—আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে।

—বেশ, নেব! কিন্তু তুমি যে মরবে এ ধারণা তোমার মনের ভুল মাত্র।

—ভুল নয় ভাই, মানুষ মরার আগে বুঝতে পারে, আমিও বুঝতে পারছি,—বলে বাঁ হাত দিয়ে সরোজের একখানি হাত চেপে ধরে বললে—আমার শেষ অনুরোধ রেখো ভাই!

সরোজ কি বলবে, তার চোখে জল এল।

এম্বুলেন্স যেখানে তাদের পৌছে দিলে সে-হাসপাতালটীতে আর তিল ধারণের স্থান নেই। কত আহত নরনারী মেঝের উপরেই পড়ে আছে রক্তাক্ত দেহে। তারই মধ্যে ফাতু কোন রকমে রণজিৎ ও আয়েষার জন্য একটু স্থান করে দিলে। ডাক্তার আয়েষাকে দেখে বললেন—কোন ভয় নেই, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সেরে উঠবে।

রণজিৎকে দেখে বললেন—আঘাত সাংঘাতিক। রক্তপাত বন্ধ না করতে পারলে বাঁচবে না।

ডাক্তার তখনই ওষুধ দিয়ে নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন, সরোজদের একজনকে সকল সময় কাছে থাকতে বললেন।

সরোজ ও ডেভিড দুজনেই রইল রণজিতের কাছে। সংজ্ঞাহীন রণজিতের রক্তহীন পাণ্ডুর মুখখানির পানে তাকিয়ে তাদের বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যথা গুমরে উঠছিল। কথা বলতে ভাল লাগলো না। চুপ করে একপাশে তারা পায়চারি করতে লাগলো।

বারান্দা থেকে সহরের রাজপথের অনেকখানি দেখা যায়—ঘোর অন্ধকার। সহর ব্ল্যাক-আউট। হাসপাতালের জানালায় মোটা কালো পর্দা টাঙানো, যাতে বাইরে আলো না যায়। সন্ধ্যা থেকেই চারিপাশ নিস্তব্ধ। মৃত্যুর ভয়ে সবাই বুঝি আগে থেকে মৃত্যুর সাধনা করছে। শুধু হাসপাতালের মধ্যে অবিরাম অসংখ্য কাতরাণি ছাড়া আর কোনদিকে কিছুই শোনা যায় না।

শেষরাত্রের দিকে বাহিরের সেই নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা ছাপিয়ে প্লেনের বন্‌বন্ শব্দ কানে এল। সরোজ ও ডেভিড বারান্দার বাইরে এসে দেখলে পর পর সাতখানি প্লেনের নীল আলো মাথার উপর দেখা যাচ্ছে। প্লেনগুলি বরাবর পশ্চিমদিকে চলে গেল, তারপর ফিরে এল মাথার উপরে।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ডেভিড বললে—ওগুলো জাপানী বোম্বার বলেই মনে হচ্ছে।

ক'জন স্বল্পাহত সৈনিকও বারান্দায় বাহির হয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে একজন ডেভিডের কথা শুনে বললে—ওগুলো কাওয়াসাকি বোম্বার, এখুনি বোমা ফেলবে বলে মাথার উপর ঘুরছে।

দূর থেকে গোলা ছোড়ার শব্দ এল, হাউয়ের মত কয়েকটী আগুনের ঝলক আকাশের দিকে ছুটে গেল প্লেনগুলির পাশ দিয়ে। কিন্তু একখানিরও লাগলো না।

আবার আরেক ঝাঁক গোলা ছুটে যেতে দেখা গেল। তারও সবগুলোই হোল ব্যর্থ।

ডেভিড বললে—ইস্‌! একটাও মারতে পারল না, আমরা যদি থাকতেম!

এবার জাপানী প্লেনগুলি বোমা ফেলতে সুরু করলো। দুটি একটি নয়, অজস্র। চারিদিক থেকে বোমা ফাটার প্রচণ্ড শব্দ কানে এল। তারই সঙ্গে ভেসে এল, বাড়ী ধ্বসে পড়ার হুড়মুড় শব্দ, আহতের আর্তনাদ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কান্না, ভয়ার্ত নরনারীর হৈ চৈ কলরব। কয়েকটী লহমায় জগতের সুপ্ত শান্তি উন্মত্ত বিভীষিকায় রূপ বদলে ফেললো। জাপানী প্লেনগুলি যেন এক একটি দৈত্য,—রূপকথার রাজপুরী ধ্বংস করতে এগিয়ে এসেছে।

নার্স এসে খবর দিলে—রোগী আপনাদের ডাকছে।

সরোজ ও ডেভিড ভিতরে এল। রণজিৎ আগের মতই অচেতন হয়ে পড়ে আছে। আয়েষা তাকালো তাদের পানে। সরোজকে দেখে ধীরে ধীরে বললে—সরোজদা এটা চীনাদের হাসপাতাল?

সরোজ কি বললে বোঝা গেল না, বোমার শব্দে তারকথা চাপা পড়ে গেল।

আয়েষা জিজ্ঞাসা করলে—জাপানীরা এখনও বোমা ফেলছে?

সরোজ বললে—ও কথা থাক, তুমি এখন কেমন বোধ করছ?

—বুম্‌ম্‌!···হাসপাতালের খুব কাছে কোথায় একটা বোমা ফাটলো, বাড়ীখানা গুম্‌ গুম্‌ করে কেঁপে উঠলো, ক'জন রোগী আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো।

সরোজ তাড়াতাড়ি রণজিতের পাশে এসে দাঁড়ালো। তার চেতনা ফিরে এসেছে, কিছুক্ষণ সে সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে, তারপর কি যেন বলবার জন্য হাঁ করলো। কি বলে শোনার জন্য সরোজ তার মুখের উপর ঝুকে পড়লো। ঠিক সেই মুহূর্তেই—

—বুম্‌ম্‌ করে একটা প্রচণ্ড শব্দ হোল একেবারে যেন ঘরের পাশে। রণজিৎ সেই শব্দ শুনে চম্‌কে উঠলো, তারপরেই সব স্থির! সরোজ তাড়াতাড়ি তার হাত ধরলে—নাড়ী নেই! চীৎকার করে উঠলো—ডাক্তার! ডাক্তার!

—ডাক্তার আর কি করবে ভাই, সব শেষ হয়ে গেছে!

রণজিতের সব শেষ হয়ে গেল—এ কথাটা সরোজের মন মানতে চাইল না, বিদ্যুতের শক্‌ লাগার মত সে পিছন পানে তাকালো: বক্তা লেফ্‌টেনাণ্ট ফাতু স্বয়ং!

ফাতু বললো—অতিরিক্ত রক্তপাতে হার্ট দুর্বল হয়েছিল, 'হাই এক্‌স্‌প্লোসিভ্' বোমার শক্ সইতে পারলে না।

সরোজ রণজিতের মুখের পানে চোখ ফেরালো: চোখ দুটি স্থির, ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় চিক্ চিক্ করছে। সুন্দর মুখখানি রক্তহীন বিবর্ণ। মৃত্যুর শিথিলতা সে মুখ থেকে সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির সব ছায়া মুছে দিয়েছে। মহাকালের আভাস সে মুখে ফুটিয়েছে অনন্ত তৃপ্তি। কত আশা নিয়ে সে এসেছিল, এড্‌ভেঞ্চার হবে, ছবি তুলে নাম হবে—সব শেষ! তার জামা, জুতা, ডায়েরীখানি, পকেটের ঝরণা-কলমটা পর্যন্ত রইল, কিন্তু সে রইল না। জাপানীদের বোমা শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করলো!

ফাতু বন্ধুভাবে সরোজের পিঠে একখানি হাত রাখলো। এই সময় সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা ফাতুর জানা ছিল না।

সৎকারের ব্যবস্থা করার জন্য সকাল বেলা রণজিতের মৃতদেহটা যখন বাইরে আনার উদ্যোগ চলছে, এমন সময় সাধারণ একজন চীনাম্যান সামনে এসে দাঁড়ালো। তার হাতে একটা শাদা ফুলের তোড়া।

ফাতু সরোজদের বললে—ইনিই কমরেড্ চু-টে।

সরোজ তাঁর মুখের পানে তাকাতেই চুটে বাতাসে মাথা ঠুকে তাকে অভিবাদন জানালেন। সরোজ দেখলে: ছিপছিপে একহারা চেহারা, বয়স বছর চল্লিশের কাছাকাছি, তীক্ষ্ণ দুটী চোখ, ধারালো দৃষ্টি। মুখের পানে তাকালে বুদ্ধিমান বলে মনে হয়।

ইংরাজীতে চুটে বললেন—আপনার বন্ধুর আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে আমরা বিশেষ দুঃখিত। আপনাদের সহানুভূতি জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। মৃত ভারতীয় বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি এই পুষ্প-অর্ঘ নিবেদন করছি।

ফুলের তোড়াটী চু-টে রণজিতের মৃত দেহের একপাশে নাবিয়ে রাখলেন।

ফাতু বললে—এবং আমি বিশ্বাস করি এই মৃত্যু ব্যর্থ হবে না!

দপ্ করে সরোজের মনে পড়লো এম্বুলেন্সের মধ্যে রণজিতের শেষ কথা—'আমার একটা অনুরোধ রাখবে ভাই, আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে।' সরোজ বললে—আমরা এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবই!

কমরেড্ চুটে মৃদু হাসলেন শুধু।

সেইদিনই সরোজরা কমরেড্‌ চু-টের আফিসে গিয়ে দেখা করলো, বললে—আমরা সৈনিক হব।

কমরেড্‌ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা এর আগে কোথাও কখনো লড়াই করেছেন?

—হুবার। গত জার্মান যুদ্ধে ও আবিসিনিয়া যুদ্ধে।

—আপনারা কি সাধারণ সৈনিক হতে চান?

—না। বিমানবাহিনীতে অথবা গোলন্দাজ বাহিনীতে···

—বিমান-বাহিনীতে হয় না। আমাদের নিজস্ব বিমানবাহিনী বলতে এখন বিশেষ কিছুই নেই, রুশ বৈমানিকেরা এখন আমাদের সাহায্য করছে। আপনাকে আমি গোলন্দাজ-বাহিনীতেই নেবার ব্যবস্থা করবো। আপনারা কামান চালাতে পারেন?

—যে কোন রকমের মেশিন গান ও প্লেন-ধ্বংসী কামান চালানো আমাদের অভ্যাস আছে। আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।

কমরেড বললেন—আপনাদের কথাই যথেষ্ট।

কমরেড চুটে সরোজ ও ডেভিডকে গোলন্দাজ বাহিনীভুক্ত করে নেবার ব্যবস্থা করলেন।

সরোজ বললে—আয়েষা হাসপাতালে সেবিকার কাজ করবে, সে ব্যবস্থাও আপনাকে করে দিতে হবে।

—ফীল্‌ড্‌ হাসপাতালের কষ্ট আর গোলা-গুলির শক্‌ তিনি সইতে পারবেন?

—আবিসিনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদা সে আমাদের পাশে পাশে ছিল।

—বেশ, আমি ডাক্তার লীমকে এখনি লিখে দিচ্ছি, হাসপাতালের সব ভার এখন তাঁরই উপর আছে।

কমরেড তখনই চিঠি লিখলেন। চিঠিখানি খামে ভরতে ভরতে জিজ্ঞাসা করলেন, গান্ধীজি ও পণ্ডিত জহরলালের স্বাস্থ্যের কথা। বললেন—ক'দিন আগে পণ্ডিতজীর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি, তিনি এখানে একটা এম্বুলেন্স ইউনিট্‌ পাঠাবার চেষ্টা করছেন শুনে বড়ই আনন্দ হোল। আমি জানি ভারতবাসীর মন বড় উদার, হাজার হাজার বছর আগে থেকে তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, আমাদের হুঃখের দিনে তাদের সহানুভূতি থেকে আমরা বঞ্চিত হব না, সেইজন্যই আপনাদের কাছে আমি প্রথম আবেদন জানাই। আমার সে আবেদন ব্যর্থ হয় নি।

চিঠিখানি ফাতুর হাতে দিয়ে কমরেড বললেন—এতে আপনার বোনের জন্য ডাক্তার লীম্‌কে লিখে দিলাম। সেখান থেকে কমরেড ফা-তু আপনাদের ফ্রণ্টে নিয়ে যাবে। সেখানে আপনারা ইচ্ছামত যে কোন বাহিনীতে যোগ দিতে পারবেন। আপনারা বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক, আপনাদের উপর আমি সাধারণ সৈনিকের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে চাই না, মনে করলে আপনারা গোলন্দাজের কাজ ছেড়ে চলে আসতেও পারবেন।

সরোজ বললে—অসমর্থ না হয়ে পড়লে যুদ্ধ শেষ হবার আগে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে আসতে হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

—আপনাদের কাছ থেকে আমরা তাই প্রত্যাশা করি,—বলে কমরেড চুটে তাদের বিদায় দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। সরোজরা তাঁর সঙ্গে হাণ্ড-সেক্ করে বিদায় নিলে।

হোটেলে ফিরে আসতেই ম্যানেজার সরোজের হাতে একখানি চিঠি দিলে, বললে—একটু আগে একজন লোক এসে চিঠিখানা দিয়ে গেল।

খামের উপর ইংরাজীতে লেখা আছেঃ মিষ্টার সরোজ, হিন্দু সাংবাদিক, হোটেলের নাম ঠিকানা।

সরোজ তখনি খামখানি ছিঁড়ে ফেললে, ভিতরে ইংরাজী চিঠিঃ

বন্ধু, মিষ্টার রণজিতের মৃত্যুতে আমরা অতীব দুঃখিত। যুদ্ধ যেভাবে চলেছে, তাতে আপনাদের সকলেরই ওই একই রকমে নিহত হবার সম্ভাবনা আছে। আমরা চাই না বিদেশীরা এসে চীনের যুদ্ধে খুন হয়। সেইজন্য বন্ধুভাবে অনুরোধ করছি আপনারা অবিলম্বে চীন ত্যাগ করুন। আশা করি আমাদের অনুরোধ রাখবেন। ইতি—জনৈক বন্ধু।

চিঠি পেয়ে সরোজ বলে উঠলো—অসম্ভব! যা করবো বলে ঠিক করেছি তা করবই, জীবন যায় সে-ও ভাল!

ফাতু বললে—এ সম্ভবতঃ মার্কিরোর লেখা!

সরোজ বললে—নাহলে এতো সস্তায় এমন সদুপদেশ আর কে দেবে!

ডেভিড বললে—সে তাহলে এখানেও এসেছে?

—সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই—ফাতু বললো—ক্রমশঃ তার আরো অনেক কীর্তিরই পরিচয় পাওয়া যাবে!

ফাতু ঠিকই বলেছিল।

কথা ছিল 'হাংচৌ'য়ে ডাক্তার লীমের সঙ্গে দেখা করে কাছাকাছি কোন একটা

'ফীল্‌ড্‌ হাসপাতালে' গিয়ে আয়েষা কাজ করবে, সরোজ ও ডেভিড চলে যাবে ফ্রন্টলাইনে।

সেইদিনই সন্ধ্যার ট্রেণে কমরেড ফাতু তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন হাংচৌয়ের উদ্দেশ্যে।

হাংচৌ পৌছবার আগেই ডাক্তার লীমের সঙ্গে ঘটলো পরিচয়।

জাপানী প্লেনের শ্যেন চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে দুখানি ট্রেণ ভর্তি হয়ে সৈন্য চলেছিল হাংচৌয়ের দিকে। সামনের সার্চ লাইট্‌টী পর্যন্ত জ্বালা হয় নি। ইঞ্জিনের ঘস্‌ঘস্‌ শব্দটাকে চাপা দেবার উপায় নেই বলেই সেই শব্দটুকু শুধু শোনা যাচ্ছে। দু' পাশে নক্ষত্রের আলোয় স্পষ্ট করে কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকারে চারিপাশ মৃতের মত স্তব্ধ, তারই বুক চিরে দু'খানি গর্জমান সরীসৃপ ধারালো লৌহবর্ত্মের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা এসে গায়ে লাগছে, তারই সঙ্গে কানে আসছে টুকরো টুকরো দুর্বোধ্য চীনা কথা।

একটানা ঝিক্‌ঝিক্‌ শব্দ ঘুমপাড়ানি গানের মত লাগে। গাড়ীর দোলা দেহকে শিথিল করে দেয়। আবেশে তন্দ্রা আসে। বসে বসে মনে হয় অদৃষ্টের অন্ধকারে অনন্ত কাল ধরে মানুষ বুঝি এম্‌নি ভাবেই চলেছে জীবনের যাত্রাপথে।

বোমারু প্লেন যে কতক্ষণ ধরে পিছু নিয়েছে তন্দ্রার ঝোঁকে সে শব্দ কানে আসেনি, সহসা প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দে প্রাণান্তকর এক ঝাঁকানি দিয়ে গাড়ীখানি থেমে গেল।

সরোজরা প্রথমে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল, সহসা করুণ আর্তনাদ কানে এসে বাজলো।

—নিশ্চয়ই বোমা পড়েছে,—বলে কামরার দরজাটী খুলে ফাতু বাইরে লাফিয়ে পড়লো।

হুড়মুড় করে সৈন্য দল নাবতে সুরু করলো।

অন্ধকারে প্রথমে চোখে ধাঁধা লেগেছিল, সামনের দিকে কয়েকটী টর্চের আলো দেখে সরোজরা সেইদিকেই এগিয়ে গেল। আলো জ্বালার উপায় নেই, মাথার উপর প্লেনের গর্জন শোনা যাচ্ছে। হাতে হাতে টর্চের আলো ঘুরছে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত। তাতে যেটুকু দেখা যায় দুখানি বগী একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ সোজা দুটী বোমা পড়েছে বগী দুখানির উপর। যারা তার মধ্যে ছিল তাদের আর্তনাদটুকু ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। কাঠ-কুটো সরিয়ে সৈন্যের দল তাড়াতাড়ি তাদের উদ্ধার করার কাজে লেগে গেল।

ফাতু ড্রাইভারকে ডেকে কি জিজ্ঞাসা করলে, তারপর সরোজকে বললে—আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরবো।

ইঞ্জিনখানা ট্রেণ থেকে আলাদা করে নিয়ে ফাতু চলে গেল।

সৈন্যের দল ততক্ষণ এক একটী করে লোককে উদ্ধার করতে সুরু করেছে। কারুর হাত নেই, কারুর পা ভেঙ্গেছে, কারুর মুণ্ডটী এমনভাবে থেঁৎলে গেছে যে আর চেনা যায় না। কারুর সারা দেহ থেঁৎলে পিষে চ্যাপ্‌টা হয়ে গেছে। যারা মরেছে তাদের তো সব শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু যারা বেঁচে আছে তাদের আর্তনাদে কান পাতা যায় না।

মাথার উপর তখনও দুখানি প্লেন উড়ছে। একখানি সহসা অত্যন্ত নীচে নেবে এল—বোমা ফেলতেই নাবলো বোধ হয়। ক'জন চীনা সেদিকে দৃষ্টি রেখেছিল, কট্‌কট্‌ করে তাদের হাতের রাইফেলগুলি একসঙ্গে গর্জে উঠলো। গতিক সুবিধা নয় দেখে প্লেনখানি বোমা না ফেলেই একটা ডিগ্‌বাজী খেয়ে উপর দিকে উঠে গেল।

সরোজ চীনাদের লক্ষ্য করে বললে—তোমরা তুলো, আইডিন আর ব্যাণ্ডেজ দিতে পার? এদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি এখনি করছি।

গার্ড বললে—নিশ্চয়ই, আমাদের এই গাড়ীতে অনেক ওষুধ-পত্র যাচ্ছে, হাংচৌয়ের মেডিক্যাল ইউনিটের জন্য।

গার্ড তখনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলো। সরোজ ডেভিড ও আয়েষার সাহায্যে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে ফাতু ডাক্তার লীম ও তাঁর দুজন সহকারীকে নিয়ে এল। সরোজদের কাজ দেখে ডাক্তার লীম তো ভারী খুসী, বললেন—এখানে এমন লোক আছে জানলে তো আমাদের আসার দরকারই হোত না।

ডাক্তার লীমের সঙ্গে সরোজদের পরিচয় হোল। ডাক্তার লীম ছিলেন পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিক্যাল-কলেজের শরীর বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কিছুদিন যুদ্ধ চলার পর আহতদের সুচিকিৎসার সুবন্দোবস্তের অভাব দেখে প্রয়োজন মত তিনি 'চীনা রেড্ ক্রশ মেডিক্যাল রিলিফ কোর' সংগঠন করেন। এই রিলিফ কোরের সাঁইত্রিশটি ইউনিট্ এখন সমগ্র চীনে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কাজ করছে।

সকালের দিকে লাইন পরিষ্কার হয়ে এল। নিহতদের কাছাকাছি এক মাঠে সমাধিস্থ করে, আহত ও সুস্থদের নিয়ে ট্রেনখানি আবার যাত্রা সুরু করলো।

হংচৌয়ের আগের ষ্টেশনে ডাক্তার লীমের ফিল্ড হাসপাতাল। আহতদের নিয়ে তিনি সেখানে নাবলেন। আয়েষাও নাবলো তাঁর সঙ্গে, চোখ দুটি তখন তার ছল ছল করছে।

সরোজ বললে—তুমি কাঁদছ নাকি আয়েষা?

—কই না! কাঁদিনি তো—বলে ছলছলে দৃষ্টিকে ঢাকবার জন্য আয়েষা তাড়াতাড়ি চলে গেল ডাক্তার লীমের সঙ্গে।

ট্রেনে ফাতু সরোজদের কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা শিখিয়ে দিলে, বললে—আমি তো আর সব সময় আপনাদের কাছে থাকবো না, কখন কি দরকার হবে তার ঠিক নেই, সকলেই কিছু আর ইংরাজী বুঝবে না, কাজেই কয়েকটী এদেশী কথা আপনাদের জেনে রাখা ভাল—

সরোজ ও ডেভিড় মুখস্থ করে নিলে—'শুই' মানে জল, 'মিয়েন-পাও' মানে রুটি, 'ফ্যান' মানে ভাত, 'তুংচি' মানে কমরেড, 'পাংয়ু' মানে বন্ধু, 'টিজেন্‌' মানে শত্রু। 'নি-হাউ' বলে অভিবাদন জানাতে হয়, নিজেদের পরিচয় 'ইন-দু-জেন', চীনাদের উৎসাহ দিতে হবে 'চাং-হ্বা-মিন্‌-কুও' বলে। আর 'তা-তাও-জি-পান' মানে জাপান ধ্বংস হোক্।

তারপরেই সরোজদের দেখা গেল ফ্রণ্ট লাইনের ট্রেঞ্চে।

সাংহাই বোম্বার্ড করে জাপানীরা হাংচৌয়ের দিকে এগিয়ে এসেছে। সহরের উত্তর প্রান্তে একটা বড় রাস্তা গভীর ট্রেঞ্চে পরিণত করে চীনারাও প্রস্তুত হয়ে আছে তাদের অভিনন্দন জানাবে বলে। ইতিমধ্যে জাপানীরা এই সহরটী কতবার যে বোম্বার্ড করেছে তার হিসাব নেই। যারা ভয় পেয়েছে তারা প্রাণের মায়ায় বাড়ীঘর ছেড়ে চলে গেছে, আর যে সব বাসিন্দারা এখনও আছে তাদের সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। সারা সহরটীর বুকে ধ্বংস আর মৃত্যুর স্তব্ধতা ঘনিয়ে এসেছে।

সরোজ ও ডেভিডের স্থান হয়েছিল একটী মেসিন গানের পাশে। সামনের কতকগুলি বালির বস্তার উপর ঠেস দিয়ে দু'জনে দিব্যি গল্প জুড়ে দিলে।

পর পর ক'রাত ঘুম হয়নি, কথায় কথায় কোন ফাঁকে সরোজ ও ডেভিডের দু'চোখ জড়িয়ে আসে। কিন্তু সুস্থির হয়ে ঘুমোবার উপায় নেই। বড় বড় ইঁদুরগুলো মাঝে মাঝে গায়ের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। তাদের শীতল স্পর্শে মনটা ছাঁৎ করে উঠে, মনে হয় বুঝিবা একটা বন্দুকের গুলি চলে গেল।

এই ভাবে রাত্রির অন্ধকার এগিয়ে চলে। সহসা কোন এক সময় এলার্ম হুইশিল বেজে উঠলো ঃ জাপানীরা আসছে—!

শাঁ শাঁ করে কয়েকটি রকেট্ উঠে গেল মাথার উপর। সেগুলি ফেটে আকাশের গায়ে কয়েকটী প্যারাচ্যুট অবলম্বন করে ভেসে উঠলো কয়েকটী আলোর দীপ্তি। সেই আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা গেল আবছায়ার মত জাপানী সৈন্য ছুটে আসছে তাদের দিকে। চীনারা বালির বস্তার ফাঁক দিয়ে বাহির-করে-দেওয়া বন্দুকের ট্রিগার টিপে ধরলো। সরোজ মেশিনগানের হাতল ধরলো, ডেভিডও তৈরী হোল।

প্রতি সেকেণ্ডে জাপানীরা নিকট হতে নিকটতর হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে তারা পাঁচশো গজের মধ্যে চলে এল। আবার হুইশিল শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সুরু হোল। সরোজ ও ডেভিড ঘুরিয়ে চললো টমিগানের মুখ—ডান দিক থেকে বাঁদিকে, বাঁদিক থেকে ডাইনে—কট্‌কট্ কট্‌কট্ কট্‌কট্···

সামনে যে ছুটন্ত মানুষগুলির ছায়া ভেসে উঠেছিল একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টায় তারা যেন সব মাটিতে মিশে গেল। তাদের পিছনে জাপানীদের কামান গর্জে উঠলো—বুম্ বুম্ বুম্!

গোটা কয়েক গোলা শিষ দিতে দিতে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। সেই গোলার আঘাতে পিছনের বাড়ীঘর ভেঙ্গে পড়ার হুড়মুড় শব্দ শোনা গেল। গোলার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পায়ের নীচের মাটী যেন থর থর করে কাঁপতে লাগলো। ধূলো, ধোঁয়া, চীৎকার ও বিস্ফোরণে এক নিমেষে স্থানটি অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো।

বিস্ফোরণের দীপ্তিতে ধূমেল কুয়াসার আস্তরণের মধ্যেও দেখা গেল বন্দুক হাতে আক্রমণকারী জাপানী সেনার ছায়া—অনেক, অসংখ্য, পরপর সাজানো একটা মানুষের দেয়াল যেন।

এবার চীনাদের ট্রেঞ্চের দিক থেকে অসংখ্য লুইস গান কট্-কট্ কট্-কট্ করে সুরু করলো গোলা উদ্‌গার করতে। আক্রমণকারী ছুটন্ত মানুষগুলির ছায়া মাঝে মাঝে যেন মুছে যেতে লাগলো অন্ধকারের বুকে। অবিচ্ছিন্ন সারিতে মাঝে মাঝে ছেদ পড়তে লাগলো।

তথাপি তারা এগিয়ে আসতে লাগলো—অগণিত মানুষ, দলের পর দল। চীনাদের গোলা উদ্‌গারের বিরাম নেই। জাপানীরাও নাছোড়বান্দা।

সহসা একটী প্রকাণ্ড গোলা এসে ফাটলো বালির বস্তার ওপাশে। কয়েকটী বালির বস্তা সরোজদের মাথার উপর দিয়ে ছিট্‌কে চলে গেল, মাটী থর থর করে কেঁপে উঠলো। এক ঝাঁকানিতে সরোজের কামানটা একপাশে কাৎ হয়ে পড়লো, ডেভিড কামানটী ধরে ঠিক করতে যাচ্ছিল, সহসা সঙীন উঁচিয়ে একজন জাপানী

সামনে লাফিয়ে পড়লো। ডেভিড হতচকিত হয়ে পড়লো, সরোজ তৎক্ষণাৎ কোমরবন্ধ থেকে পিস্তল টেনে নিয়ে তাকে গুলি করলে। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়তে না পড়তেই তার পিছন থেকে আরেকজন সরোজের সামনে এগিয়ে এসে বন্দুকের ট্রিগার টিপলো—একটী জ্বালাকর আগুনের ঝিলিক সরোজের বাঁ কাঁধটীকে ঝল্‌সে দিয়ে গেল। এক সেকেণ্ডে হাতখানি শক্তিহীন হয়ে পড়লো, মাথার ভিতর পর্যন্ত হুহু করে উঠলো।

জাপানী সেনাটী তখনি সরোজকে সঙীনে গেঁথে ফেলছিল, চোখের নিমেষে ডেভিড বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে জাপানীটীকে ধরাশায়ী করলে। তারপরে খানিকক্ষণ প্রতীক্ষা করলো, আর কেউ এগিয়ে আসে কি না।

খানিক অপেক্ষা করে যখন আর কাউকে দেখা গেল না, তখন ডেভিড সরোজের পানে ফিরলো। কাঁধের জামাটী রক্তে লাল হয়ে গেছে, ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধটী চেপে ধরে সরোজ সেইখানেই বসে পড়েছে। ডেভিড তখনই তার পাশে বসে জলের বোতলটী তার মুখের কাছে ধরলো। ক' চুমুক জল খেয়ে সরোজ যেন একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলো, আঘাতটাকে ভাল করে বোঝার জন্যে সরোজ বাঁ হাতখানি একবার নাড়াবার চেষ্টা করলে—অসহ্য যন্ত্রণা, হাতখানি মুঠো করা যায় না, দেহের প্রতিটী শিরায় যেন টান ধরে। ডেভিড একটি রুমাল বের করে সরোজের কাঁধে বেঁধে দিলে, তারপরেই তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটলো ট্রেঞ্চের মধ্যে দিয়ে।

চীনারা তখন চীৎকার করছে—চাং-হ্বা-মিন-কুও—মহাচীনের জয়!

'কলেক্‌শন্‌ ষ্টেশন' থেকে ডেভিড সরোজকে নিয়ে এল 'ফীল্‌ড্‌ হাসপাতালে'। দশটী হাজার আহতের এইটিই একমাত্র আশ্রয়। একটী বিছানা পর্যন্ত নেই, খড়ের উপর এক একটী কম্বল বিছিয়ে সব পড়ে আছে—কাছাকাছি, ঘেঁষাঘেষি। আয়োডোফর্মের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সেখানে কোন রকমে প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু সেরেই সরোজকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল 'কিউরেটিভ্‌ ইউনিটে'। সেখানকার হাসপাতালে সরোজকে ভর্তি করে নেওয়া হোল।

ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষতটা একবার পরিষ্কার ক'রে দিলে।

সরোজ জিজ্ঞাসা করলে—গুলিটি কি ভিতরে আছে?

—না বেরিয়ে গেছে।

—আঘাত কি খুব গুরুতর হয়েছে?

—না। সপ্তাহ দুই লাগবে আরাম হতে।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো—কমরেড ফাতুর সঙ্গে যে-দুজন ভারতীয় ফ্রণ্টে এসেছেন, সে কি আপনারা ?

—হ্যাঁ।

ডাক্তার পাশের আহতটীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

আয়োডিনের জ্বালায় তখন সরোজের মাথা পর্যন্ত চিন্ চিন্ করছে, ইচ্ছা হচ্ছে হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করে খানিকক্ষণ কাঁদে। দাঁতে দাঁত চেপে সরোজ চোখ বুঁজে পড়ে রইল।

সরোজ ঘুমিয়ে পড়েছিল, প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠলো! মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা গোলমাল হয়ে গেল। পরমূহূর্তেই বুম্ করে কানে এসে লাগলো আর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। কাছেই কোথাও পঞ্চাশ কি একশো পাউণ্ডের এক বোমা ফাটলো বলে সরোজের মনে হোল, হাসপাতালের বাড়ীখানি থর থর করে কেঁপে উঠলো। প্রত্যেকটী আহত চমকে উঠলো একসঙ্গে একই মূহূর্তে।

পাশের বিছানায় একটি লোক পড়েছিল—দুটি পা' কাটা, আতঙ্কে সে চীৎকার করে উঠলো।

ওদিকে আরেকজন সৈনিক ক্রুশের মত দুটি হাত বুকের উপর রেখে চীৎকার করে উঠলো—O Lord, save us from scoffers and spillers of blood! Let thy wrath to come and perish them! Let thy plague come upon the Japanese, flood and famine, death and mourning and let Japan be utterly destroyed by fire!

ওপাশ থেকে কে একজন ব্যঙ্গ করে উঠলো—O Lord, let thy judgement come upon Jesus, thy son, and let him be crucified!

কৃশ্চান লোকটী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে উপহাসকারীর মুখের পানে তাকালো, চোখের জোর থাকলে সে হয়তো তাকে ভস্ম করেই ফেলতো। প্রার্থনা ভুলে গিয়ে সে গালি দিতে সুরু করলে। তার গালি শুনে উপহাসকারী উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। নার্স বললে—আস্তে!

লোকটি একে-ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল সরোজের সামনে, বললে—কেমন আছ বন্ধু ?

সরোজ মূহূর্ত মধ্যে চিনতে পারলো, বিস্ফারিত চোখে বলে উঠলো—মার্কিরো!

—হ্যাঁ মার্কিরো,—মার্কিরো হেসে বললে—তুমি আঘাত পেয়েছ শুনে কেমন আছ তাই দেখতে এলাম বন্ধু!

সরোজ উত্তেজিত হয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। এক ঝলক রক্ত তার কাঁধের ব্যাণ্ডেজটী লাল করে দিলে। কি বলতে যাচ্ছিল, মার্কিরো বাধা দিয়ে বললে—চিৎকার কোরো না। চেঁচামেচি করলে তোমায় গুলি করতে আমি একটুও দ্বিধা বোধ করবো না।

সরোজ দেখলে তার কোটের পকেট থেকে হাতের ফাঁকে একটি অটোমেটিক পিস্তল উঁকি মারছে।

মার্কিরো বলে চললো—কিন্তু যেখানে শুধু কথাতেই কাজ হয়, সেখানে আমি অনর্থক গুলি অপব্যয় করি না। সেই জন্যই তোমাকে আমি আমার আদেশ জানাতে এসেছি। যেদিন তুমি সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বেরুবে, তার পর-দিনই জাহাজে করে তোমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবে—এই আমার আদেশ।

—অসম্ভব।

—আমার আদেশের অন্যথা হলে…

কথায় বাধা পড়লো, সামনের দরজা দিয়ে ডেভিড ও আয়েষা এসে ঢুকলো। সামনে মার্কিরোকে দেখে তারা চম্‌কে উঠলো। একই সঙ্গে দুজনের মুখে উচ্চারিত হোল—মার্কিরো!

মার্কিরো আর এক মিনিট দাঁড়ালো না, ঝড়ের মত আরেক দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

কয়েক লহমা ডেভিড ও আয়েষা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ডেভিড জিজ্ঞাসা করলে—মার্কিরো এখানে এল কেমন করে?

—কেমন করে এল তা জানি না, তবে কেন এসেছিল তা জানি!

—কেন?

—এসেছিল আমাকে শাসাতে,—বলে সরোজ সব খুলে বললে।

ডেভিড বললে—O. K. তুমি ঠিক করেছ, আমি তো এবার সামনে পেলে এক গুলিতে ওর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব! ওর স্পর্দ্ধা আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। রাস্কেল কোথাকার!

—লোকের পিছনে গাল দিয়ে আর কি লাভ হবে মিষ্টার ডেভিড,—বলে আয়েষা ডেভিডের মুখের পানে চেয়ে মৃদু হাসলে।

ডেভিড উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, আয়েষার কথায় লজ্জা পেল।

আয়েষা সরোজের বিছানার একপাশে বসে পড়লো, তার ডান হাতখানি নিজের কোলের উপর টেনে নিয়ে বললে—এখন কেমন আছ সরোজদা?

– ভাল।

সরোজের হাতের ব্যাণ্ডেজটার উপর দৃষ্টি পড়তেই আয়েষা বলে উঠলো—ইস্! এরা ভাল করে একটা ব্যাণ্ডেজও বেঁধে দেয়নি, ওটা যে রক্তে ভিজে গেছে।

—ও আমারি দোষে, উত্তেজিত হয়ে আমি উঠে বসেছি তাই—

—এ তোমার ভারী অন্যায় সরোজদা। এমনি করলে কি করে সারবে বলত? দেখছি এখানেই আমাকে এখন কিছুদিন থাকতে হবে!

ডেভিড বললে—সেই জন্তেই তো দশ মাইল পথ গিয়ে তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম।

—কিন্তু এখানকার চেয়ে সেখানে আয়েষাকে দরকার অনেক বেশী।

—তা জানি, কিন্তু ইংরাজীতে charity must begin at home বলে একটা কথা আছে জান ত? আগে নিজের লোকদের সেবা করি, পরে বাইরের লোকদের সেবা করার অনেক সময় পাব!

আয়েষা ক'দিন সেইখানে রয়ে গেল। হাসপাতালের কাজকর্মে সহায়তাও করে, আবার অবসর সময়ে সরোজের বিছানার পাশে এসে বসে।

ক'দিনের মধ্যে আলাপ হোল অনেকের সঙ্গে।

পাশের বেডের এক যুবক আয়েষার নাম দিয়েছে—Indian Nightingale আয়েষাকে দেখলেই সে কিছু-না-কিছু বলবেই। একদিন বললে—আপনাদেরকে ওরা বলে 'ব্ল্যাকি' (Blackie) আমি তো দেখছি, আপনাদের গায়ের রং অনেক সাহেবের চেয়ে ফর্সা।

সরোজ হাসতে হাসতে বলে—আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না, নিজেকে তো আর নিজে দেখা যায় না।

—কেন দেখা যাবে না, পকেটে একখানি আরসী রাখবেন, যখনি পাশাপাশি কোন সাহেবসুবা দেখবেন, অমনি আরসীখানা বা'র করে মিলিয়ে দেখে নেবেন—বলে সে হি-হি করে হেসে উঠে।

যুবকটীর বয়স বছর আঠারোর বেশী হবে না। স্কুল শেষ করে সবে সে কলেজে ভর্তি হয়েছিল, এমন সময় এক বোমা বিস্ফোরণে আহত হয়। সে পথে পড়েছিল। দিন তিনেক আগে সেবা-সমিতির লোকেরা তাকে তুলে এনেছে।

ওদিক থেকে সেই কৃশ্চান ভদ্রলোকটি প্রায়ই সুর তোলেন—O Lord, save us from sins, sufferings and pangs of death!

দু'হাত বুকের উপর ক্রুশের মত রেখে বিড় বিড় করে সে কত মন্ত্র পড়ে, মাঝে

মাঝে 'হে প্রভু' 'হে যিশু' এমনি দু'-একটা অস্পষ্ট উক্তি শোনা যায়। লোকটি যে যন্ত্রণায় বিশেষ কাতর হয়ে পড়েছে, তা সহজেই বোঝা যায়।

কিছুক্ষণ পরে সে সহসা প্রশ্ন করলে—আপনারা ভারতীয়, না ?

—হ্যাঁ।

—শুনেছি আপনাদের দেশে অনেকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আয়ত্ত করে অনেক আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ করে, লোকের মুখের পানে তাকিয়েই অনেক কথা আপনারা বলতে পারেন। দেখুন তো আমার মুখের পানে, আমায় দেখে কি মনে হয়, আমি মারা যাব ? মৃত্যুর ছায়া পড়েছে আমার মুখের উপরে ? এই মাত্র আমি স্বপ্ন দেখলাম, কতগুলি কালো-কালো সয়তান আমার বিছানার চারিপাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা আমায় বলছে—চল, তোমার যাবার সময় হয়েছে, আমরা তোমায় নিতে এসেছি !

আয়েষা হাসতে হাসতে বললে—আপনি বড় বেশী ভয় পেয়েছেন, অত ব্যাকুল হবেন না।

—ব্যাকুল হব না, বলেন কি ? আমি যদি আজ মরে যাই আমার বউ-ছেলে-মেয়ে খেতে পাবে না। আমি সারাদিন কাগজের ফুল তৈরী করে যা রোজগার করতাম, তাইতে কোন রকমে দুবেলা অন্ন জুটতো, আমি মরলে তারা খাবে কি ?

তার চোখ দুটি সজল হয়ে উঠলো, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলো—ভগবান, তোমার দয়া নেই !

লোকটী দুহাতে মুখ ঢাকলো।

চীনা নার্সটী তার কাছে এগিয়ে গেল, সস্নেহে তার কপালের উপর হাত রেখে বললে—কেন কাঁদছ ? কেঁদে কি হবে ? তোমাদের যিশুকেও তো ক্রুশে বেঁধা হয়েছিল, তিনি তো এতটুকু চোখের জল ফেলেন নি।

—আমি তো আর যিশু নই।

খানিক পরে ডাক্তার এল, তার দু'পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেললে, তখনও তার রক্ত পড়া থামেনি। সকালে ইঞ্জেকসন করেছিল, তাতেও কোন ফল দেয়নি দেখে বললে—হোপলেশ্‌ !

—হোপলেশ্‌ ? কে বললে আমি মরবো ? তোমরা জোর করে কতকগুলো যা-তা ওষুধ ইঞ্জেকসন করে আমায় মেরে ফেলতে চাও !

ডাক্তার সে কথার কোন জবাব দিলে না, ক্ষিপ্র হস্তে একটী নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে।

ভদ্রলোক দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কাঁদতে লাগলো।

অত্যধিক রক্তক্ষয়ে সন্ধ্যা থেকেই সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। পর দিন সকালে ষ্ট্রেচারে করে তার মৃতদেহ বাহির করে নিয়ে গেল।

তখনি আরেকজন তার জায়গায় ভর্তি হয়ে গেল। লোকটীর বোধ হয় জ্ঞান ছিল না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চৈতন্য হোল। জ্ঞান যে ফিরে এসেছে তা বোঝা গেল লোকটীর কাৎরানি শুনে।

নার্স এসে চীনা ভাষায় তাকে কি বললে, ওষুধের গ্লাসটা তার মুখের কাছে ধরলে, চীনাটি তা হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

নার্স্ এবার তাকে এক ধমক দিলে।

চীনাটীও তার কি একটা কড়া জবাব দিলে।

নার্স রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল, চীনাটি হি-হি করে হেসে উঠে চীৎকার করে গানের স্থর ধরলো।

আয়েষা নার্সকে জিজ্ঞাসা করলে—ও কি বলছে ?

—যত সব ছোটলোক, এক পেট মদ গিলে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে।

—তবে যে গান গাইছে বলে মনে হচ্ছে !

—গান না ছাই, ফেরিওলার বয়েৎ :

'লে যাও মিষ্টার পাঁচ সেণ্ট
হরেক রকম পাঁচ সেণ্ট
জার্মানী মাল পাঁচ সেণ্ট
জাপানী মাল পাঁচ সেণ্ট
সস্তাওলা পাঁচ সেণ্ট
স্থবিস্তাওলা পাঁচ সেণ্ট'—এই।

আগে রাস্তায় জিনিষ ফেরি করত, বোমা খেয়েও তা ভুলতে পারেনি, তার উপর কিছু মদ এখনও পেটে গজগজ করছে।

ফেরিওলা এবার ফরফর করে ইংরাজী বলতে স্থরু করলো—আপনি আমায় ছোটলোক বললেন, মাতাল বললেন, কি করে বুঝলেন আমি মদ খেয়েছি ?

—সে আমি ঠিক বুঝি। মাতাল নাহলে কেউ অমন গাঁক্ গাঁক্ করে চেঁচায় না—বলে নার্স চলে গেল।

ভদ্রলোক অয়েষার পানে ফিরে বললে—চেঁচাই কি শুধু-শুধু ? যন্ত্রণা যা হচ্ছে কি বলব !

—নার্সকে বললেন না কেন?

—বলে কি হবে? অসংখ্য লোকের যন্ত্রণা অবিরাম চোখের উপর দেখতে দেখতে ওদের মন পাথর হয়ে গেছে। কলের মত সময় মাফিক ওষুধ দিয়েই ওরা কর্তব্য শেষ করে।

—ওষুধ হলেই তো আপনার যাতনা কম পড়বে।

- ওষুধ কি আর ওরা আমার মনোমত দেবে, নিজেরা যা বোঝে তাই ব্যবস্থা করবে।

—আপনার মনোমত মানে? রোগীর মনের মত করে ডাক্তার ওষুধ দেয় নাকি কখনও?

—আমিও ডাক্তার। চার বছর ডাক্তারী পড়েছি। এখন আমার কি ওষুধ সব চেয়ে বেশী দরকার তা আমি জানি—শুধু এক ডোজ মর্ফিয়া, ব্যাস, ঘণ্টা কয়েকের মত একেবারে নিশ্চিন্ত।

—মর্ফিয়া! সরোজের সঙ্গে ছোট এক শিশি মর্ফিয়া ছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসার সময় সে ওটা সংগ্রহ করেছিল। যদি আহত হয়ে বুঝতে পারে মৃত্যু অনিবার্য তখন যাতনা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ওই মর্ফিয়াটুকু মুখে ঢেলে দিলেই চলবে।

লোকটী ততক্ষণে আবার গোঁয়াতে গোঁয়াতে ফেরিওলার বয়েৎ আবৃত্তি করতে সুরু করেছে। সরোজ পকেট থেকে মর্ফিয়ার শিশিটী বাহির করে আয়েষার হাতে তার কাছে পাঠিয়ে দিলে, বললে—এই নাও, সবটা খেও না, মারা পড়বে, অর্দ্ধেকটা খাও—

লোকটী হাসলে, তারপর এক চুমুকে শিশিটী খালি করে দিলে।

আয়েষা বললে—সবটা খেয়ে ফেললে?

—হ্যাঁ! আমি জানি আমি আর বাঁচবো না, বেশী যাতনা পেয়ে মরার চেয়ে আগেই মরা ভাল! আমার মৃত্যুর যাতনা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ!

ক'মিনিটের মধ্যেই সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো, সে ঘুম আর ভাঙলো না।

ও পাশে কয়েকজন মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য ভাষায় চীৎকার করে উঠছে, কখন-কখন ইংরাজীও বলছে—আমি লড়বো না! আমি চাই না চীনদেশ জয় করতে!

ডাক্তার সরোজের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বদলে দিচ্ছিল, সরোজ জিজ্ঞাসা করলে

—ও লোকগুলি জাপানী নাকি?

ডাক্তার বললে,—হ্যাঁ।

—জাপানীদেরকেও আপনারা এখানে নিয়ে এসেছেন ?

—ক্ষতি কি ? বিনা চিকিৎসায় মাঠের মাঝে মরে পড়ে থাকতো, সেটা কি ভাল ?

—হাজার হোক্ আপনাদের শত্রু তো !

—সেই জন্যই তো প্রতিশোধ নিচ্ছি। ও যখন সুস্থ হয়ে দেশে ফিরবে, তখন এই শত্রুতার কথা মনে ভাবতে লজ্জা পাবে, সেইদিনই হবে ওর সত্যিকারের পরাজয়।

ডেভিড হয়তো এই কথা নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে এক দীর্ঘ তর্ক বাধিয়ে বসতো, কিন্তু সে সুবিধা পাওয়া গেল না, পাশের ঘরে একটা জরুরী কেস দেখার জন্য ডাক্তারের ডাক পড়লো।

হাসপাতালের দিনগুলি একটানা বৈচিত্র্যহীন—আহতদের আর্তনাদ, ডাক্তারের আনাগোনা, ওষুধের রঙীন শিশি, আয়োডোফর্মের গন্ধ। তারই মধ্যে ডেভিড ও আয়েষা সরোজের সময়টা বৈচিত্র্যময় করে তোলে কথাবার্তায়, গল্প-গুজবে।

সময় যেন আর কাটতে চায় না, শুয়ে থেকে সরোজ ক্লান্ত হয়ে উঠে।

ডেভিড বাইরে গেলেই একখানি করে খবরের কাগজ জোগাড় করে আনে। যতক্ষণ কাগজখানি পড়া যায় ততক্ষণ তবুও একটু নতুনত্ব।

দিন পাঁচেক পরে আবার জাপানী প্লেনের গর্জন শোনা গেল মাথার উপর, তারপরেই বুম্ বুম্ করে বোমার বিস্ফোরণ, হাসপাতালের বাড়ীটা কেঁপে উঠতে লাগলো, বাসুকীর মাথায় কম্পমানা পৃথিবীর মত।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ষ্ট্রেচারে-বয়ে-আনা আহতের সংখ্যায় হাসপাতাল ভর্তি হয়ে গেল। কোথাও আর তিল ধারণের স্থান রইল না।

একটী ছেলেকে এনে সরোজের পাশে মাটির উপর রাখলো। বয়স বছর ষোলর বেশী হবে না। তার গায়ের উপর একটী বোমা ফেটেছে, চিবুক ও নাকের খানিকটা উড়ে গেছে। বীভৎস দেখতে। তার তুলনায় সরোজের কিছুই হয়নি বলা চলে। সরোজ নিজের খড়ের বিছানাটী তার জন্য ছেড়ে দিলে।

সরোজ ততদিনে প্রায় সুস্থ হয়েই এসেছে। ডাক্তার বললে—আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই আপনি ফ্রণ্টে ফিরে যেতে পারবেন।

বিকালের দিকে ডেভিড ও আয়েষার সঙ্গে সরোজ বেড়াতে বাহির হয়।

হাসপাতালের পিছনেই ছোট একটী গাঁ। এক জায়গায় কয়েকটী ছোট ছোট পাথরের বাড়ী, সরু একটী পথ কূয়াতলার পাশ দিয়ে বাড়ীগুলির গা ঘেঁসে দিগন্তে পাহাড়ের কোলে মিলিয়ে গেছে। তার পিছনে পাহাড়ের সারি।

গ্রামখানির ভিতরে গেলেই একদল যুদ্ধ-ভীত শীর্ণ অধিবাসী চোখে পড়ে। তাদের দেখলেই চেনা যায়, ফাঁকা মাঠের বুকে জলে ভিজে রোদে পুড়ে লাঙল চালিয়ে, মিল্ ও ফ্যাক্টরির বদ্ধ ঘরের মধ্যে দিনের পর দিন প্রাণকে ক্ষয় করে যারা নিজেরা খেতে পায় না, আরেক দল লোককে মোটা হবার ও মোটর চাপার স্থবিধা করে দেয়, এরা তারাই।

ক'দিন পর-পর এই গ্রামটীর উপর জাপানীরা বোমা ফেলেছে। যাদের সংস্থান ছিল, তারা ইতিমধ্যেই ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, আর যারা একেবারে নিঃসম্বল তারা অদৃষ্ট মেনে বসে আছে তখনও।

গ্রামের অদূরে এক টিলার উপর একখানি প্রকাণ্ড পাথরে হেলান দিয়ে সরোজ বসে ছিল। প্রতিটী সন্ধ্যা এখানে তারা উপভোগ করে। পশ্চিমের সূর্যকে ঢাকা দিয়ে দেয় এক তুষার ঢাকা পাহাড়ে চূড়া। রবির কিরণ প্রতিহত হয়ে তির্যক্ ভাবে এসে পড়ে অন্যান্য পাহাড়ের মাথায়। চারিপাশে মৃত্যুর স্তব্ধতা। একটা পাখীর কাকলীও কানে আসে না। নীল আকাশের গায় পেঁজা তূলার মত টুকরো টুকরো মেঘ ছড়িয়ে আছে, তাদের সীমান্তের রেখায় রেখায় রূপালী আলোর আভাষ জাগে। বেলা যত পড়ে আসে, ততই সেই মেঘের গায় রঙীন খেলা সুরু হয়। কঠিন আকাশস্পর্শী পাহাড়ের চূড়াগুলি দূর থেকে বিলীয়মান ধূঁয়ার মত লাগে। চারিপাশে সীমাহারা দিগন্ত বিরাট জগতের বুকে মানুষের ক্ষুদ্রতাকে প্রকাশ করে দেয়। জগতের অগণিত মানুষের মাঝে থেকেও প্রত্যেকটী মানুষ কত নিঃসঙ্গ কত একা তা এই দিগন্ত-বিস্তারী নিস্তব্ধতার মধ্যে সরোজরা ভাল করেই বুঝতে পারে। সেইজন্যই এই যুদ্ধময় চীনের জন-কোলাহলের মধ্যে এই স্থানটীকেই তারা অবসর বিনোদনের কেন্দ্র করেছে।

সেদিন গ্রামকে পাশ কাটিয়ে যখন তারা টিলাটীর দিকে যাচ্ছে, এমন সময় কাছেই এক বাড়ীতে কিসের একটা গোলমাল শোনা গেল, তারপরই ভেসে এল মেয়েদের আর্তনাদ।

সরোজ বললে—চল তো একবার দেখে আসি।

একটী বাড়ীর সামনে এসে দেখলে, দুজন চীনা সৈনিক গজ্ গজ্ করছে। তাদের সামনে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধা ও একটী মেয়ে। তারা কি

বলছে তার একটী বর্ণও বোঝা গেল না। সহসা একজন সৈনিক মেয়েটীকে ধাক্কা দিয়ে জোর করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল, তার পিছনে দ্বিতীয় সৈনিকটীও ঢুকলো। ভিতরে একটা ব্যাকুল স্বর ও কাশির শব্দ শোনা গেল। বৃদ্ধাটী তাড়াতাড়ি ছুটে গেল ঘরের মধ্যে, কৌতূহলী সরোজরাও তার অনুসরণ করলো।

ভিতরে একটী শীর্ণ যুবক একখানি খাটের উপর বসে আছে। চীনা সৈনিক দুজন হাত ধরে তাকে নামাবার চেষ্টা করছে। যুবকটী প্রাণপণে খাটের একটা দিক চেপে ধরেছে। হাল্কা ছোট খাট, দুজনের টানা-টানিতে হড়হড় করে এগিয়ে আসছে। শীর্ণ যুবকটীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে, হঠাৎ কাশির ধমকে তার সারা দেহ কেঁপে উঠলো। আঁকু-পাকু করে বৃদ্ধা ও মেয়েটী ছুটে এল তার পাশে।

সরোজদের দেখেই একজন চীনা রুখে দাঁড়ালো। ইংরাজীতে বললে—তোমাদের এখানে কি চাই?

ডেভিড বললে—জানতে চাই তোমরা এখানে এমন অন্যায় করছ কেন? এর কারণ কি?

চীনাটী বললে—এখনও তো কিছুই করিনি, ওদের মেরে তাড়াব। যত সব জাপানী স্পাই, এখানে বসে বসে জাপানে খবর পাঠায়।

রুগ্ন যুবকটী খক্‌খক্ করে কাশতে কাশতে সরোজদের কি বললে, ঠিক বোঝা গেল না, শুধু একটা কথা শোনা গেল—থাইসিস্। থাইসিস্!

—থাইসিস্!—চীনাটী তর্জন করে উঠলো—ওসব বাজে কথা আর শুনবো না, ওসব মিছে কথায় আর ভুলছিনে। তোমাদের আর একমিনিট এখানে থাকতে দেব না। নেবে এসো—নাবো—

যুবকটীর হাত ধরে চীনাটা প্রচণ্ড এক ঝট্‌কা মারলে।

যুবকটী পড়ে যাচ্ছিল, কোনরকমে সামলে নিলে। খক্ খক্ করে একবার কেশে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠে গেল। মা ও মেয়েটী তার বুকে হাত বুলিয়ে দিলে, সৈনিকটীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু নির্মম সৈনিকটী হাত ছাড়লো না, তাদের ব্যাকুলতা দেখে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো।

মেয়েটী আয়েষার পানে তাকিয়ে ব্যাকুল ভাবে বললে—ওরা আমার ভাইকে মেরে ফেলবে, আপনারা দাঁড়িয়ে দেখবেন? আমাদের টাকা নেই বলে আমরা কোথাও যেতে পারছি না, আপনারা দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন!

ইংরাজী কথার ধরণ শুনে বোঝা গেল মেয়েটী উচ্চ শিক্ষিতা।

চীনা সেনা দুটী তর্জন করে উঠলো—ওরা কি করে তোমাদের সাহায্য করবে শুনি ? আমাদের দেশে আমরা জাপানীদের থাকতে দেব না, তোমরা এখনি এখান থেকে চলে যাও।

—এই রোগা ছেলেকে নিয়ে এখন কোথায় যাই ?—মহিলা বললেন।

—যেখানে খুসী। তোমাদের জাপানে যাও না—নিপ্পনে, তোকিওতে !

—টাকা ?

—তার আমি কি জানি ? তোমাদের প্রিন্স হিরাতো আছেন, কনোয়ে আছেন, তাদের কাছে যাও না, গেলেই টাকা পাবে !

—এই রুগ্ন ছেলেটিকে নিয়েই যত মুস্কিলে পড়েছি বাছা, তোমরা আমায় ক'দিন সময় দাও, ও একটু সুস্থ হলে, একটু চলতে পারলেই আমরা এখান থেকে চলে যাব।

—ওসব কোন কথা আমরা শুনতে চাইনা, তোমাদের আর এখানে এক সেকেণ্ডও থাকতে দেব না ? যাও, তোমরা এখনি এখান থেকে চলে যাও।

একজন চীনা এগিয়ে গিয়ে রুগ্ন ছেলেটীকে জোর করে খাট থেকে নামিয়ে দিলে। উত্তেজনা ও কাশির আবেগে যুবকটীর সারা দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

সরোজ এগিয়ে গিয়ে একজন চীনার হাত ধরে বললে—বন্ধু, তোমরা চীনদেশের গৌরব, দেশের জন্য তোমরা জীবন পণ করেছ, তোমরা লেখাপড়া শিখেছ—তোমাদের কি এমন নিষ্ঠুর হওয়া সাজে ? দেখছ তো ও একটা থাইসিসের রোগী, মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে—

—ওসব দেখতে যাব কেন ?—সৈনিকটী বাধা দিয়ে বললে—ওরা আমাদের উপর বোমা ফেলবে আর আমরা ওদের দয়া করবো, কেন ?

—বোমা তো ওরা ফেলেনি ভাই !

—ও আপনি যাই বলুন, জাপানীদের আমরা এখানে থাকতে দেব না। আজ এখান থেকে ওদের আমরা তাড়াবই।

দুজনে ছেলেটীর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনলে দরজার কাছে ; ছেলেটী খক্‌খক্ করে কেশে উঠলো। ডেভিড আর সইতে পারলো না, পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে রুখে দাঁড়ালো, বললে—তোমরা ভাল কথার লোক নও দেখছি। এখনি যদি তোমরা দুজনে এ-বাড়ী থেকে বেরিয়ে না যাও তো আমি এখনি তোমাদের গুলি করবো !

ডেভিডের হাতে পিস্তল দেখে তারা ঘাবড়ে গেল, তাদের কারুর কাছেই কোন অস্ত্র ছিল না। নিরুপায় হয়ে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় শাসিয়ে গেল—সুবিধা পেলে আমরাও দেখিয়ে দেব!

সরোজদের মুখে উপেক্ষার হাসি ফুটে উঠলো।

বৃদ্ধা সস্নেহে সন্তর্পণে যুবকটিকে ধরে আবার বিছানায় শুইয়ে দিলে, মেয়েটি সরোজদের জানালে অশেষ ধন্যবাদ, বললে—এই উপকার তারা কোনদিন ভুলবে না।

আয়েষা বললে—আপনারা এখান থেকে চলে গেলেই তো পারেন।

—কি করে যাই! সাংহাইয়ে ছিলাম, ওখানে আমাদের একটা বড় হোটেল ছিল; বোমা পড়ে এক রাত্রে তা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তারপর কোন রকমে এখানে চলে এসেছি। এই বাড়ীখানি খালি পড়েছিল। এখানেই আশ্রয় নিয়েছি। এখন যাই কোথা? হাতে একটী পয়সা নেই।

ক্ষীণস্বরে ছেলেটি বললে—তার উপর এখন আমার শরীরের যা অবস্থা তাতে কোথাও যাতায়াতের পরিশ্রম এখন আমার সইবে না। আর ক'দিনের মধ্যেই হয়তো আমি মারা পড়বো!

মায়ের চোখ সজল হয়ে উঠলো।

বোন বললে—এমন কথা বলতে নেই ভাই, ও সব তুমি ভেবো না। আমি বলছি, দেখো এবার তুমি ঠিক সেরে উঠবে।

রুগ্ন ছেলেটী একটু হাসে—অবিশ্বাসের হাসি।

তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সরোজরা বাহির হয়ে এল।

কিছুদূর এসে যেই একটা মোড় ফিরেছে, অমনি এক বাড়ীর দেয়ালের আড়াল থেকে একটী চীনা সৈনিক লাফিয়ে এসে পড়লো সরোজের সামনে, আচম্বিতে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলো সরোজের মুখে, তর্জন করে উঠলো—You bloody Hindu!

সরোজের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে উঠলো; সে তাল সামলাতে পারলো না, ঘুরে পড়ে গেল।

ডেভিড এগিয়ে এল সরোজকে সাহায্য করার জন্য, কিন্তু তখনি পিছন থেকে মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সে পড়ে গেল সংজ্ঞাহীন হয়ে।

সরোজের কানে এসে যেন বাজলো—আয়েষার আর্তনাদ। সে চীৎকার যেন দূর হতে দূরান্তরে সরে যাচ্ছে, ইচ্ছা হোল একবার চোখ মেলে তাকায়

কিন্তু পারলো া, মাথার মধ্যে তখনও ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে, সারা দেহ কেমন যেন আচ্ছন্ন, অবশ !

শেষে আয়েষার গলা আর যেন কানে গেল না। অর্দ্ধচেতন সরোজ শক্তিহীন স্থাণুর মত পড়ে রইল।

সরোজ ও ডেভিড পথের উপর কতক্ষণ পড়েছিল কে জানে। চীনা স্বেচ্ছাসেবকেরা দেখতে পেয়ে বোমাহত মনে করে তাদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেল।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে একটু সুস্থ হয়েই সরোজরা মিলিটারী হেড্‌কোয়ার্টার্সে গিয়ে ফাতুর সঙ্গে দেখা করলে।

ফাতু তখনি সেই অঞ্চলের সব থানায় টেলিফোন করলে—আয়েষার অপহরণের কথা। তারপর সরোজের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো যেখানে সরোজরা মার খেয়েছিল, সেই অঞ্চলে অনুসন্ধান করতে।

রাত দশটা পর্যন্ত ঘুরেও কোন লাভ হোল না। আয়েষার কথা কেউ কিছুই বলতে পারলে না। ফাতু সে-অঞ্চলের কয়েকটা জুয়ার আড্ডাও ঘুরলো কিন্তু আয়েষার কোন পাত্তা মিললো না।

কম্‌রেড্‌ ফাতু বল্‌লে—আপনারা একেবারে হতাশ হয়ে পড়বেন না। এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। দু-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমাদের পুলিশ ঠিক সন্ধান বের করে দেবে; কিচ্ছু ভাব্‌বেন না। হয়তো পুলিশ সন্ধান দেবার আগে তারা নিজেরাই খবর পাঠাবে আপনাদের কাছে।

—তারা নিজেরাই খবর পাঠাবে ?—সরোজ বিস্মিত হোল।

—হ্যাঁ লিখে পাঠাবে,—এতো টাকা যদি দাও তাহলে তোমাদের বোনকে ফেরৎ দেব। আজকাল যেমন আমেরিকায় একদল ডাকাত হয়েছে, এরাও ঠিক তেমনি।

সরোজ বললে—তত টাকা যদি না দিতে পারি ?

—সে তখন ঠিক ব্যবস্থা করা যাবে, আগে থেকেই অত উতলা হচ্ছেন কেন ? —বলে ফাতু সান্ত্বনা দিল বটে, কিন্তু সরোজের উৎকণ্ঠা তাতে বিশেষ কিছু কম্‌লো বলে মনে হোল না।

কোয়ার্টার্সে এসে তারা সত্যই একখানি চিঠি পেলে। ফাতুর নামে চিঠি অথচ ভিতরের পত্রখানি সরোজকে উদ্দেশ করে লেখা :

মিষ্টার সরোজ, আপনার বোনকে আমি জামিন রাখলাম। তার এবং

আপনাদের দুজনের যদি সত্যই মঙ্গল চান, তাহলে অবিলম্বে সাংহাইয়ে এসে আমাদের কাছে আত্মসমর্পন করুন। আপনাদের বোনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা মুক্তি-মূল্য পেলেই সাংহাই থেকে আপনাদেরকে আমরা নিরাপদে ভারতে পৌঁছে দেব, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি আপনারা সাংহাইয়ে এসে আত্মসমর্পণ না করেন, তাহলে পরের জাহাজেই মিস্ আয়েষাকে জাপানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এবং তোকিওর বাজারে তাকে 'গায়শা' * হিসাবে বিক্রী করা হবে। ইতি—

বিনীত—মার্কিরো

চিঠিখানা পড়ে কমরেড ফাতু বললে—তাহলে আপনাদের সাংহাই যাবার ব্যবস্থা করে দিই।

সরোজ খানিকক্ষণ চিঠিখানার পানে তাকিয়ে থেকে মুখ তুলে বললে—আপনার কি মনে হয় মার্কিরোর কথায় আমরা আস্থা রাখতে পারি ?

—সেটা নিজেরা ভেবে দেখুন। আমি কিছু বল্‌লে পরে আপনারা আমার উপর দোষ দেবেন, বলবেন 'আপনার কথা শুনে এই হোল।'

সরোজ বললে—সে তো ঠিক কথা, কিন্তু মার্কিরোর এই চিঠি সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয় ?

—আমার মনে হয় আপনার বোনকে যারা হরণ করেছে তাদের সঙ্গে মার্কিরোর কোন যোগাযোগ নেই। তারা একটা মুক্তিপণ পেলেই আপনার বোনকে ছেড়ে দেবে। মার্কিরো সেই খবরটা পেয়ে এই সুযোগে আপনাকে এদেশ থেকে সরিয়ে দিতে চায়। জাহাজে উঠে আপনি দেখবেন কেউ কোথাও নেই, কিন্তু তখন আর জাহাজ থেকে নেবে আসার উপায় থাকবে না।

সরোজ বললে—কিন্তু এখন তাহলে আমাদের কি করা উচিত ?

ফাতু বললে—মিস্ আয়েষার যে ছবিখানি পাসপোর্টে আছে, সেটা এই অঞ্চলের প্রত্যেকখানি খবরের কাগজে কাল যেন বের হয়, আমি তার ব্যবস্থা করছি। তার সঙ্গে একটা পুরস্কারও ঘোষণা করবো। কাল সকালে আপনাদের নিয়ে আমি একবার ব্যারাকে যাব, সেই সৈনিক দুজনকে যদি সনাক্ত করতে

---

* গরীব জাপানীরা পেটের দায়ে তাদের মেয়েদের বিক্রী করে দেয়। প্রায় তিরিশ টাকা থেকে তিনশো টাকা পর্যন্ত একটী মেয়ের মূল্য দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীরা তাদের নাচ-গান শিখিয়ে মজলিশে ও ভোজসভায় নাচিয়ে গাইয়ে পয়সা উপায় করে। এই সব মেয়েদের গায়শা বলে। এযুগে পৃথিবীর আর কোন সভ্যদেশে এমনভাবে মানুষ কেনা বেচা হয় না।

পারেন তাহলে তো আর কথাই নেই। তাছাড়া পুলিশদের কড়া আদেশ দিয়ে দিয়েছি যেন একটী কুকুর বেড়াল পর্যন্ত দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে না পালাতে পারে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, মিস্ আয়েষাকে ঠিক পাওয়া যাবে, আমাদের নিজেদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে !

পরদিন সকালে সরোজরা গেল সেনা ব্যারাকে। ড্রিলের সময় প্রত্যেকটি সৈন্যের মুখ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তারা বিশ্লেষণ করে দেখলো কিন্তু সে দু'জন সৈন্যকে সনাক্ত করতে পারলো না।

ফাতু বললে—কাল সন্ধ্যায় একদল ফ্রণ্টে গেছে, তাদের মধ্যে যদি সেই দুজনও গিয়ে থাকে ; চলুন কাল আপনাদের ফ্রণ্টে নিয়ে যাই।

ডেভিড বললে—কিন্তু আমার মনে হয় ফ্রণ্টে যাবার আগে এই অঞ্চলে একবার মার্কিরোকে ধরার চেষ্টা করলে কেমন হয় ?

—কি করে ধরবো ?—ফাতু জিজ্ঞাসা করলে !

ডেভিড বললে—একই দিনে যদি এই অঞ্চলের প্রত্যেক বাড়ীখানি আমরা সার্চ করি—

—তাহলেও তাকে ধরা যাবে না। 'মেক্ আপ্' করায় সে সিদ্ধহস্ত, তাছাড়া চীনা ভাষা সে মাতৃভাষার মত বলে যেতে পারে। জানিয়ে-শুনিয়ে ব্যাপকভাবে সার্চ করে তাকে গ্রেপ্তার করা শক্ত। অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে ধরতে না পারলে সুবিধা হবে না। সেইজন্য আমরা ছদ্মবেশী পুলিশে নগর ছেয়ে ফেলেছি, সামান্য অসাবধান হলে ধরা পড়ে যাবে। তার চেয়ে আপনারা আমার সঙ্গে ফ্রণ্টে চলুন, সেই সৈনিক দুজনকে আগে সনাক্ত করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় সরোজরা ফ্রণ্টের দিকে যাত্রা করলো।

সরোজদের লরীখানি ট্রেঞ্চের কাছে এসে থেমেছে, এমন সময় মাথার উপর খান কয়েক জাপানী প্লেন দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল মুহুর্মুহু বোমাপাতের শব্দ। প্লেনগুলি বোমা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে এল। লরীর হেড্‌লাইট নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে সরোজরা অপেক্ষা করতে লাগলো।

সহসা একটী বোমা এসে পড়লো একেবারে লরীটির সামনে—চল্লিশ পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে। লরীখানা লাফিয়ে উঠেই কাৎ হয়ে পড়লো একদিকে। যে ক-জন লরীর উপর ছিল, নীচে লাফিয়ে পড়লো। তখনি আর একটা বোমা পড়ার প্রতীক্ষায় সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

সরোজদের সঙ্গে একটী কিশোর বয়সের সৈনিক ছিল। ইস্কুল ছেড়েই বেচারা বোধ হয় সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে। মৃত্যুর এমন অতর্কিত রূপ দেখে তার চোখ দুটী বিস্ফারিত হয়ে গেল, ম্যালেরিয়া-রোগীর মত সে কাঁপতে লাগলো, বলে উঠলো—আমি পালাব।

কম্রেড ফাতু তার মুখের পানে তাকিয়ে মৃদু হাসলো।

কর্পোর্যাল জিজ্ঞাসা করলে—কি বলছ ?

ছেলেটী বললে—আমি লড়াই করতে পারবো না, আমি বাড়ী ফিরে যাব।

—লড়াই তোমাকে করতেই হবে !

—আমি পালাব।

—পালাবার চেষ্টা করলেই আমি তোমাকে গুলি করবো।

—কেন তুমি অ'ন্যায় গুলি করবে ? আমার ইচ্ছা নেই আমি লড়বো না

ছেলেটী আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কর্পোর্যাল কিন্তু রুক্ষ হয়ে উঠলো, বললে—এতো লোক মরছে, আর তোমার জীবনটাই বড় হোল ? তুমি আমি কেউ নই, আমাদের কোন মূল্য নেই—যদি না আমাদের স্বাধীনতাকে, আমাদের জাতিকে, আমাদের দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। আমাদের জীবন দিয়েও তা রাখতে হবে, আমাদের জীবনের চেয়েও তার মূল্য বেশী !

ছেলেটী কর্পোর্যালের কথা ঠিক বুঝলো কি না কে জানে, তবে হতাশভাবে ঝুপ্ করে সেইখানেই বসে পড়লো, মনে মনে কয়েকটী দুর্বোধ্য প্রশ্নের সে বোধ হয় উত্তর খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিল—কেন সে মরবে ? এমন সুন্দর জগৎ থেকে কেন সে বিদায় নেবে ? দেশ, জাতি ও স্বাধীনতার চেয়ে তার জীবনের মূল্য কম হবে কেন ? ইত্যাদি ··

কর্পোর্যাল ছেলেটীর কাঁধে এক প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে বললে—বসে পড়লে যে, চল—

ছেলেটী হতাশভাবে উঠে দাঁড়ালো।

ক'পা এগিয়ে ট্রেঞ্চের কাছাকাছি যখন তারা এসে পড়েছে, এমন সময় ট্রেঞ্চের দিক থেকে হুইশিল্ শোনা গেল, তারপরেই শোনা গেল লুইস্ গানের শব্দ—কট্ কট্ কট্ কট্ কট্ কট্···

বিপরীত দিক থেকে নীলাভ কয়েকটী আগুনের টুকরো ছুটে এল, সরোজদের সামনের সারিতে ছিল কর্পোর্যাল আর সেই কিশোর সৈনিকটী,

তারা মাটীতে লুটিয়ে পড়ে সামান্য একটু ছট্‌ফট্‌ করেই স্থির হয়ে গেল। ফাতু বলে উঠলো—শুয়ে পড়! শুয়ে পড়!

সরোজরা তৎক্ষণাৎ মাটীর উপর উপুড় হয়ে পড়লো, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলে যেতে লাগলো তাদের মাথার উপর দিয়ে।

তারা গুঁড়ি মেরে ক্রমশঃ ট্রেঞ্চের দিকে অগ্রসর হোল। কোন রকমে একবার ট্রেঞ্চে গিয়ে না পড়তে পারলে নিজেকে আর বেশীক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। অবিরাম শুধু গুরগুর করে কামান গজরাচ্ছে, মাথার উপর একটা শেল ফাটলেই হোল।

অতি সাবধানে সরোজরা কোন রকমে যখন ট্রেঞ্চে এসে পৌছালো, ঠিক সেই সময় চারিপাশ থেকে চীৎকার উঠলো। পরমুহূর্তেই ধুপ্‌ করে অত্যন্ত কাছে কি পড়লো, সরোজ চমকে উঠলো। বিস্ফোরণের আলোয় চকিতের জন্য চোখে পড়লো, সঙ্গীন উঁচিয়ে একজন জাপানী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর ভাব্‌বার অবসর নেই। ক্ষিপ্রহস্তে পকেট থেকে একটি হাতবোমা নিয়ে সরোজ ছুঁড়ে মারলো।

বুম্‌ করে বোমাটী ফাটলো একেবারে জাপানীটার বুকের উপর। গুলি-বিদ্ধ হরিণের মত লোকটী লাফিয়ে উঠলো, তারপরেই ধরাশায়ী হোল। আবছায়ায় যেটুকু দেখা যায়, কে যেন ঘা-কতক হাতুড়ি মেরে তার দেহের উপর দিকটা থেৎলে দিয়েছে।

পরক্ষণেই সরোজের বুকের কাছে আরেক জনের বেয়োনেট্‌ ঝক্‌মক্‌ করে উঠলো—এখনি সেটা বুকে এসে বিঁধবে…। মৃত্যুর আশঙ্কায় তার দেহের স্নায়ুগুলি সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো, তথাপি আত্মরক্ষার সহজাত সংস্কারবশে সরোজ একলাফে পিছিয়ে গেল। জাপসেনাটীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হোল, নিজের বেগ সামলাতে না পেরে সে সামনে ঝুঁকে পড়লো, তৎক্ষণাৎ সরোজ তার উপর লাফিয়ে পড়লো। এক ঝট্‌কায় তাকে মাটীর উপর ফেলে দিয়ে সরোজ দুহাতে তার গলা টিপে ধরলো। বেচারা আত্মরক্ষার সুযোগ পাবার আগেই, হাতের চাপে তার গলা ফুলে উঠলো। দুহাতে নিজেকে মুক্ত করে নেবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করলো, কিন্তু সরোজ তখন তার দেহের সব শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছে তার হাতে, যদি কোনরকমে হাত ফস্‌কায় তাহলে ওই জাপানীটীর হাতেই তার জীবনান্ত ঘটবে, প্রত্যেকটী আঙ্গুলের শক্তির উপরেই এখন সরোজের জীবন নির্ভর করছে।

ক্রমশঃ জাপসেনাটীর দেহ শিথিল হয়ে পড়লো। সে লুটিয়ে পড়তেই সরোজ, তাকে ছেড়ে দিলে। তারপর মাথা তুলে দাঁড়ালো। মাথাটী উঁচু করতে-না-করতেই নীলাভ একটী গোলা শাঁ করে চলে গেল। সরোজ তাড়াতাড়ি মাথাটা নাবিয়ে নিলে, নিজেকে বাঁচাবার জন্য তখন তার মনে অসম্ভব মমতা জেগেছে।

রাত্রির অন্ধকারে নীলাভ গোলাগুলি দীপ্তিমান হয়ে উঠছে, পড়ছে, ফাটছে। বোমার বিস্ফোরণে কামানের গর্জনে বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। কখন-কখন অতি কাছে বোমা কি গোলা ফাটছে। প্রতিমুহূর্তে মৃত্যু যেন নিকটতর হয়ে আসছে। একটা মারাত্মক দুঃস্বপ্ন যেন চিত্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

চীনাদের ট্রেঞ্চে তখন প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে,—হাতাহাতি, ছুরী চলছে, বোমা ফাটছে, পিস্তল ছুটছে, বেয়োনেট ফুঁড়ছে। শুধু হত্যা আর হত্যা, পরস্পরকে খুন করার জন্য অবর্ণনীয় রক্তারক্তি প্রচেষ্টা। আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। চারিপাশে ধূলো আর ধোঁয়ার অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

সহসা জাপানীদের জয়োল্লাস শোনা গেল—বান্‌জাই, বান্‌জাই!

নতুন একদল জাপানী সেনা সেই সময় চীনাদের ট্রেঞ্চের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। সংখ্যায় তারা অনেক।

এবার মৃত্যু অবধারিত!

ডেভিড সরোজের হাত ধরে টানলো। কয়েকটী গুলি তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, ট্রেঞ্চ ছেড়ে দেবার জন্য কোয়ার্টার-মাষ্টার-সার্জেনের হুইশিল্ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে যে-সব চীনারা তখনও আহত হয়নি, তারা ট্রেঞ্চ ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার মধ্যেই আবার কতজন তাড়াতাড়ি পালানোর অসাবধানতায় সেখানেই গুলি খেয়ে ধরাশায়ী হোল। বাকী সব হামা দিয়ে এগুতে লাগলো,—শুঁয়োপোকার মত। যুদ্ধক্ষেত্রে স্বার্থপর মানুষ পরস্পরকে খুন করতে করতে যে পশু হয়ে যায়, এ যেন সেই পশুরই চতুষ্পদ রূপ।

জাপানীরা পলাতকদের অনুসরণ করতো, কিন্তু চীনাদের মেশিনগান তাদের বাধা দিলে। কট্‌কট্ কট্‌কট্ করে লুইস্ গান গর্জে উঠলো। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ভয়ে জাপানীরা আর ট্রেঞ্চের বাইরে মাথা তুললো না। বালির বস্তাগুলি সামনে রেখে তার আড়ালে মাথা বাঁচিয়ে শুধু গুলি চালাতে লাগলো।

পলাতক চীনাদের মধ্যে সরোজও ছিল। তার চারিপাশ দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলে যাচ্ছে। সহসা কপালের উপর সে গুলির উত্তাপ অনুভব করলো, হাত

বুলিয়ে দেখে, রক্ত ঝরছে। চমকে উঠলো, ভাল করে হাত বুলিয়ে দেখে, গুলিটা বেঁধে নি, চামড়া কেটে বেরিয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে আরেক ঝাঁক গুলি চলে গেল তার উপর দিয়ে। মৃত্যুশঙ্কাতুর সরোজ হাত পা ছড়িয়ে সটান্‌ মাটির উপর শুয়ে পড়লো।

গুলি বর্ষণ একটু কমে। গন্ধকের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে সরোজ একটু এগোয়, আবার কিছুক্ষণ মড়ার মত পড়ে থাকে মাটীর উপরে। জার্মান যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে সরোজ জানে, এক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করতে গেলেই মৃত্যু অনিবার্য।

খানিকটা গিয়েই হঠাৎ পাঁকের মত কি একটা নরম জিনিষে সরোজের মাথাটা লেগে গেল। দু'হাতে জিনিষটা ঠেলে সরাতে গিয়ে বাতাসের ঝাপ্‌টায় একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ এসে নাকে লাগলো। সন্তর্পণে মাথাটা তুলে দেখে একটি সৈনিকের পেট ফেঁসে নাড়ীভূড়ী বেরিয়ে পড়েছে, তারই পচা দুর্গন্ধ।

হাত দুটী সরোজ মাটীতে ঘষে মুছে ফেললে। খানিক ধূলো-কাদা নিয়ে মাথাটা মুছে নিলে। তারপর বিস্ফোরণের বিদ্যুৎছটায় একবার তাকালো সৈনিকটীর মুখের পানে ঃ চীনা যুবক। বয়স বছর পঁচিশের বেশী হবে না। পেটটা যেভাবে ফেঁসে গেছে সম্ভবতঃ বোমা লেগেছিল। মুখখানি বিকৃত। জামাটা ছিন্নভিন্ন। জামার বুক পকেটে একখানি নোটবুকে পেনসিলের মাথাটা চিক্‌মিক্‌ করে উঠতে দেখে সরোজ সেটা নিয়ে নিজের পকেটে রাখলে। ইতিমধ্যে মাথার উপর দিয়ে একটা সন্ধানী আলো চলে গেল, তারপরেই বুম্‌ম্‌ করে কাছেই একটা বোমা ফাটলো, সরোজ চমকে উঠলো, হাত-পা গুটিয়ে মড়ার মত পড়ে রইল কিছুক্ষণ।

খানিকক্ষণ আর গুলি-গোলা-বোমা নেই, সব চুপচাপ। সুযোগ বুঝে সরোজ ক্ষিপ্রগতিতে এগুতে লাগলো।

খানিকটা যেতে-না-যেতেই আবার সার্চ লাইটের তীব্র আলো; বন্‌বন্‌ করে মাথার উপর প্লেনের গর্জন। সরোজ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত যখন কোন বোমা পড়লো না, তখন ব্যাপারটা ভাল করে দেখে নেবার জন্য সে চিৎ হয়ে পড়লো। দুপক্ষের কামান তখন খানিকক্ষণের জন্য থেমেছে, মাথার উপর আকাশ সবেমাত্র একটু পরিষ্কার হয়েছে। অস্ফুট চাঁদের আলোয় দুখানি প্লেন দেখা যাচ্ছে। সন্ধানী আলো ফেলে তারা পরস্পরকে আক্রমণ করেছে। পরস্পরকে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে অপরকে জখম করার চেষ্টা করছে। পরস্পরের সন্ধানী আলো মাঝে মাঝে বিপক্ষের প্লেনখানিকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলছে। পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত মেশিনগানের গোলা বড়

বড় উল্কাপিণ্ডের মত আকাশের গায়ে এক দিক থেকে আরেক দিকে ছুটে যাচ্ছে। সহসা রুশ প্লেনটীতে আগুন লেগে গেল। জাপানী প্লেনখানি একটা ডিগবাজী খাওয়ায় কসরৎ দেখিয়ে পালাচ্ছিল, এমন সময় জ্বলন্ত রুশপ্লেনখানি তীরের মত গিয়ে পড়লো তার ঘাড়ের উপর। জাপানী প্লেনখানি আর আত্মরক্ষা করতে পারলো না। কলছেঁড়া ঘুড়ির মত দুখানি প্লেনই নাবতে লাগলো নীচের দিকে। তৎক্ষণাৎ দু'খানি প্লেন থেকে দুই বৈমানিক লাফিয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে তাদের প্যারাচ্যুট হাওয়ায় ভেসে উঠলো। তাদের দুজনকে মাথার উপর দুলতে দেখে, এতক্ষণ নীচে যারা চুপ করে দেখছিল, তাদের হাতের বন্দুক সমস্বরে গর্জে উঠলো। প্যারাচ্যুট ফেঁসে বৈমানিক দুজন টাল খেতে খেতে নীচে এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আবার দু'পক্ষের মেশিনগান চারিদিক ধূলি-ধূমাচ্ছন্ন করে গর্জন করে উঠলো—বুম্ বুম্ বুম্—

সরোজ তখন আবার এগুতে সুরু করেছে। এগুচ্ছে তো এগুচ্ছেই—কোথায় যাবে ঠিক নেই, অজস্র গুলি-গোলা আর বিস্ফোরণের মধ্যে থেকে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া শুধু!

সময়ের জ্ঞান, দেহ সম্বন্ধে চেতনা কিছুই তখন সরোজের ছিল না, যেন একটা ঝড় ধাক্কা দিয়ে তাকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। সে এগুচ্ছিল কিন্তু কি করে যে এগুচ্ছিল তা সে নিজেই জানে না।

অতর্কিতে তার পিঠের উপরে কি একটা পড়লো, সরোজ চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি মুখ ফেরালো, পাশেই এক সৈনিকের আবছায়া চোখে পড়লো, ধোঁয়ার মধ্যে ঠিক ঠাহর করতে পারলো না—লোকটা কে। সে কিন্তু ঠিক চিনেছিল, বললে—হ্যালো, হিন্দু!

সরোজ অস্ফুট স্বরে বললে—ইয়েস্, ইয়েস্!

পিজিন্ ইংরাজীতে চীনাটী বললে—চোখ বুঁজে এগুচ্ছ কোথায়?

সরোজ লজ্জিত হোল, ধোঁয়ায় তার চোখ জ্বালা করছিল বলে, মাঝে মাঝে সে চোখ বুঁজেই এগুচ্ছিল, কিন্তু তা যে কেউ লক্ষ্য করবে, তা ভাবেনি। বললে – চোখে কি যেন একটা পড়লো, তখন বের করতে পারলেম না তাই—

—যেমন চতুষ্পদে এগুচ্ছ, বের করবারই বা ফুরসৎ কোথায়, বল?—হাহা করে লোকটী হেসে উঠলো। সরোজের রাগ হোল, কিন্তু বলার কিছুই ছিল না।

সরোজের মনের ভাবটা সে বুঝতে পেরেছিল কি না কে জানে, 'রাগ করলে নাকি কমরেড্!' – বলে আরেকবার সে প্রাণখোলা হাসি হেসে নিলে।

সরোজের ভাল লাগলো না, সেই ধূম্রেল্‌ আস্তরণের বাইরে যাবার জন্য আবার অগ্রসর হোল। চীনাটী তার হাত ধরলো, বললে—বলি অত তাড়াতাড়ি যাচ্ছ কোথায় বন্ধু? জাপানীদের এতদূরে আসতে এখন কিছু দেরী আছে,—ভয় নেই!

তারপর সশব্দে আবার একটু হেসে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তা তুমি একা কেন কমরেড, তোমার বন্ধুটী কোথায় গেল?

সরোজ নিজেকে নিয়েই এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, ডেভিডের কথা এতক্ষণ তার মনেই ওঠেনি, এবার তার মনে হোল তাইতো, ডেভিডকে সে কোথায় ফেলে এল? আহত হয়ে পিছনে কোথাও পড়ে রইল নাকি?

সরোজ পিছনে তাকালো, ধোঁয়া আর ছুটন্ত গোলা ছাড়া কিছুই দেখা যায় না, ওই বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডেভিড কোথায় পড়ে আছে, কি করে খুঁজে দেখবে, সরোজ ভেবে পেল না।

সরোজের গতিক্‌ দেখে চীনাটী হেসে উঠলো।

সরোজ বললে—হেসো না, তোমার হাসিটা বড় বিশ্রী!

—হাসবো না, দিব্যি আমায় ফেলে পালিয়ে এলে, তাতে দোষ হোল না, আর আমি হাসলেও দোষ!

বাংলা কথা আর ডেভিডের গলা শুনে সরোজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো, বললে—যাক্‌ বাঁচলেম, আমি ভাবছিলেম আবার ওই গুলি-গোলার মাঝে ফিরে যাব কি না!

ডেভিড হাসতে হাসতে বললে—থাক্‌ আর কথা বল না, তুমি কত বড় বন্ধু, তা আমি এবার বেশ বুঝেছি!

সরোজ লজ্জিত হয়ে পড়লো।

ইতিমধ্যে ক'জন লোক এসে পড়লো একেবারে তাদের গায়ের উপর। একজন তো সরোজের উপর ডিগ্‌বাজী খেয়েই পড়লো।

চীনা-ভাষায় কে যেন কি জিজ্ঞাসা করলে, কেউ তার জবাব দিলে না। একজন লোক তখন এগিয়ে এসে, যে ডিগবাজী খেয়ে পড়ে গিয়েছিল, অন্ধকারে তাকে ভুল করে সরোজকে ধরলো। সরোজ এতো বেশী অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, বাধা দিলে না।

লোকটীর হাতে ছিল একটি টর্চ লাইট, সরোজের মুখের উপর আলো ফেললে, তারপরেই বলে উঠলো—হ্যালো কমরেড্‌ সরোজ!

লোকটী হচ্ছেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট ফাতু।

সরোজ ও ডেভিডকে একসঙ্গে দেখে ফাতু বললে—তোমাদের দুজনকে যে এখানে এমন সুস্থ দেহে দেখতে পাব, তা তো মনেই করিনি। তা তোমরা এখন এদিকে যাচ্ছ কোথায় ?

—কিছুই ঠিক নেই। কোথাও গিয়ে এখন খানিকক্ষণ বসতে হবে, তারপর অন্য কথা ;—ডেভিড উত্তর করলে।

—তাহলে আর ওদিকে যাচ্ছ কেন, ওদিকে ত সব জাপানী প্লেন বোম্বার্ড করছে। সামনের এই বাড়ীটায় এসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নাও-না !

ফাতুর পিছু-পিছু সকলে সামনের একটা বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। কামানের গোলায় বাড়ীটার বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। তবে সামনের ঘরে আলমারী ও শার্সির কাঁচ একখানিও আস্ত নেই। বাড়ীখানি নতুন। প্রথম ঘরখানির মধ্যে ঢুকেই চোখে পড়ে একরাশ বই, পরিপাটি করে সাজানো। বোধ হয় কোন পাঠেচ্ছু জ্ঞানার্থীর বাড়ী।

ঘরের একপাশে দু'খানি বড় সোফা ছিল, তারই উপর সরোজরা গিয়ে বসলো। সরোজ তো 'আঃ' বলে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে চোখ বুজলো।

ফাতু বসলো না, ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো।

বাহিরে তখন অবিরাম গুলিগোলার আওয়াজ হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে ফাতু বললে—কি কমরেড্‌ ঘুমোলে নাকি ?

সরোজ চোখ চাইলে, মৃদু হেসে বললে—কিছু বলবে ?

—বলছি এখানে তো ঘুমুলে চলবে না, তোমাদের দুজনকেই যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

—কোথায় ?

—এখান থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে। একদল জাপানী সৈন্য, সেইদিকে অগ্রসর হয়ে নান্‌কিঙ্‌ আক্রমণ করবে। দুদিক থেকে আক্রান্ত হলে সহর রক্ষা করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হবে। সেইজন্য জাপানীরা সেইদিকে অগ্রসর হবার আগে, আমাদের সেখানে গিয়ে তাদের অগ্রগমনে বাধা দিতে হবে।

—বুঝলেম, কিন্তু যাবে কে, আমরা কেবল এই তিনজন নাকি ?

—তিনজন নয়, সাতজন। আপনারা দুজন, আমি, আর আমার সঙ্গের চারজন সৈনিক।

—এই সাতজন লোকে বন্দুক আর হাতবোমা নিয়ে একটা সেনাবাহিনীর অগ্রগমন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ?

—সঙ্গে একটা মেশিনগানও আছে—ফাতু বললে।

—একটা মেশিনগান কতক্ষণ যুঝবে ?

—বেশীক্ষণ তো নয়, কোন রকমে ঘণ্টা দুয়েক ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই চলবে, তার মধ্যেই আমাদের 'লাল ফৌজ' গিয়ে পড়বে !

ডেভিড এতক্ষণ শুনছিল ; এবার কথা বললে—একটা কামান আর সাতজন মাত্র লোক নিয়ে একটা সৈন্য-বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হাস্যকর নয় কি ?

—কিছু না, একটা বাহিনীকে বাধা দেবার পক্ষে আমরা সাতজনই যথেষ্ট। আমরা কতজন তাতো তারা জানবে না, আমাদের কামান চললেই তারা ভয় পেয়ে যাবে, ঘণ্টা দুয়েক তাদের ভয় দেখিয়ে রাখতে পারলেই আমাদের কার্যসিদ্ধি !

—কিন্তু—সরোজ বললে,—একটা কামান আর সাতজন মাত্র লোক নিয়ে একটা বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া মানে, জেনে শুনে জ্বলন্ত আগুনের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়া, কাজ হয়তো কিছুই হবে না, সাতটা জীবনই নষ্ট হবে, তাই বলছি—

—এছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই,—ফাতু বললে,—জীবনের দিকে তাকালে এখন আমাদের চলবে না, স্বাধীনতার দামই এখন আমাদের কাছে সব।

—বেশ যাওয়াই যখন স্থির, তখন আপনি গেলে আমরাও যাবো,—বলে সরোজ সারা দেহে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সোজা হয়ে বসলো।

—তাহলে তো আর সময় নেই।

—আমরা তৈরী,—বলে সরোজ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

বাহিরে তখনো গোলা বর্ষণ চলছে। সন্তর্পণে হামা দিয়ে মাটির সঙ্গে গা মিলিয়ে তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হোল—শুঁয়ো পোকার চেয়েও মন্থর, ঘাসবনে বাঘের চেয়েও সন্তর্পণে।

চলছে তো চলেছেই। এক একটী লহমা যেন মৃত্যুর এক একটি খণ্ডপর্ব। যে কোন মুহূর্তে একটী গুলি ছুটে এসে মাথা ফুটো করে চলে যাবে, সেইজন্যই অতি সাবধানতা, অতি সতর্কতা।

ফাতুর পরেই চলেছে চারজন চীনা, সবার শেষে সরোজ ও ডেভিড।

চলতে চলতে ডেভিড বললে—বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেব বলে সৈন্যদলে

নাম লেখালেম, এখন দেখি নিজেদের প্রাণ নিয়েই টানাটানি। শেষ পর্যন্ত আয়েষাকেও বোধ হয় আর উদ্ধার করা যাবে না!

সরোজ বললে—দেখ আমি এখন আর আয়েষার কথা ভাবি না, নিজেকে বাঁচাবার মত শক্তি ও সাহস তার আছে। একটা আয়েষাকে আমরা পথের বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেম, আবার পথের মাঝেই সে হারিয়ে গেল। কিন্তু এখানে অসংখ্য আয়েষার উপর জাপানীরা যে অন্যায় অত্যাচার করছে, তার প্রতিশোধ নেব না? একটা আয়েষার জন্য যদি আমরা কিছু মাত্র ক্ষতি স্বীকার করে থাকি, তাহলে এই অসংখ্য আয়েষার জন্য আমরা মরতেও পারবো—এরা সবাই আমার বোন!

ডেভিড অপ্রতিভ হয়ে গেল, বললে—তোমারও যা' মত আমারও তাই, কিন্তু আয়েষার কথাটাই বার বার মনে হয়। যদি মরে যাই তাহলে কে তাকে উদ্ধার করবে?

সরোজ বললে—আমরা যে বেঁচে থাকলেও তাকে উদ্ধার করতে পারবো, তার কোন মানে নেই। জীবনে কোনদিন তার আর কোন সন্ধান পাব কি না তারও তো কোন ঠিক নেই। কাজেই যা করছি তাই এখন করি—মনুষ্যত্ব যেখানে সাড়া দেয় তাই করা এখন আমাদের কর্তব্য, পরে যা হয় হবে!

ডেভিড আর কিছু বললে না।

খানিকটা যাবার পর একটা পচা দুর্গন্ধে সরোজের গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো, হাতটা বাড়াতেই একটা নরম থেঁৎলানো দেহের উপর হাত পড়লো, ভক্ করে আরো খানিকটা গন্ধ এল। বমি হবার উপক্রম হোল। বমির বেগটা কোন রকমে দমন করে, নিশ্বাস বন্ধ করে সে মৃতদেহটাকে পাশ কাটাল! সরোজের হাত লেগে সৈনিকটার পায়ের বুট জোড়া ঠক্ ঠক্ করে দু'বার ঠুকে গেল। সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ করলো না।

বুম্ বুম্ করে অবিরাম কামান গর্জাচ্ছে। চম্‌কাবার হেতু নেই। পর-পর গোলা ফাটার শব্দ হচ্ছে, অজস্র, অবিরাম। বাতাসের ঝাপটায় মাথার উপর দিয়ে পীতাভ ধোঁয়ার এক একটা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। কামানের জ্বলন্ত গোলা-গুলিও দেখা যাচ্ছে ছুটে যেতে। মৃত্যুকে উপলব্ধি করা যাচ্ছে প্রতিটী মুহূর্তে।

ইতিমধ্যে সরোজের কানে এল একটা চাপা কান্নার ফোঁসফোঁসানি, কে যেন কাঁদছে, সরোজ থামলো। একজন চীনা সৈনিককে জিজ্ঞাসা করলে—আমাদের কেউ কাঁদছে?

—হ্যাঁ।

—চোট্ লেগেছে ?

—না, ভয়ে।

—কে ?

—আমার পাশে যে আসছে।

সরোজ এগিয়ে গেল। ক্রন্দনরত সৈনিকটীর একখানি হাত ধরলে, বললে—তুমি কাঁদছ ?

—আমার বড় ভয় করছে, আমায় আপনারা ছেড়ে দিন, আমি ফিরে যাই। এমন ভাবে গুলি খেয়ে মরতে আমি পারবো না, আমি আর যাব না, আমায় ছেড়ে দিন।

সৈনিকটীর সজল স্বর শুনে সরোজ তার মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখলে। গুলি গোলার অস্পষ্ট আলোয় যতটুকু দেখা গেল, সৈনিকটীর বয়স বছর আঠারো হবে। কৈশোরের স্নিগ্ধতা তখনও সে মুখ থেকে মিলায়নি। ছেলেটীর জন্য সরোজের অনুকম্পা হল, ইচ্ছা হোল বলে—চুপি চুপি তুমি পালিয়ে যাও, কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু তখনই মনে হোল—সৈনিকের ডিসিপ্লিন্, ফিরে যাওয়ার কথাটা তাই মুখ ফুটে বলতে পারলো না। বললে—জান তো, সৈনিকের দল ছেড়ে পালানোর সাজা মৃত্যু !

ছেলেটী সরোজের দুটী হাত চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বললে—আমায় ছেড়ে দিন, আমি মায়ের কাছে ফিরে যাব। মা লিখেছে……

সরোজ বললে—আমি ছেড়ে দিলেই কি তুমি মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারবে ? পিছনের 'লাইন' পার হতে গেলেই তো সৈন্যরা তোমার ছাড়-পত্র চাইবে।

—সে আমি ঠিক পালাবো, আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবই ; এখানে আর বেশীক্ষণ থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।

ফাতু কখন সরোজের পাশে এসে সব শুনছিল, সহসা কঠোর স্বরে সে বলে উঠলো—আমার আদেশ তোমাকে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে, পালাবার চেষ্টা করলেই তোমায় গুলি করবো।

সকলে চমকে উঠলো।

ছেলেটী একবার ফাতুর মুখের পানে তাকাল, তারপর সকলের সঙ্গে আবার মন্থর গতিতে অগ্রসর হোল।

ছেলেটীর উপর সরোজের মমতা জাগলো।

চীনা ও জাপানীদের মধ্যে তখনও রীতিমত কামান চলছে। দু'দলের মাঝখানে no man's land দিয়ে সরোজরা অগ্রসর হচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে সেতুর মত গোলাগুলো শিষ দিতে দিতে ছুটে যাচ্ছে, আলোর ডুমের মত সশব্দে ফেটে ছিট্‌কে পড়ছে চারি দিকে। এই স্থানটাই যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে নিরাপদ, চারিপাশকে উপলব্ধি করার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী, দুর্বল লোকের বুকের স্পন্দন থেমে যাবার পক্ষে অদ্বিতীয়। একটী ছোট গোলা যদি গতিচ্যুত হয়ে একবার সামনে এসে পড়ে, তাহলে সাতজনের একজনও আর বেঁচে থাকবে না। যে কোন মূহূর্তে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা—তথাপি অগ্রসর হতেই হবে।

জাপানীদের ট্রেঞ্চের সামনে কাঁটা তারের নীচে এসে সকলে থামলো।

ট্রেঞ্চের ওপাশে পর পর কয়েকটী মেশিনগান থেকে অবিরাম গোলা ছুটছে। এদিকে সব চুপচাপ। মাঝে মাঝে জাপানীদের গলা শোনা যাচ্ছে। আর তারই সঙ্গে শোনা যায় মৃদু ঘস্‌ঘস্ শব্দ, জাপানীরা মেশিন বসিয়ে দ্রুত ট্রেঞ্চ কেটে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফাতু বললে—মেসিন্‌গান ফিট্ করে নাও—

চীনা সৈনিক চারজন কাঁধ থেকে মেসিনগানের অংশগুলি নাবিয়ে নিঃশব্দে ফিট্ করে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ফিট্ করা হয়ে গেলে ফাতু বললে- এখান থেকে নয়, আরো এগুতে হবে—কাঁটা তার পার হয়ে একেবারে ওদের ট্রেঞ্চের মুখে গিয়ে চার্জ করতে হবে—এগোও!

কয়েক হাত দূরেই কাঁটা তারের বেড়া। এগিয়ে তার-কাটা কাঁচি দিয়ে কট্ কট্ করে নীচের কয়েকটী তার তারা কেটে ফেললে। তার পরেই মেশিন গান শুদ্ধ সেই ফাঁক দিয়ে গলে গেল।

বোধ হয় সামান্য শব্দ হয়েছিল, জন দুয়েক জাপানী সেনাকে দেখা গেল ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে মাথা তুলতে। সরোজ ও ফাতুর হাতে পিস্তল তৈরী ছিল, শব্দহীন পিস্তলের গুলিতে দুজনেই ঘুরে পড়লো ট্রেঞ্চের ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে ফাতু চাপা গলায় আদেশ দিল—চার্জ!

—কট্ কট্—কট্ কট্—কট্ কট্—কট্ কট্—

ট্রেঞ্চের মধ্যে জাপানীদের কোলাহল উঠলো, ধোঁয়ায় অন্ধকার ও গার্টাইডের গন্ধে চারিপাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারপরেই শোনা গেল হুইশিল, সঙ্গে সঙ্গে জনকয়েক জাপানী লাফিয়ে উঠলো ট্রেঞ্চের উপরে, কয়েকটা গুলি ছুটে এল, কামানটী কেড়ে নেবার জন্য তারা আক্রমণ করলো।

সহসা সরোজদের কামান শেল্ উদ্গার বন্ধ করলে, সরোজ তাকিয়ে দেখলে, গোলন্দাজটী গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছে। আর তখন সময় নেই, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত। হাতের পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে এক লাফে সরোজ আহত গোলন্দাজের জায়গা দখল করলে, আবার গোলা ছুটলো—কট্ কট্—কট্ কট্—কট্ কট্—

গোলার ধাক্কায় জাপানীরা মাটীর উপর লুটিয়ে পড়লো, তখনই আবার আরেক দল মাথা তুললো ট্রেঞ্চের উপরে, আর তারই সঙ্গে ছুটে এল সরোজদের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে বন্দুকের গুলি।

কট্‌কট্ কট্‌কট্ কট্‌কট্ করে সরোজের কামান থেকে সেল ছুটতে লাগলো—অবিরাম অজস্র।

কামানটী কেড়ে নেবার জন্য জাপানীরা দলে দলে ট্রেঞ্চের উপর মাথা তোলে, কিন্তু সরোজের মেসিনগানের সামনে ঘাসকাটা-কলের মুখে কাটা ঘাসের মত লুটিয়ে পড়ে। সরোজ কামানের মুখ ডাইন থেকে বাঁয়ে ও বাঁ থেকে ডাইনে ঘুরিয়ে চলে, তার হাতের বিশ্রাম নেই। সরোজ জানে একটু বিরতি দিলে, একটু স্থবিধা পেলেই জাপানীরা তৎক্ষণাৎ তাদের হত্যা করবে, যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হোল প্রতিপক্ষকে খুন করা।

সরোজের গান থেকে গোলা ছুটছে প্রতি মিনিটে দুশো করে, তথাপি জাপানীরা পিছ্‌-পাও নয়। দলে দলে ট্রেঞ্চের উপর উঠছে, বন্দুক বাগিয়ে ছুটে আসছে। এক সারি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, পিছনে আরেক সারি।

জাপানী সেনাদের হাতের বন্দুক থেকে ইতস্ততঃ অসংখ্য গুলি ছুটে আসে, সরোজদের মেসিনগানের 'কভারে' লেগে ঠন্ ঠন্ করে শব্দ হয়। সেই কভারের পিছনে ফাতু ও অন্যেরা আত্মরক্ষা করে।

ঝল্‌মলে দীপ্তি, চোখ ঝল্‌সানো আলো, টুক্‌রো টুক্‌রো অগ্নিপিণ্ড, ফেটে-পড়া স্ফুলিঙ্গ মনের স্থিরতা নষ্ট করে দেয়, অবিরাম আওয়াজে স্নায়ুগুলি শক্তি হারিয়ে ফেলে। সামনে আক্রমণকারী জাপানীদের ছায়া দেখে সরোজের মনে হয় যেন প্রেতাত্মার দল কবর থেকে উঠে আসছে, গোলা ওদের লাগছে না, ওরা মরছে না, ওদের মারা যাবেও না।

সরোজ যেন সহসা নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে করলো।

জাপানী সেনার চীৎকার অতো বিস্ফোরণের মাঝেও স্পষ্ট হয়ে কানে এসে পৌছলো—বান্‌জাই! বান্‌জাই!!

জমি সমতল না হওয়ায় সরোজের কামানের এক দিকের চাকাটা ধরে একটা চীনা যুবক কামানটিকে এতক্ষণ সোজা করে রেখেছিল সহসা কামানটীকে ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত সে ফিরে দাঁড়ালো, বললো—আমি যাই।

কামানটী কাৎ হয়ে পড়লো। সরোজ জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় ?

—যেখানে পারি যাই, এখানে আর থাক্‌বো না।

আর গোলা ছোড়বার সুবিধা হয় না। সরোজ ধমক দিয়ে বললে—কোথাও যাওয়া হবে না, শিগগির কামান তুলে ধর, নাহলে আমি তোমায় এখনি গুলি করবো।

—আমি যাবো।

– এখনি কামান না তুলে ধরলে ওরা এখনি আমাদের ধরে ফেলবে।

– ধরুক্ গে, আমি এখানে আর থাক্‌বো না।

—আমি তোমায় যেতে দেব না ! তোমার জন্য আমরা মর্‌বো আর তুমি পালাবে. তা' হবে না।

—যেতে দেবেন না ?

—না।

যুবকটী আর কথার অপেক্ষা রাখে না, ঝনাৎ করে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে সরোজকে বেয়োনেট চার্জ করলে।

সরোজ চমকে উঠলো। এতদূর সে আশা করেনি। বেয়োনেটের সূচালো মুখ বুকের অতি কাছে ঝিক্‌মিক্ করে উঠতেই একলাফে পিছিয়ে গেল। ফাতু ঠিক সেই মুহূর্তেই বেল্‌ট্ থেকে পিস্তল টেনে নিয়ে ছেলেটীর হাতে গুলি করলো।

এই ক' নিমেষের চাঞ্চল্যের সুযোগ পেয়ে জাপানীরা একেবারে তাদের কাছে এসে পড়লো। একেবারে মুখোমুখি কয়েক গজের ব্যবধান। হাতবোমা ছাড়া আর উপায় নেই। সরোজ পকেটে হাত পুরলো। ইতিমধ্যে ফাতু হুইশিল্ দিলে—ফরর্—র্—!

কট্ কট্ কট্ কট্ করে জাপানী বন্দুক সেই বাঁশীর জবাব দিলে। কানের পাশ দিয়ে গুলি ছুটে গেল। জাপানী সৈনিকের নীল কুর্তাগুলি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। মৃত্যু যেন একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ছুটে পালাবার অবসর নেই, সে এক ভয়াবহ অবস্থা।

ফাতুর গলা শোনা গেল—লাই ডাউন !—লাই ডাউন্ !!

সরোজরা শুয়ে পড়লো। কয়েকটী হাতবোমা ছুঁড়ে মারলো জাপানীদের

দিকে। সামনের জন কয়েক জাপানী হয়তো আহত হোল, বাকী সকলে থম্‌কে দাঁড়ালো। তারই মধ্যে আরেক দফা হাত-বোমা সরোজ ছুঁড়ে মারলো তাদের দিকে। তারপরেই ফাতুর নির্দেশে সবাই ছুটে গিয়ে নাবলো পাশের এক ভুট্টার ক্ষেতে। গুলি গোলা বোমার বিস্ফোরণে ক্ষেতের ভুট্টাগুলি তখনও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। কচি-কচি ভুট্টাগুলি তখনও ডাঁটার মাথায় মাথায় দুলছে। ভুট্টাগাছের মধ্যে মাথা বাঁচিয়ে হামা দিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত গতিতে তারা পলায়নপর হোল।

রাত্রির অন্ধকারে ধোঁয়ার মাঝে জাপানীরা বোধ হয় তাদের হারিয়ে ফেলেছিল, ভুট্টার ক্ষেতের দিকে তারা আর এল না, তবে তাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলি লক্ষ্যহীনভাবে এদিকে ওদিকে ছুটতে লাগলো।

ইতিমধ্যে দুরদুর করে একদল জাপানী পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। ফাতু ভুট্টাগাছের ফাঁকে মাথা তুললে, দেখা গেল আরেক দল জাপসৈন্যও তরতর করে ছুটে আসছে প্রথম দলটার অনুসরণে। ফাতু বললে—আর ফিরে যাবার চেষ্টা করা বৃথা, ওরা আমাদের ধরে ফেলবে। এখন আগে গেলেও জাপানী সৈন্য, পিছনে গেলেও জাপানী সৈন্য ; তার চেয়ে এই ভুট্টা ক্ষেতে বসে বসে খানিকক্ষণ ভুট্টা-চিবুনোই ভাল।

ফাতু পট্‌ পট্‌ করে দুটো ভুট্টা ছিঁড়ে দিলে সরোজ আর ডেভিডের হাতে।

জাপসৈন্যের দল ওদিকে ক্রমেই দ্রুত এগিয়ে আসছে, একেবারে যেন তাদেরই দিকে মুখোমুখি। নীল পোষাকগুলি অন্ধকারে ক্রমেই স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে। মৃত্যুর ছায়া মরণের মুহূর্তটাকে নিকটতর থেকে নিকটতম করছে—চারিদিক থেকে যেন সাপ্‌টে ধরছে।

সরোজদের সঙ্গী একজন চীনা আর সইতে পারলো না, হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো, বলে উঠলো—ওরা এখনি এসে আমায় মেরে ফেল্‌বে!… তারপরেই সিধে ছুটতে সুরু করে দিলে।

কিন্তু কতটুকুই বা সে গেল, ক'গজ যেতে-না-যেতেই একসঙ্গে গুটি কয়েক গুলি তার দেহকে বিদ্ধ করলে। ধড়াস্‌ করে সে আছড়ে পড়লো, যে মৃত্যু থেকে বাঁচবার জন্য সে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, সেই মৃত্যুই তাকে পরিহাস করলো।

চীনাদের কামান এবার গর্জন করে উঠলো। অবিরাম শব্দ আর মুখোমুখি অগ্নিময় গোলাগুলি ছুটে যাওয়া ছাড়া রাত্রির অন্ধকারে খানিকক্ষণ আর কিছুই ঠাহর হোল না। চারিপাশ ধোঁয়া আর ধূলোয় অবলুপ্ত হয়ে গেল।

তির্যক্ গতিতে সন্ধানী আলো এসে পড়লো এদিকে ওদিকে। দেখা গেল কয়েকটী প্লেন মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ফাতু বললে—দেখছ কমরেড্ সরোজ, ওই সব রাশিয়ান প্লেন যাচ্ছে।

প্লেনগুলি জাপানীদের ট্রেঞ্চের দিকে চলে গেল।

ফাতু বললে—আর ভয় নেই; চল, এবার আমরা ধীরে ধীরে এগোই।

কচি ভুট্টা চিবুতে চিবুতে সবাই আবার হামা দিয়ে অগ্রসর হোল।

ফাতুকে অনুসরণ করে যখন তারা চীনাদের ট্রেঞ্চে ফিরে এল তখন পূব্-দিকের আকাশ উষার আলোয় ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, দু'পক্ষের গোলাবৃষ্টিও থেমেছে খানিকক্ষণের জন্য।

ইতিমধ্যে চীনারা অনেকখানি পিছু হটে এসেছে। নান্‌কিঙের মাইল দশেক উত্তরে একটী ছোট সহরে এখন চীনাদের আস্তানা হয়েছে। সহরটী ইতিমধ্যে ক'বার জাপানী বোম্বার বোম্বার্ড করে গেছে। সাধারণ নাগরিক সহরে আর একজনও নেই। এখন সৈন্যরা সব বাড়ীগুলি দখল করেছে।

সহরের প্রান্তস্থিত বাড়ীগুলি চীনা বাহিনীর পাঁচিলের কাজ করছে। তাদের আড়ালে পথের মুখে মুখে জাপানী আক্রমণের গতিরোধ করার জন্য তারা সব মেশিন গান পেতেছে। বড় বড় পথের মুখে দু একটা ফীল্ড্-গানও পাতা হয়েছে। মাঝে মাঝে পার্কে পার্কে প্লেনধ্বংসী কামানের সরু চোঙ্টা চোখে পড়ে।

সরোজ ও ডেভিড সাধারণ সৈনিক নয়, তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধি-ব্যবস্থা আলাদা। ফাতু নিজে তাদের দু'জনকে একটী দোতালা বাড়ীতে পৌছে দিয়ে বলে গেছে—এই বাড়ীটী তোমাদের, তোমরা এখানে যতদিন খুসি থাকতে পার।

নরম বিছানায় ঘণ্টা দুই তিন একটী লম্বা ঘুম দিয়ে সরোজ যখন উঠে বস্‌লো, দেখে ডেভিড তার আগেই উঠেছে। ডেভিড পিছু ফিরে বসে বসে কি যেন একটা পড়ছিল; সরোজ বললে—কি কম্‌রেড্ এমন একমনে কি পড়ছ?

ডেভিড একখানি খাতা সরোজের চোখের সামনে তু'লে ধরে বললে—তোমার ডায়েরী।

—আমার ডায়েরী?

—হ্যাঁ। তবে তোমার লিখিত নয় তোমার সংগৃহীত। ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার পকেট থেকে বিছানার উপর পড়ে গেছে, আমি দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে পড়ছি।

সরোজ ডায়েরীখানা ডেভিডের হাত থেকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখলে।

সহসা তার মনে পড়লো এক নং ট্রেঞ্চ ছেড়ে পিছু হটে আসার সময় এক বিকৃত শবের বুক-পকেট থেকে সেটী সে সংগ্রহ করেছিল। ডায়েরীখানা খুলতে প্রথমেই চোখে পড়লো ইংরাজীতে লেখা একটী নাম : পল্‌-ল্যাঙ্‌-তু।

ডায়েরীখানি আগাগোড়া ইংরাজীতেই লেখা।

ডেভিড বললে—চেঁচিয়ে পড়, বেশ লিখেছে।

সরোজ পড়তে স্বরু করলে :

লড়াই! লড়াই!! লড়াই!!! মাটীকে রক্ষা করার জন্য মানুষের মৃত্যুযজ্ঞ। যেখানে জন্মেছি সেখানকার মাটীতে আমার জন্মগত অধিকার। সেখান থেকে আমাদের বঞ্চিত করার জন্য একদল বিদেশী তেড়ে এসেছে, আরেকদল স্বদেশী 'মাতৃভূমি' বলে ছুটে যাচ্ছে তাদের বাধা দিতে। যেন মাটীই সব। মানুষের জীবনের, জ্ঞানবুদ্ধির, শিক্ষা ও সাধনার কোন মূল্যই নেই। মাটীতো লক্ষ লক্ষ বছর আগেও ছিল, আরও কত লক্ষ বছর এখনো থাকবে, কিন্তু মানুষের জীবন? মাত্র কয়েকটী বছরের মধ্যেই যখন ফুরিয়ে যাবে তখন তার মধ্যে আবার এই অশান্তি ডেকে আনা কেন? যে ক'বছর বাদে মরবেই তাকে আবার তাড়াতাড়ি গুলি গোলা কামান ছুঁড়ে মেরে ফেলা কেন? কেন জাপানীদের এই সাম্রাজ্যলোভী নিষ্ঠুর আকাজ্ক্ষা? একদল লোককে বঞ্চিত করে, হত্যা করে, তাদের দেশ কেড়ে নিয়ে, তাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের বড়লোক করার জন্য জাপানীদের কেন এই বাসনা? তারাও তো চিরদিন এই লুণ্ঠিত দেশ ভোগ করবে না। আজ যারা সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছে, পঞ্চাশ বছর পরে তাদের কেউই আর থাকবে না। তবুও এই আকাজ্ক্ষা কেন? কেন এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড?

সরোজ পাতা ওল্‌টালো, আরেক পৃষ্ঠায় চোখে পড়লো :

যদি আমি বাঁচি, যদি আমি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পাই, যদি আমি এই ট্রেঞ্চের জলকাদা, গোলা ও বোমার বিস্ফোরণ, পচা মানুষের দুর্গন্ধ, আর প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুভয় থেকে সত্যই মুক্তি পাই, তাহলে আমি একবার ভাল করে বাঁচার সাধনা করবো।

শান্তিপূর্ণ পল্লীগ্রামের ছোট একটী কুঁড়ে ঘরে জানালা ভেদ করে যখন প্রভাতী সূর্যের রক্তিমাভা এসে পড়ে, দূরে দিগ্বলয়ের পাহাড়ে যখন আবীর ছড়িয়ে দেয়, স্নিগ্ধ বাতাসে ফুলের মৃদু গন্ধ ভেসে আসে, ছোট ছেলেমেয়েদের চঞ্চল ছুটোছুটি হাসি ও চীৎকারের উচ্ছ্বাসে যখন ঘুম ভেঙে চোখে পড়ে মা কখন্‌ টেবিলের উপর

চাপা দিয়ে ছোট্ট চায়ের কাপটি রেখে গেছেন, তখন মনটা কেমন শান্তি ও তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। কী সুন্দর সে জীবন। আর এখানে?

মন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। আর যে সেখানে ফিরে যেতে পারবো, মনে তো হয় না। মনে হয় এখানেই মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে। একে একে সবাই তো গেল। আমরা পঁচিশ জন এসেছিলেম, তার মধ্যে বাকী ছিল মাত্র দু'জন—আমি আর মাঙ্-ফুঃ। কাল রাত থেকে মাঙ্-ফুঃকেও আর পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু আমিই আছি। কিন্তু আজকের এই অজস্র গুলিগোলার মধ্যে শেষ পর্যন্ত টিকবো কিনা সন্দেহ হচ্ছে! এই যুদ্ধের ঝড় যদি আজ কাটিয়ে উঠতে পারি, তাহলে এ যাত্রা ফাঁড়া কেটে গেল, এখন কিছুদিনের মত বেঁচে যাব।

তারপর তিন পাতা শুধু নাম। মৃত তেইশটি বন্ধুর নাম আর ঠিকানা। তার পরের পৃষ্ঠা থেকে আবার ডায়েরী লেখা স্বরু হয়েছে:

যুদ্ধের ঘোষণা যাঁরা করেন, তাঁরা সত্যই মহাপুরুষ! মন্ত্রণাসভায় বসে বসে তারা লক্ষ লক্ষ কামান তৈরী করেন, দেশ-শুদ্ধ ছেলেকে কামান-চালানো কল তৈরী করে দিব্যি স্বচ্ছন্দে উপদেশ দিয়ে যান—আক্রমণ কর! দেশ জয় কর!! জাতিকে সমৃদ্ধ কর!!!

সেই মিথ্যা কথার জালে পড়ে অসংখ্য ছেলে ট্রেঞ্চের কাদায়, কামানের মুখে, বোমার নীচে মরে পচে উঠছে। উপদেষ্টা দিব্যি দুধের মত বিছানায় শুয়ে যুদ্ধ জয়ের স্বপ্ন দেখছে, ছোটবড় পার্টিতে আর সভায় জাতির জয়গান গাইছে। চমৎকার নীতি! যদি নিয়ম করা হয় যারা যুদ্ধের মন্ত্রণা দেবে আর যারা যুদ্ধের ঘোষণা করবে সেনাদলের সর্বাগ্রে তাদেরকেই যুদ্ধ করতে হবে, তাহলে বোধ হয় দুনিয়ায় একটী যুদ্ধও ঘটতো না।

এ-যাত্রা আমার বোধ হয় বাঁচা হোল না। জাপানীরা যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত এই এক নম্বর ট্রেঞ্চে ক'জন বাঁচবে সেই হচ্ছে কথা! এই গোলাবৃষ্টির মধ্যে সব হারিয়ে যাব। আমার বুড়ী-মা খবর পাবে: পল্-ল্যাঙ্-তুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাঁর শীর্ণ হাতখানি থর থর করে কেঁপে উঠবে, কাগজখানি হাত থেকে মাটীর উপর পড়ে যাবে। মা, মা,...তোমার সঙ্গে আর বোধ হয় এ জীবনে দেখা হোল না!

যুদ্ধ যখন থেমে যাবে, গলা পচা মড়াগুলোকে মাটী চাপা দিয়ে সারি সারি ক্রুশ লাগিয়ে দেওয়া হবে। তখন হয়তো একদিন আমার বুড়ী-মা এখানে এসে সজল

চোখে তাকিয়ে থাকবে সেই সব নামহীন ক্রুশগুলির পানে। ভাববে—ওরই কোন একটার নীচে আমি শুয়ে আছি! তখন আমি কতদূরে থাকবো কে জানে? ভগবান বুদ্ধের মত আমার আত্মা তখন হয়তো আরেক জন্ম গ্রহণ করেছে, অথবা যিশুর কথা মত মহা-বিচারের দিনের প্রতীক্ষা করছে। মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দেবার ক্ষমতা তখন আর আমার থাকবে না। এ জীবনের সঙ্গে সব সম্পর্ক তখন চুকে গেছে।

ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লিখতে বসবেন—চীন জাপানের বিরাট যুদ্ধ-কাহিনী। ছোট বড় কত লড়াইয়ের কথা এক এক লাইনে শেষ হয়ে যাবে। কত গোলা গুলি বোমা ফেটেছিল, কত সুস্থ ছেলে কত যাতনা পেয়ে মরলো, কত বন্দীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হোল, কত মা-বোনের চোখের জলে বুক ভেসে গেল—সে-কথা কেউ লিখবে না। যারা লড়াই না করে শুধু উপদেশই দিল, সেই সব মন্ত্রী ও সেনাপতিদের কথাই তারা লিখবে, বিচার করবে তাদের চরিত্র, আলোচনা করবে তাদের রাজনীতি, তবেই নাকি সত্যিকারের ইতিহাস লেখা হবে!···

পরের পৃষ্ঠা থেকে আর পড়া যায় না। জলে ভিজে অক্ষরগুলো চুপ্‌সে গিয়ে অপাঠ্য হয়ে গেছে, শেষের দিকটা কাগজগুলো একেবারে কাদার মত।

খাতাখানি সরোজ পকেটে রাখলো। দূরে আকাশের পানে তাকিয়ে মনে হোল, অদূরে মাঠের মাঝে কোনখানে সেই চীনা ছেলেটী পড়ে আছে—দেহ রক্তাক্ত, অল্প অল্প পচে আসছে। সুন্দর মুখখানি রসালো থল্‌থলে হয়ে গেছে। ওই অনাবৃত মৃত দেহটি একদিন হয়তো চীনের সব-সেরা লেখক হতে পারতো, কিন্তু বিদেশীর পশুত্ব মনুষ্যত্বের সম্মান রাখলো না।

ততর্‌-ততর্‌-ততর্‌—তর্‌—

তর্‌—তর্‌—ততর্‌—তর্‌—

বাইরে ড্রামের শব্দ শুনে সরোজ ও ডেভিড বাইরে এসে দাঁড়ালো। সামনেই একটা মাঠ, একেবারে নদীর তীর পর্যন্ত। দূরে দূরে সারি সারি চীনাদের ফীল্‌ড্‌-গান্‌ পাতা রয়েছে। প্লেন-ধ্বংসী কামানের লম্বা চোঙগুলি আকাশের পানে উঁচু হয়ে আছে। এক পাশে একটী বাঁশের খুঁটির সঙ্গে একটী লোককে বাঁধা হয়েছে। মাথাটা তার শিথিল ভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, মুখখানি দেখা যায় না, মুখোমুখি মৃত্যুকে দেখবার ভয়ে মুখ তুলে সামনের পানে তাকাতে সে বুঝি আর সাহস পাচ্ছে না। ব্যাণ্ডের তালে তালে দশজন সৈনিকের

একটী সেক্সন্ এগিয়ে এল। পরপর কয়েকটী আদেশ শোনা গেল, সৈনিকেরা সারি সারি ডান হাঁটু মাটীর উপর রেখে বগলে বন্দুক চেপে ধরে বসলো, নলের মুখে লাগানো 'মাছি'র পানে একচোখে তাকিয়ে তাগ্ ঠিক করলো। ওদিকে অধ্যক্ষ একখানি সাদা রুমাল টুপ করে সামনে ফেলে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে কড়-কড় কড়-কড় করে সব ক'টি বন্দুক একসঙ্গে গর্জে উঠলো। ঝড়ো হাওয়ার মুখে গাছের পাতাটি যেমন কেঁপে কেঁপে মাটীর বুকে ঝরে পড়ে, তেমনি আহত লোকটি একবার থর থর করে কেঁপে উঠলো তারপর এলিয়ে পড়লো সামনের দিকে।

আবার আদেশ শোনা গেল। এবার ড্রাম বাজলো না, সৈন্যদল নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো, বন্দুক কাঁধে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে মার্চ করে চলে গেল।

সরোজ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—আহা!

ডেভিড বললে—বোধ হয় জাপানী 'এজেন্ট' কি 'ইন্‌ফরমার'।

ইতিমধ্যে যে লোকটী কোর্টমার্শালের আদেশ দিয়েছিল, সে এই দিকেই আসছিল, সে আর একটু কাছে আসতেই সরোজ বললে—ফাতু?

মাথাটী একবার সামনের দিকে একটু ঢুলিয়ে হাসিমুখে ফাতু সরোজদের পানে তাকালো, সরোজ জিজ্ঞাসা করলে—কার কোর্টমার্শাল করলেন?

—ডি, ফিফ্‌টিন্।

—আমাদের?

—হ্যাঁ, সেই ছেলেটা, আমাদের দল ছেড়ে যে কাল পালিয়ে গিয়েছিল। আজ সকালে এখান থেকে দশ মাইল দূরে এক গাঁয়ে ধরা পড়েছে।

—কি বললে?

—নতুন কথা আর কি বলবে! বললে, 'আমার বয়স সতেরো বছর, গেরিলা বাহিনীতে নাম লেখানো আমার ভুল হয়েছে, যুদ্ধের ভীষণতা আমি সইতে পারছি না, লড়াই করা ছাড়া আমায় অন্য কোন কাজ দেওয়া হোক, আমি করবো।' কিন্তু তখন আর তা হয় না।

—নেহাৎ ছেলেমানুষ—...

—কি করবো? নিজে স্বেচ্ছায় এসে নাম লিখিয়েছে, ভর্তির ফর্মে সই করার সময় নিজ হাতে একুশ বছর লিখে দিয়েছে—এখন আর কি হবে?

—সামান্য একটা ভুলের জন্য মৃত্যুদণ্ড...অপরাধের তুলনায় শাস্তিটা বেশী হোল না?

—উপায় নেই। একজনকে যদি আমরা দয়া করে ছেড়ে দিই, তাহলে সবাই

যেতে চাইবে,—শত্রুর কামানের সামনে বুক পেতে দিতে ক'জন চায়? সেই জন্যেই ওই ছেলেটীকে এমন সাজা দিতে হোল, যাতে আর কেউ কোনদিন না পালাবার চেষ্টা করে। না হলে যুদ্ধক্ষেত্রে 'মিলিটারী ডিসিপ্লিন্‌' বজায় থাকে না।

—যুদ্ধের সময় 'মিলিটারী ডিসিপ্লিন্‌' ব্যাপারটী আমরা খুব বড় করে দেখি সত্য, কিন্তু আসলে ওটা হচ্ছে মানুষের সমস্ত সদ্‌গুণ—প্রীতি ও মহত্ত্ব, সদাশয়তা ও মৌলিকতা ধ্বংস করার একটী অস্ত্র-বিশেষ! প্রত্যেকটী লোক লড়াই করতে আসার আগে একটী মানুষ হিসাবে গণ্য হোত। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ইচ্ছা ছিল, মানুষ হিসাবে মৌলিকত্ব ছিল, কিন্তু সৈন্যদলে নাম লেখানোর পর থেকেই তাদের মনুষ্যত্বকে মুছে দেওয়া হোল, তাদেরকে এখন শুধু এক একটী লড়াইয়ের যন্ত্র বলে গণ্য করা হোল, সেনাপতির ইচ্ছাই তাদের ইচ্ছা; সেনাপতির আদেশ ন্যায় হোক আর অন্যায় হোক অবশ্য মাননীয়। মনুষ্যত্বের এর চেয়ে বড় অবমাননা আর হয় না।

ফাতু বললে—আপনি যা বলেছেন, ঠিক। কিন্তু বর্তমানে এ ছাড়া উপায় নেই। যতদিন একটা জাত আর একটা জাতকে পদানত করার জন্য সচেষ্ট থাকবে, ততদিন ব্যক্তিত্বের এই বিলোপ মানুষকে স্বীকার করতেই হবে। নাহলে পরান্ন-লোভী কোন জাতকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না; জগতের সব-কিছু দস্যুতার কালো আবরণে ঢাকা পড়ে যাবে।

ডেভিড বললে—এবং ততদিন মানুষের মানুষ-খুন-করার অভিযান চলবেই।

ফাতু মাথা নাড়লো।

ইতিমধ্যে হেড কোয়ার্টার্সের ওদিক থেকে তীব্র বিউগিল্‌ শোনা গেল, একবার নয় উপর্যুপরি। কিসের আশঙ্কায় ফাতু ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চীনা সৈন্যদের সোরগোল শোনা গেল, জন-কয়েককে ছুটে যেতে দেখা গেল মাঠের উপর দিয়ে সেই কামানগুলোর দিকে। ফাতু একবার আকাশের পানে তাকিয়ে দেখলে, একদিকে যতটা দেখা যায় আকাশ পরিষ্কার, আরেক দিক বাড়ীর ছাদে আড়াল হয়ে গেছে। সেদিকটা দেখবার জন্য ফাতু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, বাড়ীগুলো পার হয়ে এসে দেখে পূব্‌দিকের আকাশের সীমান্তে ছোট ছোট কয়েকটী পতঙ্গ দেখা যাচ্ছে। ফাতুর কোমরে ফীল্ড্‌-গ্লাস ঝুলছিল, চোখে তুলে ধরলো। কয়েক লহমা নিরীক্ষণ করে বলে উঠলো—অনেকগুলো।

—কী?

—কাওয়াসাকি বোম্বার!

ফীল্ড্-গ্লাসটা নামিয়ে ফাতু বললে,—আমি যাচ্ছি।

সরোজ বললে—আর আমরা কি এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবো ?

—বেশ, তাহলে আসুন।

দেখতে দেখতে তারা তিন জন মাঠের বুকে ছুটন্ত সৈন্যদলের ভীড়ে হারিয়ে গেল।

প্লেনগুলি এতো উপর দিয়ে আসছিল যে, কামানের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে মনে হোল না। চীনারা কিন্তু সেজন্য এতটুকু নিরুৎসাহ হয়নি, তারা কামান বাগিয়ে নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

এদিকে মাঠের মধ্যে অনেক সৈন্য জড়ো হয়ে গেছে, সকলেরই লক্ষ্য আকাশের দিকে।

প্লেনগুলি মাথার উপরে এল না। খানিকটা এসেই ছড়িয়ে পড়লো, তারপর দেখা গেল তিনটে তিনটে করে কয়েকটা দল হয়ে গেছে। এক একটা দল এক একদিকে প্লেনের মুখ ফেরালো, শুধু মাথার উপর ন'খানি প্লেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। অন্যগুলি আকাশের প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফাতু বললে—সম্ভবতঃ আজ ওরা এ-অঞ্চলের সব গাঁ বোম্বার্ড করবে।

—সম্ভবতঃ নয়, নিশ্চয়ই!—পাশ থেকে একজন চীনা বলে উঠলো—সেইজন্যই ওরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো; ওরা হচ্ছে একদল হিংস্র পশু, নিরস্ত্র নরনারীদের যত বেশী ওরা মারতে পারবে, ততই ওদের আনন্দ। উনিশ-শো-বত্রিশ সালে সাংহাইয়ের 'চাপেই' অঞ্চল ওরা মাটীর সঙ্গে সমতল করে দিয়েছিল, এবার তো আর কিছুই বাকী রাখছে না।

ফাতুর মনে হোল লোকটীকে যেন সে কোথায় দেখেছে, মুখখানি চেনাচেনা, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারলে না, জিজ্ঞাসা করলে—তোমায় কোথায় যেন দেখেছি ?

—আপনাদের এই লাল-ফৌজেই।

বুম্‌ম্! কাছেই এক পাইন গাছের নীচে একটী প্লেন-ধ্বংসী কামান গর্জে উঠলো। কথা চাপা পড়ে গেল। সকলে আকাশের পানে তাকিয়ে দেখলে ঐ একখানি প্লেনের পাখার পাশ দিয়ে গোলাটী ছুটে গেল।

সরোজ বলে উঠলো—ইস্! আর একটুর জন্য।

ফাতু বললে—এদের হাত ভাল, এরা রুশদের অধীনে শিক্ষা নিয়েছে।

বুম্ বুম্ করে পর পর আরো কয়েকটী কামান গর্জে উঠলো। উপরের

প্লেনগুলো থেকে কিন্তু তার এতটুকু প্রতিবাদ এলো না, নীচের কামানের আক্রমণ ব্যর্থ করে শূন্যে কয়েকটা ডিগ্‌বাজী খেয়ে তারা আরো খানিকটা উঁচুতে উঠে গেল। তারপর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নীচের মাঠটিকে গোল হয়ে ঘিরে সহসা অগ্ন্যুদ্‌গার স্বরু করলো। এক মিনিটের মধ্যে বোধ হয় একশো মেশিনগানের গোলা এসে পড়লো চারিপাশে। এক নিমিষে সব বিপর্যস্ত হয়ে গেল।

নীচের কামানগুলি বুম্‌ বুম্‌ করে তার প্রতিবাদ জানালো, কিন্তু উপরের ইতস্ততঃ প্লেনগুলির একখানিকেও আহত করতে পারলো না। মাথার উপর চারিদিক থেকে অজস্র গোলা এসে পড়তে লাগলো। আচম্বিতে সামনের একটা প্লেন-ধ্বংসী কামান কয়েকটা গোলার আঘাতে ডিগবাজী খেয়ে পড়লো, তার সেলগুলি প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়লো, ক্ষণেকের মধ্যে সব ধূলো ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ফট্‌ করে সরোজের উরুতে কি একটা এসে লাগলো, গোলা মনে করে সরোজ লাফিয়ে উঠলো। দেখে : গোলা নয়, একটা সৈনিকের বিচ্ছিন্ন একখানি হাত।

নব-পরিচিত চীনা সৈনিকটী পিজিন ইংরাজীতে বললে—চলে আসুন, এখানে দাঁড়ানো আর সুবিধাজনক নয়।

—কোথায় যাব ?

—আসুন—বলে আর কিছু বলার অবসর না দিয়ে হন্‌ হন্‌ করে সে ডেভিড ও সরোজের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। ধূলো ও ধোঁয়ার মধ্যে অন্ধের মত এগুতে এগুতে কত লোককে যে তারা ধাক্কা দিলে, কত জনকে যে মাড়িয়ে ফেললে! চারিপাশে শুধু গোলা ও বোমার শব্দ, আলোর ঝিলিক, ধূলো ও ধোঁয়ার অন্ধকার, তার মাঝে কারা মরলো আর কারা আঘাত পেল, কোথায় কে প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পশু-শ্রেষ্ঠ মানুষ যে সত্যই কত বড় পশু, সুযোগ সুবিধা পেলে মনুষ্যত্ব থেকে কত নীচে তারা নেবে আসতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্রই তার চরমতম বিকাশ। স্রষ্টা মানুষকে আশীর্বাদ করলেন তীক্ষ্ণ মন ও ধারালো বুদ্ধি দিয়ে, উপহার দিলেন এই সুন্দর জগৎ, অন্তরে দিলেন শান্তি ও প্রেমের আদর্শ। কিন্তু সে সব ছাপিয়ে উঠলো মানুষের আকাঙ্খা, যা এই সুন্দরী ধরিত্রীকে স্নেহশীতল করে তুলতে পারতো, যা মনুষ্যত্বকে বিকশিত করতে পারতো দেবত্বেরও উপরে, সে-সব ব্যর্থ করে জেগে উঠলো মানুষের অহঙ্কার। বিজ্ঞানের বলে মানুষ জগৎকে জয় করলো, কিন্তু তার মনস্বিতা হয়ে উঠলো উদ্দাম, সাম্য ও শান্তির বাণীকে সে আর শুনলো না, বিশ্বের ভ্রাতৃত্ব ছেড়ে নিখিলের

ঘাতকত্বই সে বরণ করে নিলে। সুন্দরকে করলে ধ্বংস, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হাসি মুখের কাছে এগিয়ে দিলে বিষ-গ্যাস, চঞ্চল আনন্দলোভী নরনারীর বুকের উপর দাগ্‌লে কামান, পঙ্গু ও মুমূর্ষুদের মাথার উপর ফেললে বোমা। মনুষ্যত্বকে মানুষ ভুলে গেল।

কট্‌-কট্‌ কট্‌-কট্‌ কট্‌-কট্‌

বুম্‌ বুম্‌ বুম্ম্‌

হৈ হৈ···রৈ রৈ···হুড়োহুড়ি···দাপাদাপি···আর্তনাদ···

ধূলো···ধোঁয়া···গার্টাইডের গন্ধ···

শুধু সৈনিকদের ভীড় ঠেলেই সরোজদের এগুতে হচ্ছে না, সহরের ওদিক থেকে একদল আর্ত ভীত নরনারী কলরব করে ছুটেছে নদীর দিকে, সেই পলায়মান সন্ত্রস্ত জনস্রোতকে ঠেলেও সরোজদের এগুতে হচ্ছে। কিন্তু সেই ভীড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়া কি সহজ, ধাক্কার পর ধাক্কা খেয়ে তারা বিব্রত হয়ে পড়লো। কোন্‌দিকে যে যাবে, তা ঠিক রাখা মুস্কিল হোল। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক করতে করতে যখন তারা কোনরকমে ভীড়ের চাপ থেকে মুক্তি পেল তখন দেখে, কোর্টমার্শালের সেই খুঁটিটার পাশে এসে তারা দাঁড়িয়েছে। অসংখ্য গুলিবিদ্ধ সৈনিকটা রক্তাপ্লুত হয়ে তখনও ঝুলছে সেই খুঁটিতে। নীল ইয়ুনিফর্মের উপর রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। ঠোঁটের পাশ দিয়ে তখনও রক্ত গড়াচ্ছে, চোখ দুটি বাহির হয়ে আসছে, এক ঝিলিক রোদ এসে পড়েছে তার বীভৎস মুখের উপর। কোথা থেকে পীতাভ ধোঁয়ার এক ঝাপ্‌টা এসে সে মুখখানি আব্‌ছায়ায় ভয়াবহ প্রেতের মত করে তুললো। সরোজ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেই মুখখানির পানে।

সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে চীনাটি বললে—সারারাত এই ছেলেটি আমারই পাহারায় ছিল। যে ঘরটার মধ্যে ওকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, অন্ধকারে সারারাত তার মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করে ঘুরে বেড়িয়েছে। মাঝে মাঝে চীৎকার করে কেঁদেছে, দেয়ালে মাথা ঠুকেছে, আমায় কত অনুনয় বিনয় করেছে, বলেছে—পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে দাও, ভগবান বুদ্ধের নামে আমার উপর করুণা কর। আমায় ছেড়ে দাও, আমার গ্রামে আমার আপনার লোকজনের কাছে আমি ফিরে যাব। তোমাদের কোন ক্ষতি তো আমি করিনি, তবে কেন তোমরা আমায় খুন করবে? আমায় ছেড়ে দাও।

বক্তা চুপ করলো, সরোজ জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি বললে?

—আমি আর কি বলবো, অমন দু'ফোঁটা চোখের জল দেখে গলে যাবার মত মন আমার আর নেই। এই ধরণের ব্যাপার তো আজ নতুন নয়, কত দেখলেম। উনিশ-শো সতেরো সালের অক্‌টোবরে যখন বলশেভিক বিপ্লব ঘটলো, আমি তখন রুশিয়ায়। সেখান থেকে যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা দেখবার জন্য জার্মানী ও বুলগেরিয়া হয়ে উনিশ-শো উনিশে যাই ফ্রান্সে। সেই বছরে ফরাসীরা 'ব্ল্যাক-সি'তে বিদ্রোহ করে। সেখানে সহকর্মীদের জরুরী 'কল্' পেয়ে গেলেম কোরিয়ায়। কোরিয়া তখন জাপানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু সে বিদ্রোহ সফল হোল না, আমরা পালালেম রুশিয়ায়। সেখান থেকে 'প্রোপাগাণ্ডার' কাজে উনিশ-শো-তেইশ সালের বিদ্রোহের সময় ছিলেম বুলগেরিয়ায়, উনিশ-শো-চব্বিশে ছিলেম রুমানিয়ায়, উনিশ-শো ছাব্বিশে ছিলেম অষ্ট্রিয়ায়, উনিশ-শো-আটাশের মে বিপ্লবের (Bloody May) সময় ছিলেম বার্লিনে, সেখান থেকে প্যালেষ্টাইনে, প্যালেষ্টাইন থেকে চীনে। উনিশ-শো-তিরিশে চীনে যে বিরাট অন্তর্বিপ্লব ঘটে, তাতে আমাদের নব্বুই হাজার সহকর্মীর হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড, তিন লক্ষ হয়েছিল নিহত, আর এক লক্ষ ষাট হাজার জন হয়েছিল আহত। এই চিয়াং-কাই-সেক্ তখন নিষ্ঠুরভাবে কম্যুনিষ্টদের দমন করে। তোমাদের ভারতেও সে বছর আন্দোলন হয়, মহাত্মা গান্ধীর ষাট হাজার সহকর্মীর তাতে জেল হয়েছিল। থাক্ সে কথা, চীনের সে বিপ্লব তো ব্যর্থ হোল। তোমাদের এম, এন, রায়ের সঙ্গে তখন আমরা ক'জন পালাই ইন্দোচীনে, ইন্দোচীনেও সে বছর ফরাসীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়; তাতে দু'হাজার লোকের জেল হয়, হাজার জনের হয় ফাঁসী, পুলিশের মার খেয়ে হাজার জন যায় হাসপাতালে। সেখানে গুপ্তচরদের চোখে ধূলো দিয়ে পালাই ইতালিতে, ইতালি থেকে জার্মাণী, জার্মাণী থেকে ফ্রান্স। বিপ্লবীরা তখন য়ুরোপের সব দেশেই আন্দোলন স্থুরু করেছে। ইতালিতে সেই বছর তেষট্টি হাজার লোকের জেল হয়, পুলিশের ব্যাটন্ খেয়ে ছ' হাজার লোক হাসপাতালে যায়, চল্লিশ হাজার লোক হয় নিহত। জার্মাণীতে সে-বছর বিশ হাজার লোকের জেল হয়, এক লক্ষ দশ হাজার জনের পিঠের উপর পুলিশের ব্যাটন্ পড়ে। ফ্রান্সেও সে-বছর চার হাজার জনের জেল হয়, দাঙ্গা করে দু'হাজার জন যায় হাসপাতালে! সেখানেই কম্‌রেড্ চুটের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তার সঙ্গে স্পেন, বেল্‌জিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড হয়ে আমরা ফিরে আসি চীনে। এই সকল বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মধ্যে এর চেয়েও অনেক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড আমি দেখেছি। একে তবু কোর্টমার্শালে ভদ্রভাবে গুলি

করা হয়েছে। অনেক জায়গায় নদীতে ডুবিয়ে মারতে, পুলিশে ঠেঙ্গিয়ে মারতেও আমি দেখেছি। তার তুলনায় এসব কিছুই নয়, এসব আমাদের আর বিচলিত করতে পারে না।

বক্তা থামলো, সরোজ ও ডেভিড বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। গত বিশ বছর ধরে জগতের সব ক'টি বিপ্লবই লোকটী প্রত্যক্ষ করেছে, কতকগুলিতে আবার কর্মীর অংশও গ্রহণ করেছে। অথচ অত্যন্ত সাধারণ এর চালচলন, বাহিরটা যেন এর একটা ছদ্ম আবরণ, ভিতরের লোকটির সঙ্গে বাহিরেরটীর অনেকখানি তফাৎ, লোকটীর প্রতি সরোজদের শ্রদ্ধা হোল।

মাথার উপর তখন কয়েকখানি রুশ প্লেন দেখা দিয়েছে, তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য নানা রকম কসরৎ দেখাতে দেখাতে জাপ প্লেনগুলি পিছু হটে যাচ্ছে। আকাশের পানে তাকিয়ে চীনাটী আবার বলতে স্বরু করলো—ওই দেখ, সব রাশিয়ান 'চেকা' প্লেন। ওই রুশেরাই আজ সমগ্র জগৎকে মুক্তির স্বপ্ন দেখাচ্ছে। ওরাই একদিন জগৎ থেকে অন্যায় অত্যাচার দূর করবে। জগতে ধনী বলে কেউ থাকবে না, যারা মিল ও মোটর গাড়ী চালাবার জন্য অন্য দেশ লুঠ করতে বেরুবে। জগতে সেদিন আর কোন লোক না-খেতে পাবার অভিযোগ করবে না, সবাই সবাইকে ভাই বলে ডাকতে পারবে, সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধন সারা জগৎকে এক করে বেঁধে ফেলবে।

ডেভিড বললে—সারা জগতের ব্যাপার নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন, এদিকে নিজের মাতৃভূমি তো বে-হাত হয়ে গেল। জগৎকে রক্ষা করার আগে নিজের দেশকে রক্ষা করুন।

—এই দেশ? এদেশ তো আমরা অনায়াসেই রক্ষা করবো। তবে এমনভাবে রক্ষা করবো যে, জাপান আর কোন দিন কোন দেশ আক্রমণ করবে না। ক'দিনের মধ্যেই রাশিয়ান প্লেন নিয়ে আমরা তোকিও আক্রমণ করবো। যারা আজ জাপানে বসে লড়াই চালাচ্ছে, সেইসব স্বার্থপর বড়লোক ব্যবসাদারদের প্রধান আড্ডা ওই রাজধানী আর নাগাসকি বন্দর। ওই দুটি ফুট্‌কি মানচিত্র থেকে একেবারে মুছে দিতে হবে। তাহলে কোরিয়া স্বাধীন হবে, মাঞ্চুরিয়ার মাঞ্চুকুও নাম আর থাকবে না, যারা আজ এখানে লড়ছে তারা আমাদের সঙ্গে হ্যাণ্ড-সেক্ করে দেশে ফিরে যাবে। জাপানের সঙ্গে চীনের আর কোনদিনই কোন লড়াই বাধবে না!

ওদিকে ফাতুকে দেখা গেল একজন সৈনিককে নিয়ে এদিকেই আসছে।

কাছে এসে হাসতে হাসতে বললে—আমি তোমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রাণ আর তোমরা দিব্যি আড্ডা জমিয়েছ !

—চোখের সাম্‌নে একটা মড়া ঝুলছে, মাথার উপর বোমা ফাটছে, এই তো আড্ডা দেবার মত জায়গা !—সরোজ বললে।

—তবে কি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের প্ল্যান ভাব্‌ছ নাকি ?

—প্ল্যান্‌ ভাবছি না, প্ল্যান শুনছি।

—কি রকম প্ল্যানটা আমি একবার শুনি, সুবিধা বুঝলে কাজে লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

বিপ্লবী চীনাটী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—প্ল্যান-ট্যান্‌ কিছু নয়, জগদ্‌ব্যাপী বিপ্লবের কথা হচ্ছিল। জগতের সাম্য ও মৈত্রীর সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে জাপান, ইতালি ও জার্মাণি। এইসব দেশের বড়লোকেরা আজ ব্যবসা চালাবার জন্য নতুন নতুন দেশ খুঁজছে, এইসব বড়লোকদের উচ্ছেদ করতে হবে, তাহলেই জগতে শান্তি ফিরে আসবে, সাম্য ও প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। জাপান থেকেই আমরা তা সুরু করবো, রুশিয়া আমাদের সাহায্য করবে।

—ঠিক কথা, ঠিক কথা,—ফাতু উৎসাহিত হয়ে উঠলো,—এবং সেই কাজ তোমাকে দিয়েই প্রথম সুরু করা যাক্‌, কি বল মিষ্টার শোয়েমারু ?

—শোয়েমারু !—চীনা বিপ্লবীটি চমকে উঠলো, তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ভরলো।

—হ্যাঁ, তুমি নামকরা জাপানী গুপ্তচর শোয়েমারু।

শোয়েমারু ততক্ষণে পকেট থেকে পিস্তল বাহির করে ফেলেছে। ফাতু সেই পিস্তলটার পানে তাকিয়ে হেসে উঠলো, বললে—বড্ড দেরী হয়ে গেছে মিষ্টার গুপ্তচর !

শোয়েমারুর অটোমেটিক পিস্তলে খুট্‌ খুট্‌ করে দুবার শব্দ হোল, ফাতু সটান্‌ আছড়ে পরলো মাটির উপর। শোয়েমারু ফিরে দাঁড়ালো, তারপর সে ছুটে পালাতে যাবে অমনি ফাতুর সঙ্গী চীনাসৈনিকটি তাকে গুলি করলো, একটি দুটি নয়, পর পর ছ'টি গুলি শোয়েমারুর দেহ ফুটো করে দিলে, বেচারা একবার আর্তনাদ করার মত অবসরও পেল না, এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ফাতু এবার উঠে দাঁড়ালো, সরোজ তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরলো, ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বলে উঠলো—আহা, উঠবেন না, উঠবেন না !

ফাতু বললে—আমার তো কিছু হয় নি।

—কিছু হয় নি? তবে যে—

ফাতু বললে—এমন ভাবে না পড়লে শোয়েমারুর হাত থেকে কি আর আত্মরক্ষা করা যেত! ও একটী গুপ্তচর দলের কর্তা। আমাদের অনেক গুপ্ত সংবাদ ও ফাঁস করে দিয়েছে। কতবার ধরা পড়তে পড়তে মুঠোর মধ্যে থেকে পালিয়ে গেছে।

—অথচ ও আমাদের কাছে জাপানের বিরুদ্ধে কত কথাই বলছিল।

—তা না বললে, আমাদের মনের মত হয়ে আমাদের অন্তরঙ্গ হবে কেমন করে?

ডেভিড বললে—আপনি ঠিক জানেন যে এই শোয়েমারু?

—এখনি হয়তো প্রমাণ পাওয়া যাবে, দেখি—বলে ফাতু শোয়েমারুর দেহ সার্চ করতে সুরু করলে। জামার পকেটে কিছুই পাওয়া গেল না। কোটের সেলাই ছুরী দিয়ে কেটে ফেললো, তার মধ্যেও কিছু নেই। শেষে ফাতু তার জুতোর হিল কেটে ফেললো। বাঁ পায়ের হিল্‌টা ফাঁপা, তার মধ্যে টিনের একটী ছোট কৌটা। কৌটার মধ্যে পাওয়া গেল এক টুকরো কাগজ, তাতে ছোট করে একটী মানচিত্র আঁকা। সেই কাগজটি ডেভিডের চোখের সামনে তুলে ধরে ফাতু বললে —এই দেখ প্রমাণ।

মানচিত্রটীর জ্ঞাতব্য তথ্য সব জাপানী ভাষায় লেখা, সরোজরা কিছুই বুঝলো না। ফাতু বুঝিয়ে দিলে—এটি নান্‌কিঙএর চারিপাশের চীনা সৈন্য সমাবেশের একটী ছক্। এটি পেলে জাপানীদের নান্‌কিঙ্ আক্রমণ করার সুবিধা হোত।

সরোজ বললে—মানুষ চেনা বড়ই শক্ত কমরেড্! এই লোক কি ভাবেই না আমাদের মন রেখে কথা বলছিল!

ফাতু মৃদু হাসলো।

সন্ধ্যার আব্‌ছায়া অন্ধকারে এক পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরের বুকে খান কয়েক রাশিয়ান্ প্লেন, পাশে পাইলট্‌রা জটলা করছিল, কমরেড্ ফাতু সরোজ ও ডেভিডকে নিয়ে এল সেখানে। এক পাশে একজন পাইলট্ চুরুট খেতে খেতে পায়চারী করছিল, তার সঙ্গে সরোজদের পরিচয় করিয়ে দিলে—ইনি কম্‌রেড রোমানফ্, রাশ্যান স্কোয়াড্রন ক্যাপ্‌টেন।

রোমানফ্ সরোজদের সঙ্গে করমর্দন করছে, ইতিমধ্যে হস্‌স্ করে একখানি মোটর এসে পড়লো, সমবেত সকলে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠলো। মোটর থেকে যিনি নাব্‌লেন অন্ধকারে তাঁকে ঠিক চেনা গেল না, ফাতু সরোজের হাতে একটু চাপ দিয়ে মৃদু স্বরে জানিয়ে দিলে—কমরেড্ চুটে।

পরমুহূর্তেই চুটের গলা শোনা গেল—কমরেড্‌স্‌!

মোটরের পাশে দাঁড়িয়ে ইংরাজীতে চুটে বলতে স্বরু করলেন—কমরেড্‌স্‌! জাপানী ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করার জন্য আজ সমগ্র চীনকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে! যারা আজ এখানে লড়ছে, তারা আমাদের সত্যিকারের শত্রু নয়, তারা মাইনে করা সৈনিকমাত্র। আমাদের প্রকৃত শত্রু হচ্ছে জাপানী পুঁজিবাদীরা। তাদের ব্যবসা ও সম্পদের কেন্দ্রে আঘাত করতে পারলে এই যুদ্ধ থেমে যাবে। তারা দিব্যি আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে মাইনে-করা লোক দিয়ে লড়াই চালাচ্ছে, কিন্তু যখন তারা দেখবে এই লড়াই তাদের শান্তি সম্পদ ও জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে, তখন তারাই লড়াই থামাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। সেইজন্য এই ভাড়াটে সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করার চেয়ে তাদের আঘাত করার প্রয়োজনই বেশী। আমাদের সেজন্য তোকিও, নাগাসাকি প্রভৃতি জাপানী ব্যবসায়ের কেন্দ্রগুলি বোম্বার্ড করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, তাহলেই আমাদের জয়।

পাইলট্‌দের মাঝে উল্লাস-ধ্বনি হোল—চাং-হ্বা-মিন-কুও!

কয়েক সেকেণ্ড থেমে চুটে আবার বলতে স্বরু করলেন—কিন্তু প্রথমেই হাজার মাইল উড়ে গিয়ে তোকিও বোম্বার্ড করে আসা সহজ-সাধ্য নয়, সেইজন্য প্রথমে সাংহাই বন্দরে যে সব জাহাজ আছে, সেইগুলিকেই আগে ধ্বংস করতে হবে। দ্বীপময় নিপ্পনকে যদি জাহাজহীন করা যায় তাহলে জাপানী ব্যবসায়ীদের যে ক্ষতি হবে, লক্ষ লক্ষ জাপানী সৈন্য নিহত হলে তা হবে না। আমরা সেইজন্য প্রথমে সেই কাজেই হাত দেব, এতে সাফল্য লাভ করলে আমাদের কাজ অনেকদূর এগিয়ে যাবে। জাপানের প্রধান সহরগুলি বোম্বার্ড করা তখন অনেক সহজ হবে। জীবন পণ করে যদি আমরা এই কাজে ব্রতী হতে পারি তাহলে এশিয়ার পূর্ব প্রান্ত থেকে যুদ্ধভীতি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। মুষ্টিমেয় জাপানী ধনিক যে সাম্রাজ্যের নেশায় অজস্র নরহত্যা ঘটিয়ে যাচ্ছে, তা আর ঘটবে না। যেসব কুলি মজুররা দেহের রক্ত জল করে তাদের সুখ সমৃদ্ধি বাড়িয়ে যাচ্ছে—কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় সেই কোটি কোটি নিরন্ন নিরীহ অধিবাসীদের গৃহে তখন শান্তি ফিরে আসবে। শুধু আমাদের মাতৃভূমির জন্যই আমাদের এই অভিযান নয়, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও জাপানের অসংখ্য জনগণের জন্য আমাদের এই অভিযান। তোমরা এই অভিযানের পথপ্রদর্শক, তোমরা জয়যুক্ত হও এই আমি কামনা করি—জয়স্তু।

চুটে হাত তুলে পাইলটদের অভিবাদন জানালেন!

পাইলটরা জয়ধ্বনি করে প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে নিজ নিজ প্লেনে উঠে বসলো।

সরোজ ও ডেভিডকে দুখানি প্লেনে তুলে দিয়ে ফাতুও একখানিতে উঠে বসলো। ‘ক্যাডেট’রা প্রপেলার ঘুরিয়ে দিলে। একবার সোজা আর একবার উল্টো ঘুরেই প্রপেলার গর্জন করে উঠলো, সরোজদের প্লেন অন্যান্য অগ্রগামী প্লেনগুলির অনুসরণ করলো।

প্রথমেই সিগন্যালের নির্দেশমত প্লেনগুলি কয়েক হাজার ফুট উপরে উঠে গেল, তারপর অন্ধকারের বুকে নিঃশব্দে অগ্রসর হোল—আকাশের নীলিমায় একমুঠো গতিশীল তারকার মত। চারিপাশে শীতের ধূসর কুয়াসা অন্ধকারকে আরো বিবর্ণ, আরো দৃষ্টিহীন করে তুলেছে। নীচে যতদূর দেখা যায় ঘন অন্ধকার, কালোর সমুদ্র। মাটির মানুষ মাটীর মায়া কাটিয়ে বাতাসে ভেসে চলেছে। নীচের ধরিত্রীর আকর্ষণ এখন তাদের কাছে অর্থহীন, প্লেনের লাল আলোটাই এখন তাদের কাছে সব, ডাইনের ওই লাল আলোটাকে পূর্ণবেগে অনুসরণ করাই এখন তাদের সবচেয়ে বড় কাজ।

সিগন্যালার রোমানফ্ বড় বড় গগল্‌স্ জোড়ার মধ্যে দিয়ে ‘মিটার-বোর্ডের’ উপর লট্‌কানো একখানি মানচিত্রের পানে তাকিয়ে আছে, ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে ঘুরছে, স্পিডোমিটার ও এনিমোমিটারের (বায়ু-যন্ত্র) পানে তাকিয়ে প্লেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করছে। মাঝে মাঝে মুখ বাহির করে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছে—কিছুই বোঝা যায় না। ঘন অন্ধকারে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় না, মনে হয় তারা যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন আকাশের গায় কেউ তাদের ঝুলিয়ে রেখেছে এক একখানি ছবির মত।

প্রপেলার ঘুরছে বনবন্ করে, বাতাসের ধাক্কা লেগে মাথাটা ভারী হয়ে ওঠে, তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ আরাম করে ঘুমিয়ে নিই। প্লেন এগিয়ে চলে। এতটুকু ঝাঁকানি লাগে না, একটু দোলে না, স্থির স্বাচ্ছন্দ্য।

মাইক্রোফোনে রোমানফ্ বলে—স্কোয়াড্রন্…পাঁচহাজার ফিট উপরে…পূর্ব-দিকে…স্পীড একশো পঞ্চাশ…

পিছনের প্লেনগুলি ট্রান্সমিটারে রোমানফের আদেশ শুনে তার অনুসরণ করে। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। একটুকু সাড়া নেই। শুধু প্রপেলারের গর্জন, আর এক ঝাঁক গতিশীল নীল আলো!

কিছুক্ষণ পরে সব কটি ট্রান্সমিটারে সচকিত করে আদেশ শোনা গেল—সাংহাই…ব্ল্যাক আউট…প্রস্তুত…

সকলে তাকালো নীচের দিকে—ঘন অন্ধকার, মাঝে মাঝে দু'এক স্থানে জোরালো দু' একটী আলো দেখা যাচ্ছে। বন্দরের আলোগুলি দেখা যায়, এখানে ওখানে ক'খানি জাহাজ কালো সমুদ্রের বুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এক একটী সাজানো খেল্‌নার মত। ওই জাহাজগুলিকে একখানির পর একখানি ধ্বংস করতে হবে, ওই কালো জলের গর্ভে তলিয়ে যাবে চিরদিনের মত, আর কোন দিনই তারা জাপানে ফিরবে না।

প্লেনগুলি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবার ফিরে এল বন্দরের উপরে। নীচে ঝিল্‌মিল্‌ আলোগুলির পানে তাকিয়ে রোমানফের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, ট্রান্‌স্‌মিটারে আদেশ করলো—তিনজন করে ছড়িয়ে পড়ো⋯নিজ নিজ লোকেশান (location) ঠিক করে নাও—রেডি,, বুম্‌—ম্‌!

শাঁ করে চিলের ছোঁ মারার ভঙ্গিতে প্লেনগুলি নীচের দিকে নেবে এসে, এক একটী বোমা ফেলে উপরে উঠে গেল। একসঙ্গে ত্রিশটী বোমা এসে পড়লো সাংহাই বন্দর আর জাপানী জাহাজগুলির উপর।

প্রচণ্ড শব্দ, ধোঁয়া, বিস্ফোরণের ঝল্‌কানি। বন্দরের কয়েকটী স্থান উড়ে গেল, একখানি জাহাজে আগুন ধরে গেল।

রোমানফ্‌ আদেশ দিলে—রেডি, সেকেণ্ড ভলি (volley)!

চারিদিক ধূমাচ্ছন্ন করে দিয়ে এবার আরেক ঝাঁক বোমা গিয়ে পড়লো নীচের দিকে। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভিতর থেকে অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে উঠলো; একখানি জাহাজ আগ্নেয়গিরির মত জ্বলে উঠে একপাশে হেলে পড়লো। প্রচণ্ড শব্দে ইঞ্জিনটী ফেটে চারিপাশে কাঠ লোহা কয়লা ও নরদেহ বিক্ষিপ্ত করে দিল।

এইবার দেখা গেল: কয়েকটি ঝিক্‌মিকে আলো ওদিক থেকে এগিয়ে আসছে; কয়েকটী সন্ধানী আলোর তির্যক রেখা এলোমেলো ভাবে সরোজদের প্লেনগুলির গায়ে এসে পড়লো।

রোমানফের মুখে হাসি ভরে উঠলো, আদেশ দিলে—next volley!

—বুম্‌—বুম্‌—বুম্‌!—আরেক ঝাঁক বোমা নীচে এসে পড়লো।

যা কিছু জলতে বাকী ছিল, এবার তাও জ্বলে উঠলো। আগে যেমন ইতস্ততঃ ছড়ানো টুকরো টুকরো আগুন দেখা যাচ্ছিল, এবার সেই আগুন জমাট বেঁধে উঠলো, সে আলোর দীপ্তিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন সহর স্পষ্ট হয়ে উঠলো। একখানি ট্রেন চুপি চুপি এগিয়ে যাচ্ছে, সরোজ এগিয়ে গিয়ে টুপ করে তার উপর

পাখাখানি ধরে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গে সরোজ ইঞ্জিন চালিয়ে দিলে, জলের তুহাত উপর থেকে প্লেনখানি একটী ঝাঁকনি দিয়ে আবার উপরে উঠতে সুরু করলো। সরোজ ঝুঁকে পড়ে রোমানফের হাত ধরে টেনে তুললো পাখার উপর। ভিতরে তু'জনের বসার জায়গা ছিল না, রোমানফ্ পাখার উপর ঠিক হয়ে বসলো। ইতিমধ্যে সরোজের মাথার উপর অনেকগুলি জাপানী প্লেন এমন এক ব্যূহ রচনা করে ফেলেছে যে উপরে ওঠার পথ একেবারে রুদ্ধ।

সরোজ একটু অসুবিধায় পড়লো, ডিগ্‌বাজী খেয়ে পাশ কাটাবার সহজ উপায় এখন আর নেই। রোমানফ্ পাখার উপর বসে আছে; ডিগবাজী খেলেই সে তলিয়ে যাবে নীচে সাগরের জলে। সরোজের এখন একমাত্র ভরসা সামনের তু'টী গান্। সে গান চালাতে সুরু করলে—কট্‌কট—কটকট— !

কিন্তু এতগুলি প্লেনের সঙ্গে সরোজ একা পেরে উঠবে কেন? কামানের মুখে প্লেনগুলির মাঝে পথ করে সে তীরের মত উপরে উঠে আসছিল। সহসা তু'টী গোলা এসে ফাটলো একেবারে তার ইঞ্জিনের 'বনেটের' উপর। ইঞ্জিনটা ধূমাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো, তারপরেই দেখা গেল আগুন জলছে। আর রক্ষা নাই। সরোজ প্লেনখানির মুখ ফিরিয়ে দিলে সাগরের দিকে, প্লেনখানি হু হু করে নাবতে সুরু করলো।

সরোজ বারেক উপরের দিকে তাকালো, আলো দেখা যায় না, মাঝে মাঝে কামানের জোড়া জোড়া আগুনের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে শুধু,—মাথার উপর লড়াই চলছে।

কাৎ হয়ে তীব্র গতিতে প্লেনখানি জলের উপর এসে পড়লো। একবার লাফিয়ে উঠলো জলের উপর তারপর দাউ দাউ করে জলে উঠলো। সরোজ ও রোমানফ্ ততক্ষণে লাফিয়ে একটু তফাতে গিয়ে পড়েছে।

ঘস্‌ঘস্ করে তু'তিনখানি ষ্টীমলঞ্চ ছুটে এল, ক'জন জাপ-খালাসী ঝুপঝুপ করে জলে লাফিয়ে পড়লো, সরোজ ও রোমানফ্‌কে ধরে জোর করে তুলে দিলে লঞ্চের উপর। চারিদিকে জাপানীরা 'বান্‌জাই' 'বান্‌জাই' বলে চীৎকার করে উঠলো, তাদের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে সরোজরা দেখলো উপর থেকে তু'খানি প্লেন জলতে জলতে নাবছে।

জলন্ত প্লেন তু'খানি জলের উপর এসে পড়লো। অন্যান্য লঞ্চগুলি ছুটলো সেদিকে। সরোজের লঞ্চ ছুটলো জেটীর দিকে।

সরোজ ও রোমানফ্ জেটীতে নাবা মাত্র জাপানীরা তাদের ঘিরে ফেললো,—

হঠাৎ ক'জন একেবারে ঝাপিয়ে পড়লো তাদের উপর, এক মিনিটের মধ্যে অজস্র কিল-চড়ে সরোজ ও রোমানফ্‌ সেইখানেই লুটিয়ে পড়লো। মেরে মেরে সেইখানেই তাদের মেরে ফেলতো, যদি না ইতিমধ্যে একজন জমকালো পোষাক-পরা জাপানী এগিয়ে আসতো। চীৎকার করে কি-সব বলে সকলকে সে নিরস্ত করলে, তারপর উপস্থিত সৈনিকদের কি যেন বললে, সরোজ ও রোমানফ্‌কে মাটি থেকে তুলে, একরকম জোর করে হিঁচ্‌ড়ে তারা টেনে নিয়ে চললো। চারিপাশের জাপানীরা চীৎকার করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে চললো, বোধ:হয় গাল দিচ্ছিল, সরোজরা তার একবর্ণও বুঝলো না।

নানকিঙ্‌ রোডের উপর একটী আটতলা বাড়ীতে জাপানী সেনার হেড-কোয়ার্টার্সের অফিস বসেছে।

বোমা বিধ্বস্ত সংহাইয়ের মাঝে তখনও অনেক অট্টালিকা অটুট ছিল। বাড়ীখানির প্রত্যেকটী ঘরই সুসজ্জিত। আগে বোধ হয় কোন হোটেল ছিল। সাততলের এক সুদৃশ্য ঘরে সহকারী সমর-সচিব বসেছিল। সামনে ছোট্ট এক কাপ কোকো, মাঝে মাঝে চামচ দিয়ে এক এক চুমুক খাচ্ছে আর টেবিলের উপর একখানি মানচিত্র খুলে নিরীক্ষণ করে দেখছে।

বাহিরে ঠক্‌ঠক্‌ করে শব্দ হোল, ক্রমশঃ কাছে আসতে আসতে শব্দটা যেন দরজার সামনে এসে থামলো, লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল্‌ কোদাহিতো মুখ তুলে তাকালো, বললে—ভিতরে এসো।

দরজার ফুলকাটা পরদা ঠেলে ঠক্‌ঠক্‌ করে একটী যুবক এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলো, তার একখানি পা নেই, দু' বগলে দুই লাঠি।

কোদাহিতো বললে—বসো।

যুবক বসলো।

যুবকটির জন্য কোদাহিতো এক কাপ কোকো আনালো, তারপর সামনের মানচিত্রটীর উপর কয়েকটী স্থানে পেন্সিলের চিহ্ন দিয়ে বললে—দেখ, এই এই জায়গা থেকে এবার এক সঙ্গে আক্রমণ চালাবো ঠিক করেছি। দেখি চীনারা আর কদ্দিন লড়তে পারে। রেড আর্মির মূল ঘাঁটীগুলি একেবারে বিধ্বস্ত করে দেব। এমন করতে হবে যে চীনে আর একশো বছরের মধ্যে জাপানের বিরুদ্ধে কোন কথা উচ্চারণ করতে লোকে ভয় পাবে।

যুবকটী বললে—আপনাদের যা মন চায় করুন, কিন্তু কত লোক মরলো তার হিসাব রেখেছেন তো?

কোদাহিতো মৃদু হাসলো, বললে—অমন ছু' দশ হাজার না মরলে দেশ কখনো বড় হয় না।

যুবক বললে—ছু'দশ হাজার?

—না হয় ছু'দশ লাখই হোল!

ইতিমধ্যে আরদালি স্লিপ নিয়ে এল, কোদাহিতো স্লিপটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে বললে—নিয়ে এসো—

একেবারে পূরোদস্তুর সাহেবী পোষাকে সজ্জিত একজন জাপানী এসে ঘরে ঢুকলো। কোদাহিতো জিজ্ঞাসা করলো—কি খবর মার্কিরো?

—কাল রাত্রে যে চারখানি চীনা বোম্বারকে গুলি করে নাবানো হয়েছে তাদের চারজনকেই আমি জানি। ছু'জন ভারতীয় সাংবাদিক, একজন রাশিয়ান বোমারু পাইলট্, আরেকজন মার্শাল্ চুটের সহকারী সেনানায়ক।

—ভারতীয় সাংবাদিক বোম্বার চালাচ্ছে?—কোদাহিতোর ছোট ছোট চোখ ছুটী বিস্ময়ে আরো তেরচা হয়ে গেল।

—ভারতীয় বলতে যা বুঝি, এরা ঠিক তেমনটী নয়—মার্কিরো বললে—এরা গত জার্মান যুদ্ধের সময় রয়াল-এয়ার-ফোর্সে ছিল। আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় এরা হাবসীদের দলে লড়েছে। সম্প্রতি এরা কমরেড্ চুটের দলে যোগ দিয়েছে। এদের কৌশলেই হাংচৌয়ে আমাদের এক নম্বর ট্রেঞ্চ চীনারা দখল করে। বোমা, বোম্বার আর কামান চালাতে এরা সিদ্ধহস্ত।

বারেক থেমে কর্ণেলের মুখের পানে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে মার্কিরো আবার বলতে সুরু করলে—আমি চাই না যে, তারা আর ফিরে যায়। তারা ভারতে ফিরে গেলে সে দেশে আমাদের স্বার্থহানি হবে। সেই জন্য আমার অনুরোধ যত শীঘ্র সম্ভব আপনি তাদের মৃত্যু-দণ্ডের ব্যবস্থা করুন।

- কিন্তু খবরটা যখন জানাজানি হবে, ভারতবাসীরা যখন শুনবে···

—গোপনে ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে খবর বাইরে না প্রকাশ পায়। আপনি না পারেন আমার উপর সে ভার দিন।

—বেশ!—কর্ণেল্ কোদাহিতো একখানি প্যাড্ টেনে নিয়ে লেখার উপক্রম করলো।

খোঁড়া যুবকটী এতক্ষণ চুপ করে বসে সব শুনছিল, এবার বাধা দিলে, বললে—দাঁড়ান!

কোদাহিতো মুখ তুলে তাকালো।

—একজন সাধারণ গুপ্তচরের কথায় চারজন লোকের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া ভুল হবে না?

—সাধারণ গুপ্তচর!—মার্কিরো রুক্ষ চোখে যুবকটীর পানে তাকালো।

—তোমার কথার উত্তর আমি দিচ্ছি, আগে বল দিকি এই ভারতীয় দুজনের সঙ্গে একটী মেয়ে ছিল, তার কি হোল?

—সে এখন হাংচৌয়ে আমাদের হাসপাতালে নার্সের কাজ করছে।

—কিন্তু আমি জানি এই সহরে তোমার আস্তানায় আজ ক'দিন ধরে তাকে আটকে রাখা হয়েছে।

ক্ষণেকের জন্য মার্কিরোর মুখে উত্তর জোগালো না, তারপর বললে—সে হাসপাতাল থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল, তাই তাকে এখানে এনে আটকে রেখেছি।

—সেও তো ভারতীয়, এদের সঙ্গে তারও মৃত্যুদণ্ড হবে না কেন?

—আমি তাকে ষ্টেটের 'গায়শা' করে নিপ্পনে পাঠাবো।

—এবং সেই পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য তার আত্মীয় দুজনকে মেরে ফেলা দরকার! দেশের স্বার্থের নামে নিজের কার্যসিদ্ধি···

মার্কিরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো, বললে—দেশের স্বার্থ তোমার চেয়েও আমি ভাল বুঝি। এবং বুঝি বলেই মাঞ্চুকুয়ো দখল করা সম্ভব হয়েছে; কোরিয়ায় বিদ্রোহীরা ধরা পড়েছে এবং আজ পর্যন্ত রুষ সাম্যবাদীরা নিপ্পনে প্রবেশ করতে পারেনি। জাপানে আজ এমন কেউ নেই যে 'অদৃশ্য-মার্কিরোর' নাম শোনেনি। আর তুমি সেদিনকার ছেলে, তুমি কি না আজ আমাকে দেশের স্বার্থ বোঝাতে এসেছ!

—তুমি ছোট হও, বড় হও, তাতে কিছুই আসে যায় না, আমি সহকারী সমর সচিব লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল কোদাহিতোকে জিজ্ঞাসা করি, যাঁদের তিনি চরম-দণ্ডে দণ্ডিত করছেন, তাঁদের কোন কথা তিনি শুনলেন না, এই কি ঠিক বিচার হোল?

কোদাহিতোর ভ্রূ দু'টি কুঁচকে উঠলো, বললে—দেখ, যাকে আমরা মাতৃভূমির শত্রু বলে মনে করি, তার পক্ষে বিশেষ কিছু শোনার প্রয়োজন আছে বলে মনে

করি না। তাকে যতশীঘ্র সম্ভব আমরা এই জগৎ থেকে সরিয়ে দিতে চাই, যেন সে কোনদিনই আর আমার দেশের শত্রুতা করতে না পারে।

—দু' একটি লোককে হাতে পেয়ে খুন করলেই জগতের কোটি কোটি লোকের মুখবন্ধ করা যাবে না। নিজেদের স্বার্থের জন্য আমরা আজ সমগ্র এসিয়াকে শত্রু করে তুলেছি—এ তাদের দোষ না আমাদের দোষ? কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় নির্মমভাবে অত্যাচার করার আগে, চীনে অসংখ্য নিরীহ নরনারীকে বোমা মেরে হত্যা করার আগে সমস্ত এশিয়াবাসীরা কি নিপ্পনের পানে শ্রদ্ধার চোখে তাকাতো না?

কোদাহিতো ধমক দিয়ে বললে—তোমার গস্‌পেল্ (Gospel) শোনার সময় এখন নেই, চুপ কর।

—কেন চুপ করবো? তোমরা কি ভাব আমরা এক একটা নির্বাক যন্ত্র হয়ে জন্মেছি শুধু তোমাদের হুকুম মত লড়াই করবো বলে? ট্রেঞ্চের এক হাঁটু কাদার মধ্যে কামানের গোলা নাহলে এরোপ্লানের বোমা খেয়ে হয় নিজেরা খুন হব, না হয় অপরকে খুন করবো? আর তোমরা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে শুধু প্ল্যান ভাঁজবে আর আদেশ ছাড়বে! আমরা বুকের রক্ত দিয়ে দেশ জয় করবো, আর তোমরা সেখানে করবে জায়গীর, সাতপুরুষ ধরে ভোগ করবে তার উপস্বত্ব। অথচ আমরা কিছু বলতে গেলেই বলবে, 'বে-আইনী হচ্ছে, চুপ কর!' কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মতামত জানাবার অধিকার কার সবচেয়ে বেশী, তোমাদের না আমাদের?

কোদাহিতোর ভ্রূ কুঁচকে উঠলো, বললে—তুমি কি বলতে চাও?

—আমি বলতে চাই এমন একতরফা বিচার চলবে না। যুক্তি নেই, তর্ক নেই, বিচার নেই, বিবেচনা নেই, যখন-তখন যাকে-তাকে দেশের শত্রু বলে গুলি করে মারলেই হোল! মানুষের জীবনের কি কোন দাম নেই?

—তুমি কি বলতে চাও দেশের শত্রুদের তাহলে ছেড়ে দেব?

—দেশের শত্রু কারা? দেশের শত্রু বলতে তোমরা কি বোঝ? দেশপ্রেমের নামে দেশের অসংখ্য সুস্থ জোয়ান ছেলেকে যারা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে, তারা দেশের শত্রু নয়?

—নন্‌সেন্স!

—নিশ্চয়, আমার মাথায় এতটুকু 'সেন্স' থাকলে তোমাদের দেশ সেবার ধাপ্পাবাজীতে ভুলে মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে একখানি পা রেখে আসতাম না।

দাঁতে দাঁত ঘসে কোদাহিতো বললে—দেশদ্রোহী !

—আর যারা আরাম কেদারায় বসে নিজেদের স্বার্থের জন্য দেশের লক্ষ লক্ষ সুস্থ যুবককে বিদেশীর কামানের মুখে আহুতি দিচ্ছে, তারা হোল দেশ-প্রেমিক। চীনদেশ জয় করে বড় বড় কারখানা খুলে তোমরা বেশী পয়সা লাভ করবে, লাট-বেলাটের পদে জাঁকিয়ে বসবে, সেই হবে দেশের স্বার্থ, তোমরাই হচ্ছ দেশ। আর আমরা যখন আমাদের স্বার্থ বুঝে নেবার চেষ্টা করবো, সামান্য সুখ সুবিধার দাবী করবো, অমনি আমরা হব দেশের শত্রু। দেশ তোমাদের পকেটের মধ্যে !

ক্রুদ্ধ কোদাহিতের মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। টেবিলের ড্রয়ার থেকে পিস্তলটী তুলে নিলে। যুবক হাসলো, বললে—ওই পিস্তল দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করা যাবে না বন্ধু, মনে রেখো দশটি হাজার শ্রমিক আমার একটী কথায় ওঠে বসে। তুমি আমায় খুন করলে তারা নিশ্চয়ই শ্রদ্ধায় তোমায় পূজো করবে না ! আমার ভায়ের একটা ইঙ্গিত পেলে দশ হাজার মজুর ধর্মঘট করবে, জাপানের প্রধান গুলিবারুদের কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, কি দিয়ে তখন তোমরা একচল্লিশ কোটী চীনার সঙ্গে লড়বে ? বহুদিন ধরে তোমরা তাদের উপর জুলুম চালাচ্ছ। তাদের মাইনে কমিয়ে দিয়ে জগতের বাজারে কম দামে জিনিষ বিক্রী করছ, নিজেদের লাভ লোকসানের অঙ্ক কষছ, তাদের পানে কোনদিন ফিরেও তাকাওনি, তারা খেতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না কোনদিন ভাবনি। অসন্তোষ তাদের অন্তরে বহুদিন ধরে জমে আছে, শুধু দেশলাই কাঠিটি জ্বেলে দিলেই দপ্‌ করে জ্বলে উঠবে।

পিস্তলটী সশব্দে টেবিলের উপর রেখে কোদাহিতো চীৎকার করে উঠলো—তুমি একজন কম্যুনিষ্ট !

—হ্যাঁ আমি কম্যুনিষ্ট ! তোমাদের চোখে আমি একজন কম্যুনিষ্ট। অথবা অন্য যে কোন নাম তোমরা আমায় দিতে পার তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ন্যাশান্যালিষ্ট হচ্ছ শুধু তোমরাই। দেশকে সমৃদ্ধ করার নামে বড় বড় কারখানা খুলে লোকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে প্রচুর পয়সা জমাচ্ছ ! ইলেকট্রিক ফ্যানের নীচে বসে জাতির স্বার্থে অবিরাম মাথা ঘামাচ্ছ, অসংখ্য লোকের জীবন নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলছ। তোমাদের পিছনে আছে তোমাদেরই মনগড়া আইন, তোমাদেরই মাইনে-করা পুলিশ আর বিচারক। যাকে তোমাদের ভাল লাগছে না, তোমাদের পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করছে, তোমাদের আইনে লোক দেখিয়ে তোমাদের বিচারক তার বিচার করছে, ব্যবস্থা করছে জেল না হয় ফাঁসীর।

টাকা দিয়ে খবরের কাগজে রোজ নিজেদের ছবি ছাপাচ্ছ, অজস্র গুণকীর্তন করাচ্ছ। কাজেই দেশ তোমাদের পকেটের মধ্যে, দেশের সেবা তোমাদেরই একচেটে !

—তুমি এখন যেতে পার—কোদাহিতো গম্ভীরভাবে বললে—তোমার ওসব লম্বা লম্বা বক্তৃতা শোনার মত অবসর এখন আমার নেই। ওসব কথা শোনার মত প্রচুর সময় যাদের আছে তাদের গিয়ে শোনাও গে।

—তারা জানে, কিন্তু তোমাদের সামনে মুখোমুখি বলতে সাহস পায় না, আমার সাহস আছে আমি বলছি। তোমরা যে এতো লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ, মনে রেখো তারাও মানুষ, তোমাদের মত তাদেরও সুখ দুঃখ আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, বেঁচে থাকার অধিকার আছে, খেয়ালমত এদের জীবনকে নষ্ট করার অধিকার তোমাদের নেই, এদের দীর্ঘনিঃশ্বাসে তোমাদের সর্বগ্রাসী আশা-আকাঙ্ক্ষা ভূমিসাৎ হয়ে যাবে।

সমর-সচিব অস্থির হয়ে উঠলো ; কি করবে ভেবে পেল না, রুদ্ধ আক্রোশে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো—এই কথা তুমি যদি আর কোথাও বলতে, তাহলে তোমার কি সাজা হোত, জান ?

—জানি। প্রাণদণ্ড। কিন্তু আমি তার ভয় করি না। তোমাদের দেশ-সেবার মিথ্যা ধাপ্পায় ভুলে একটা পা খুইয়েছি, এবার সত্যিকারের দেশ সেবার জন্য জীবন দেব। কিন্তু আমি মরলেই সত্য মরবে না, যারা আজ যুদ্ধে জীবন দিচ্ছে তাদের মা-বোনের চোখের জলে, কারখানায় বুকের রক্ত জল করেও যারা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাসে তোমাদের দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

যুবকের উত্তেজিত স্বর ঘরখানির মধ্যে গম্‌গম্ করে ওঠে। সেই গলা শুনে পিছনের পর্দা ঠেলে এক মহিলা পিছনে এসে দাঁড়ালেন, সস্নেহে যুবকের পিঠের উপর একখানি হাত রেখে বললেন—পায়ের শোকে তোমার মাথা মাঝে মাঝে গরম হয়ে ওঠে বাবা, খুব চেঁচালেই তো কথার দাম খুব বাড়ে না। কি তুমি চাও তাই বল না—ওই চারজনকে ছেড়ে দিতে হবে, এই তো ?

—হ্যাঁ।

মহিলাটী কোদাহিতোর মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—তা তুমি ওই লোক ক'টাকে ছেড়েই দাও না বাপু !

—অসম্ভব !

—অসম্ভব আবার কিসে? তুমি মনে করলে সবই করতে পার।

—কিন্তু আমি মনে করতে পারি না, যারা আমার দেশের শত্রু, আমি তাদের ছেড়ে দিতে পারি না। আজ যদি তাদের ছেড়ে দিই, কাল তারা উড়ে গিয়ে তোকিও বোম্বার্ড করে আসবে।

যুবক কি বলতে যাচ্ছিল, মহিলাটী তাকে নিরস্ত করে বলে উঠলেন—আমি তো একেবারে ছেড়ে দিতে বলছি না, শুধু প্রাণে মেরো না।

—কিন্তু···

—আবার কিন্তু কিসের? আমার একটা কথা তুমি রাখো—বলে মহিলাটী অনুনয়ের ভঙ্গীতে কোদাহিতোর একখানি হাত চেপে ধরলেন, বললেন—ওদেরকে গুলি করে না মেরে বন্দীদের যেমন খাটিয়ে নেবার ব্যবস্থা আছে তাই কর না কেন, ট্রেঞ্চ খুঁড়ুক, মাইন্‌ পাতুক···

—যদি পালিয়ে যায়?

—পালিয়ে যাবে? এত জাপানী সৈন্যের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে যদি পালিয়ে যায়, তাহলে সে তোমাদের অযোগ্যতা!

যুবকটী এবার কথা কইল, বললে—আর সেই মেয়েটী?

—আমি তাকে গায়শা করতে চাই—মার্কিরো জবাব দিলে।

—না, তা চলবে না—যুবকটি বললে।

মহিলা বললেন—বিদেশী মেয়েকে ধরে নিয়ে এসে গায়শা করার আমি বিরোধী। ওকেও পাঠিয়ে দাও, ওই লাইনের কাজে—সৈন্যদের জামা-কাপড় কাচবে, সেলাই করবে, আহতদের সেবা করবে।

মার্কিরো কি একটা আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল, মহিলা বললেন—আমার উপর তোমার কথা চলবে না!

মার্কিরো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোদাহিতো আদেশপত্র লিখতে সুরু করলো।

—কেমন এবার খুসি তো, আর এখানে ঝগড়া করতে হবে না। এসো, চা খাবে এসো—বলে সস্নেহে যুবকটির একখানি হাত ধরে মহিলা ঘর থেকে বাহির হয়ে গেলেন। বিরাট বাড়ীর বুকে 'ক্রাচের' ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ কোথায় হারিয়ে গেল।

বোমাহত বিধ্বস্ত সাংহাইয়ের তখনও-অক্ষত-থাকা এক বাড়ীর চারতলার এক ঘরে সরোজদের আটকে রাখা হয়েছে। চারিপাশে সৈন্য মোতায়েন আছে।

সব সময়েই বন্ধ দরজার বাহিরে তাদের নাল-মারা বুটের খট্‌খট্‌ আওয়াজ পাওয়া যায়, জানালার সামনে দেখা যায় বেঁটে-বেঁটে খাকীপোষাকী জাপানী বন্দুক কাঁধে ফেলে এদিক ওদিক করছে।

সরোজরা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে, প্রহারের বেদনা তখনও তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মন তখনও এতো অস্পষ্ট যে, ভাল করে কিছু ভাবা যায় না। দেহের মাঝে মাঝে কালশিরা পড়ে গেছে, সর্বাঙ্গে কেমন যেন একটা জড়-জড় ভাব।

সহসা সরোজ চীৎকার করে উঠলো—ডেভিড! ডেভিড!!

ওদিক থেকে ডেভিডের গলা শোনা গেল—কী?

—তুমি এর মধ্যে এলে কেন মরতে? তোমাকে তো আমি ভাল পাইলট্‌ বলে জানতেম, আর এ জাপানীগুলোর সঙ্গে একটা লড়াই ঠিকমত চালাতে পারলে না?

—আমি ঠিকই লড়াই চালাতে পারতাম, তোমার জন্য নীচে নেবে আসতেই তো যত বিপদ ঘটলো।

—আমার জন্য?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার জন্য আমি গেলাম আর আমাদের দু'জনের জন্য কমরেড্‌ ফাতু···

—হো-হো!—জানালা দিয়ে দুজন জাপানী সৈনিক দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হাউ হাউ করে কি সব বলে গেল, কিছুই বোঝা গেল না। তাদের হাবভাব দেখে রোমানফ্‌ হেসে উঠলো। আর যায় কোথা, একজন বন্দুকটা তুলেই দুটো ফাঁকা আওয়াজ করে দিলে।

ফাতুও সেই ঘরে ছিল, এবার সে বললে—ওদেরকে বেশী ঘাঁটিয়ে কোন লাভ নেই, আপনারা চুপ করুন।

ঘরটা আবার স্তব্ধ হয়ে গেল।

জানালা দিয়ে আকাশের খানিকটা চোখে পড়ে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। নীচে অত্যাচারী জাপানীদের হত্যালীলা দেখে নির্মল আকাশ মেঘের আড়ালে মলিন হয়ে উঠছে। ঘরের মধ্যেও সেই মেঘালি অন্ধকারের ছোঁয়াচ এসে লেগেছে। সেই আবছায়াতেও শান্ত্রীর বেয়োনেটের আগাটুকু স্তিমিত আলোয় ঝিকমিক করছে। সামনের দরজাটি বাইরে থেকে বন্ধ। ওই দরজা দুটার ওপারে তাদের জন্য কি আয়োজন চলছে, তা তারা জানে না। রঙীন কপাট দু'টি যেন বইয়ের

তু'খানি মলাট। এখন বইখানি বন্ধ আছে, ওই দরজা খুলে যখন তারা বেরুবে তখন থেকে হবে বই পড়া সুরু। তারপর জীবনের সেই বই কোথায় শেষ হবে কে জানে! হয়তো-বা গল্পের নায়কদের মৃত্যু, অথবা গুরুতর রকমের কোন সাজা। কিন্তু জাপানীদের কাছ থেকে মৃত্যুটাই যেন বেশী নিশ্চিত। এতদিন ধরে সযত্নে যে দেহকে তারা রক্ষা করে এসেছে, জাপানী বন্দুকের গুটি কয়েক গুলি সেই দেহকে শেষ করে দেবে। ঘড়ির হেয়ার-ইস্‌প্রিঙের মত যে বুক ধুক-ধুক্ করে নিয়মিত কাঁপছে, জাপানীরা তা নিস্পন্দ করে দেবে। কেউ হয়তো তাদের মৃত্যুর খবরটুকুও জানবে না, নয়তো কত লোক জড়ো হবে তাদের কোর্টমার্শাল্ দেখবার জন্য; তাদের কথা সারা তুনিয়ার খবরের কাগজে ছাপা হবে, জগৎ জানবে পরাধীন ভারতের নিরস্ত্র জনগণের মাঝে বোমারু বিমান চালাবার মত লোকও আছে! ভারতবাসীরা সে খবর শুনে তাদের শ্রদ্ধা করবে,—মৃত্যু সার্থক হবে। উনিশ-শো-এক সালের জানুয়ারী মাসে সরোজ জন্মেছিল, উনিশ-শো-আটত্রিশের আগষ্ট মাসে সে মরবে। বীরের মতই মরবে। এতো লোককে সে চোখের সামনে মরতে দেখলো, এবার তার নিজেরই মরার পালা। মরণের সঙ্গে এবার মুখোমুখি পরিচয়।

মৃত্যুর কথা মনে উঠতেই, মনে পড়লো একে একে সেই সব মুখ, যাদেরকে সে খুন করেছে সঙীনের খোঁচায়, জার্মাণ যুদ্ধে, আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ও চীনের যুদ্ধে। এই সেদিনেও যে জাপানী যুবকটীকে সে ট্রেঞ্চের মধ্যে খুন করলো, তার মুখখানি আর সকলের চেয়ে স্পষ্ট হয়ে জেগে আছে মনের কুঠরীতে। সরোজ শিউরে উঠলো। নিজেকে সহসা বড় তুর্বল, একান্ত একা-একা মনে হোল।

নিজের তুর্বলতাকে দমন করার চেষ্টায় সরোজ ডেভিডের পানে তাকালো। তুই হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে সে দিব্যি ঝিমুচ্ছে। সরোজ ডাকলে—ডেভিড! ডেভিড!!

—ইয়েস্—বলে ডেভিড সোজা হয়ে বসলো!

—জাপানীদের হাতে এবার তাহলে আমরা সত্যিই মরলেম।

—তাই তো দেখছি।

—একটা পালাবার প্ল্যান্ ঠিক করতে পারলে না।

—প্ল্যান অনেক আছে, কিন্তু পথ একটাও নেই। প্রত্যেক জানালার নীচে সঙীন তুলে দাঁড়িয়ে আছে!

সরোজ কোন জবাব দিল না, মুখখানি মলিন হয়ে উঠলো।

ডেভিড বললে—আর ভেবে কি করবে বল, মৃত্যু যদি আসে, তাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়াই সত্যিকারের সাহসের পরিচয়।

—সহজে এক কথায় অনেক বিষয় বলা যায়, কিন্তু কাজে তা অভ্যাস করা বড় শক্ত।

—ওইভাবে চুপ করে বসে থাকলে অনেক দুঃশ্চিন্তা আসবে, সেইজন্যেই এসো খানিক গল্প করি,—বলে ডেভিড সুরু করলে—তুমি আমায় সেই কবিতাটী পড়িয়েছিলে মনে আছে?—

—তাতার তিব্বত অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

সেই কবি যদি আজ বেঁচে থাকতেন, আর জাপানের এই অত্যাচার দেখতেন, তাহলে কি লিখতেন জান?—

—পশুবুদ্ধি লভি অসভ্য জাপান
অস্ত্রবলে শুধু হয়ে বলীয়ান্
মহাচীনে করে হত্যা অভিযান
ভেবেছে এশিয়া করিবে জয়।

রোমানফ্ এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, ডেভিডের কবিতা পাঠ শুনে বলে উঠলো—কি কম্রেড, মনের আনন্দে গান গাইছো নাকি?

সরোজ বললে—গান নয়, কবিতা। কমরেড্ ডেভিড একটী কবিতা রচনা করেছেন।

ফাতু বললে—কবিতা লেখারই উপযুক্ত সময় বটে!

ডেভিড তাড়াতাড়ি বললে - নিজস্ব নয়, একটী বাংলা-কবিতার 'প্যারডি'।

—বাংলা কবিতা!—রোমানফ্ বলে উঠলো—তাই আমরা বুঝতে পারছি না। তবে যে শুনেছিলাম কমরেড ইংরাজ।

ডেভিড বললে—তাতে কি! বাঙালীরা ইংরাজীতে কবিতা লেখে, আর আমি বাংলায় কবিতা লিখতে পারবো না?

সরোজ বললে—নিশ্চয়!

রোমানফ্ বললে—কবিতাটী কি একবার শুনতে ইচ্ছা করছে।

ডেভিড কবিতাটীর ইংরাজী ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলে।

রোমানফ্‌ বললে—বাঃ, তুমি দেখছি এবার বাংলাভাষায় কবিতা লিখে নাম করবে! তা এক কাজ কর, এক টুকরো কাগজে ওইটী লিখে, ওর ইংরাজী অনুবাদ করে জাপ-মন্ত্রী হিরাতোর কাছে পাঠিয়ে দাও।

দরজা খোলার শব্দ হোল, একজন জাপানী ভিতরে প্রবেশ করলো, জোর গলায় বলে উঠলো—গুড্‌-মর্ণিং, ইণ্ডিয়ান্‌ হিরোজ! তোমাদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলেম। তোমরা আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমি তোমাদের চিনি। যে শোয়েমারুকে তোমরা গুলি করে মেরেছ, আমি তার ভাই ওকোয়ামা।

ক্ষণেকের জন্য যুবকের চোখ দুটী জল্‌ জল্‌ করে উঠলো, তারপরেই সে আবার সুরু করলো—ইতিহাসে পড়েছি, ইংলণ্ডের রাজা চার্লসের ফাঁসীর আদেশ হলে রাত্রে তার মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল, ফ্রান্সের লুই আর রুশিয়ার জারেরও নাকি ওই একই অবস্থা ঘটেছিল, তোমাদের তেমন কিছু হয়েছে কিনা তাই দেখতে এলেম।

সরোজ বা ডেভিড তার কথার উত্তর দিলে না।

ওকোয়ামা দরজার সামনে গিয়ে ডাকলো—কই মিস্‌ আয়েষা ভিতরে আসুন।

দুজন সৈনিক আয়েষাকে দরজার সামনে নিয়ে এল।

সরোজ ও ডেভিড চমকে উঠলো। আয়েষার পরণে জাপানী নাচের পোষাক। আবছায়ায় তার মলিন মুখখানি দেখে সরোজ ঠিক ঠাহর করতে পারলো না, সত্যই সে আয়েষা না আয়েষার ছদ্মবেশে আর কেউ।

ওকোয়ামা মৃদু হেসে বিদ্রূপ করলে—বোনের সঙ্গে শেষ দুটো কথা কয়ে নাও, আরেকটু পরেই তো বীরপুরুষদের কোর্টমার্শাল্‌ হবে, তখন তো ও-মুখ দিয়ে আর কথা সরবে না!

সরোজ সে-কথা কাণে তুললো না, বললে—তোমাকে এখানে দেখতে পাব, এ আশা করিনি।

আয়েষার দুচোখ জলে ভরে উঠেছিল, গলা রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, কোন কথাই সে বলতে পারলো না।

ওকোয়ামা সরোজদের বাংলা কথা বুঝলো না, তথাপি বিদ্রূপ করার লোভ সে সামলাতে পারলো না, বলে উঠলো—আয়েষা কি, 'গায়শা'! এ আর এখন আয়েষা নয়, এখন হিন্দু-গায়শা। সারা 'নিপ্‌পঁকে' হিন্দুনাচ দেখিয়ে চমক লাগিয়ে দেবে। তোমরা জাপানী যুদ্ধের ছবি দেখাবে ভারতে, আর তোমাদের বোন ভারতীয় নাচ দেখাবে জাপানে।—বেশ হবে না, কি মিস্‌ গায়শা?—বলে

আয়েষার থুৎনিটা ধরে সে নেড়ে দিলে। অপমানে আয়েষার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো।

সরোজ বললে—আমার হাত না বাঁধা থাকলে এই অপমানের উপযুক্ত উত্তর আমি দিতেম।

ওকোয়ামা হেসে উঠলো—পরাধীন দেশের কুকুর এল জাপানী সিংহের পিছনে ঘেউ ঘেউ করতে, কুকুরের চীৎকারে সিংহ ডরায় না।

—পরাধীন দেশের কুকুর হলেও জাপানীদের মত মেয়েদের আমরা অপমান করি না।

—অপমান! যাদের মান নেই, যারা ক্রীতদাস, তাদের আবার অপমান কিসের ?

—হাত দুটো বাঁধা না থাকলে বুঝিয়ে দিতাম আমাদের মান আছে কিনা!

হাহা করে ওকোয়ামা উপহাসের হাসি হেসে উঠলো। হাসি থামলে হয়তো কিছু বলত, কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটা লোক ভিতরে প্রবেশ করলো, সরোজ ও ডেভিড থ' হয়ে গেল, বিস্ময়ে দুজনের মুখ থেকে বাহির হয়ে এল—মার্কিরো!

মাকিরো একটু বাঁকা হাসি হাসলে, বললে—শুধু মার্কিরো নয়, 'মেজর' মার্কিরো। তবে দেশ হিসাবে মাঝে মাঝে আমি নাম বদলাই, চীনেতে 'ওয়াং', ব্রহ্মদেশে 'চেঙ', মালয়ে 'পেঙঙ্গ', ভারতে 'সান্', এমনি কত নামই আমার আছে। যাক তোমাদের সঙ্গে সে-সব কথার দরকার নেই, এখন ভদ্রলোকের মত গুটি-গুটি এখান থেকে বেরিয়ে পড় তো দেখি।

ডেভিড জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যেতে হবে ?

রোমানফ্ ঠাট্টা করে বললে—কোর্ট মার্শাল্!

মার্কিরোর দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠলো, বললে—যেখানে যাবার গেলেই দেখতে পাবে।

বাহিরে এসে মার্কিরো জাপ রক্ষীদের ইঙ্গিৎ করলো, প্রত্যেক বন্দীর দুপাশে দুটী জাপানী সৈন্য এসে দাঁড়ালো, মার্চ করিয়ে নিয়ে চললো বারান্দা দিয়ে।

প্রতি পদক্ষেপে চারজন বন্দীর মনে আসন্ন মৃত্যুর এক একটী ছবি ফুটে উঠছিল। কি তার যন্ত্রণা কে জানে! মানুষের জীবনে মৃত্যুর সঙ্গে দু'বার পরিচয় ঘটে না, তার অভিজ্ঞতার ইতিহাসও কোথাও তাই মেলে না।

মার্কিরো তাদের মার্চ করিয়ে নিয়ে এল জেটীতে। ছোট একখানি জাপানী যুদ্ধ জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল, একখানি ষ্টীমলঞ্চে তুলে তাদেরকে সেই জাহাজে নিয়ে

যাওয়া হোল। অফিসারের সঙ্গে মার্কিরোর দেশীভাষায় কি সব কথাবার্তা হোল, ক্যাপ্‌টেন্‌ তাদেরকে নাবিয়ে নিয়ে গেল জাহাজের খোলের মধ্যে। ইলেক্‌ট্রিক না জ্বাললে সে অন্ধকার কিছুই চোখে পড়ে না। একধারে কয়েকটা পিঁপে সরিয়ে ক্যাপ্‌টেন্‌ একটি ঘরের দরজা খুললে। রঙ আর পালিশের খানিকটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ বাহির হয়ে এল। সৈনিকেরা সেই ঘরটার মধ্যে সরোজদের ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

অন্ধকার। ছিদ্রহীন অন্ধকার। দৃষ্টিহীন অন্ধকার। সরোজ ছিল সকলের আগে, দু' পা যেতে না যেতে হঠাৎ জাহাজ দুলে উঠলো, হুমড়ি খেয়ে সরোজ পড়ে গেল। হাত-বাঁধা, সামলে নেবার উপায় নেই। সারা দেহ প্রহারের ব্যাথায় জর্জরিত, পতনের ফলে লাগলোও খুব, সরোজ আর উঠে বসতে পারলো না।

রোমানফ্‌ সরোজের পাশে এসে বসলো, বললে—লেগেছে খুব ?

—নাঃ, বিশেষ লাগেনি—সরোজ বললে—তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

ডেভিড বললে—দুশ্চিন্তার আছে কি ? মরণকে অনেকবার ফাঁকি দিয়েছি, এবার না হয় নিশ্চিত মরবো।

—আগেকার দিনে এমনিভাবে জাহাজ বোঝাই করে নিগ্রোদের ধরে নিয়ে যেত ক্রীতদাস করে বিক্রী করার জন্য। মনে করতেম এখন সে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে, এখন দেখছি তা নয়,—রোমানফ্‌ বললে।

ফাতু বললে—জাপানে ক্রীতদাসের প্রচলন তো এখনও আছে। সেখানে মেয়ে বিক্রী হয়। চীন যদি তারা জয় করতে পারে, তাহলে এই যুদ্ধের পরে চীনা-ছেলেদের দাস হিসাবে তোকিওর বাজারে হয়তো বিক্রী হতেও দেখা যাবে।

ডেভিড বললে— আমরা কি তার নমুনা যাচ্ছি নাকি ?

ফাতু বললে—তাতেও অবাক হবার কিছুই নেই।

রোমানফ্‌ বললে—জাপানীদের দাস হওয়ার চেয়ে তাদের গুলি খাওয়া ভাল।

আয়েষা চুপ করে এক কোণে বসেছিল, এবার সে শান্তস্বরে বললে—চেষ্টা করলে কি আমরা এখান থেকে পালাতে পারি না ?

রোমানফ্‌ হেসে উঠলো, বললে—কোন দিকে একটা ইঁদুর গলবার ফাঁক নেই, আর পাঁচটা মানুষ পালিয়ে যাবে !

সহসা খানিকটা উষ্ণ জল এসে পড়লো তাদের গায়ে, সকলে চমকে উঠলো !

আবার আরেক, পশলা। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে এক ধারে দেওয়ালের পাশে সরে

গেল। হি-হি করে ঘরের বাইরে থেকে জাপানী হাসির শব্দ শোনা গেল, সরোজ বললে—এরা কি আমাদের গরম জলে ঝল্‌সে মরার মতলব করেছে নাকি !

আবার এক পশলা উষ্ণ জল। কয়েক ফোঁটা সরোজের মুখে পড়ে জ্বালা করতে লাগলো। সরোজ আরো কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে আদেশ শোনা গেল—হাস্‌স্ সাইলেণ্ট !

সকলে বক্তার স্বর লক্ষ্য করে উপরের দিকে তাকালো, কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। সরোজ চীৎকার করে উঠলো—আমাদের গরম জলে পুড়িয়ে মারবে আর আমরা চুপ করে তাই সইব !

সঙ্গে সঙ্গে আর এক পশলা গরম জল। সন্ত্রস্ত বন্দীদের বাধ্য হয়ে এবার চুপ করতে হোল। উপরে আবার সেই হাসির শব্দ শোনা গেল। কিন্তু বন্দীদের মধ্যে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না দেখে, আর গরম জল পড়লো না।

সরোজ চাপা গলায় তর্জন করে উঠলো—অসভ্য ! বর্বর !

জাহাজ চলছে। ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ করে ইঞ্জিনের শব্দ আর জলের উচ্ছ্বাস শোনা যায়। একটী একটী করে মুহূর্ত কাটতে থাকে, চারিপাশের সুগভীর অন্ধকার চোখের উপর ভারী হয়ে ওঠে। অন্ধকার চারিপাশে যেন গায়ের সঙ্গে লেপ্টে যাচ্ছে, চিন্তাশক্তিকে বিভ্রান্ত করে তুলছে। সে অন্ধকারের পীড়ন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য স্তব্ধতা ভেঙে ফেলার প্রয়োজন, কিছু কথা বলার দরকার, কিন্তু গরম জলের ভয়ে কেউই মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। অন্ধকারে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো, জাহাজের দোল খেতে খেতে দেহ হয়ে এল অবসন্ন। বন্দীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

কিন্তু ঘুমানো চললো না, কখন এক ঝাঁক মশা এসে তাদের আক্রমণ করলো। বন্‌বন্ ডাকে আর দংশনে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। মশার উদ্দেশ্যে দেহের নানাস্থানে নানাজনের চাপড় মারার শব্দে কক্ষটি মুখর হয়ে উঠলো।

অস্বস্তি, অবসাদ আর পরিশ্রান্তি—সব মিলে দেহ ও মন যেন নেতিয়ে পড়ে।

এদিকে জাহাজ দুলে দুলে আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলেছে। কতক্ষণ চলেছে তার হিসাব নেই, ঘড়ি নেই। দিন কি রাত তাও বোঝা যায় না, অন্ধকার সমানই আছে।

তবে ইতিমধ্যে জাপানীরা ভদ্রতা করেছে, এক কাপ করে চা আর দু-টুকরো করে রুটি পাঠিয়েছে দুবার। খাবারওলার পিছনে পিস্তল হাতে দু'জন সৈনিক দাঁড়িয়েছিল। প্রথমবারে ক'টা বেজেছে, দিন কি রাত, জিজ্ঞাসা করতেই

ডেভিডকে সৈনিক দুজন খুব কড়া এক হুমকি দিয়ে গেছে। দ্বিতীয় বারে তাই আর কেউ কোন কথাই তোলেনি।

মাঝে আবার একবার চুপি চুপি আয়েষা কথা তুলেছিল—আচ্ছা, এই জাহাজ থেকে পালানো যায় না?

রোমানফ্‌ বললে—এই ঘর থেকে বাহির হয়ে পলানো সম্ভব নয়, বাহিরের পাহারাদারগুলোকে যদি-বা ঘায়েল করতে পারি, উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে দশজন জাপানীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কাজেই এখন পালানোর কথা উঠ্‌তেই পারে না, জাহাজ থেকে না-নাবা পর্যন্ত ও কথা ভাবা মিছে!

ডেভিড বললে—নেবেই হয়তো ওরা আমাদের কোর্টমার্শাল করবে।

ফাতু বললে– আমারও তাই মনে হয়, খুন করা জাপানীদের একটা সখ, যখন তখন যাকে তাকে ওরা হারিকিরি করে বসে।

সরোজ বললে - এমনি ভাবে বাঁচার চেয়ে মরণই ভাল। জীবনের উপর আমার আর বিশেষ মমতা নেই, অনেক দিন তো বাঁচলেম, সাঁইত্রিশ বছর জীবন তো কম নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিমধ্যে কত অদলবদল হয়ে গেল, আমাদেরও তো পরিবর্তনের দরকার। মুক্ত আলো হাওয়ার অভাবে জীবনটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে—চোখ তো প্রায় অন্ধ হবার অবস্থা, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে; মৃত্যু যেন এখন একটা মুক্তির আশীর্বাদ বলে মনে হচ্ছে। ইচ্ছা হচ্ছে মৃত্যুকে এখনই অভিনন্দন জানিয়ে বলি—'এসো মৃত্যু, এই বায়ুহীন দৃষ্টিহীন অন্ধকারের হাত থেকে মশক দংশনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও, তুমি এসো!'

ডেভিড বলো উঠলো—ব্রেভো, তুমি দেখছি এবার 'টমাস-গ্রে'র 'এলিজি'র মত আর এক মৃত্যুর কবিতা লিখে বসবে!

বাহিরে শব্দ হোল - হাস্‌স্‌! সাইলেণ্ট!!

জাহাজ চলে। জলের ধাক্কা এসে লাগে ছলাৎ ছলাৎ। বন্দীদের বেদনার উচ্ছ্বাসে সাগরে ক্রন্দনের মূর্চ্ছনা জেগেছে। বন্দীদের অসন্তোষের অভিযোগে ইঞ্জিনটা অবিরাম বিরক্তি জানাচ্ছে ঘস্‌-ঘস্‌ ঘস্‌-ঘস্‌ ঘস্‌-ঘস্‌। গর্বিত জাহাজখানি হেলে-দুলে জলের বুকে পিছলে চলেছে নিজের অহমিকায় সবকিছু উপেক্ষা করে। চলেছে, চলেছে।

রাত্রির অন্ধকারে এক আলোহীন বন্দরে তাদের নাবানো হোল।

শুধু তারা ক'জন নয়, আরো অনেক আছে।

অন্ধকারে বন্দীদের মার্চ করিয়ে নিয়ে আসা হোল বন্দরের বাইরে। চাঁদের স্তিমিত আলো এসে পড়েছে। দুপাশের ভেঙে-পড়া বাড়ীগুলি আলোছায়ায় ভয়াবহ দৈত্যের কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে জাপ সৈনিকের ছায়া, আর চিকমিকে বেয়োনেট।

'ব্ল্যাক-মেরিয়া'র মত চারিপাশ-ঘেরা 'ভ্যান্' দাঁড়িয়েছিল পথের উপর। যতজন করে সম্ভব এক একটী ভ্যানের মধ্যে তুলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। তারপরেই মোটর চলতে সুরু করলো।

সে কি যন্ত্রনাদায়ক অবস্থা! কাছাকাছি, ঘেঁষাঘেঁষি, তার উপর ঝাঁকানি। কা'র মাথা কার নাকে এসে ঠুকে গেল, কে কার গায়ের উপর গিয়ে পড়লো, সে সামলাতে পারলে না, কাঠের পার্টিশানে ধাক্কা লেগে তার কপাল ফুলে গেল, কেউ আবার সামনে কাউকে ধরে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে অন্ধকারে তার মুখে আঘাত করে বসলো।

বোমাহত পথে পিচ্ ঢালা সমতা নেই, গাড়ী যত জোরে চলছে ঝাঁকানিও তত বেশী লাগছে, অবিরাম অসহনীয়। কোন রকমেই অবস্থাটা আয়ত্ত করা যাচ্ছে না। মাথার উপর লোহার জাল দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝিলিক আসছে তাই রক্ষা, নইলে কি যে হোত!

কিছুক্ষণ পরে দূরে কামানের গর্জন শোনা গেল। কামান কি বোমা ঠিক বোঝা গেল না, তবে বার বার বুম্ বুম্ শব্দে জানা গেল কাছাকাছি কোথাও যুদ্ধ চলছে। সে অনুমান সত্য হোল, যখন আরো খানিক এগিয়ে যাবার পরে বুম্ করে একটা শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আলোর দীপ্তি জাল ভেদ করে ভ্যানের মধ্যে ঢুকে চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। গাড়ী থামলো। ভ্যানের দরজা খুলে বন্দীদের নাবানো হোল। দু সারি সৈন্য তাদের মার্চ করিয়ে নিয়ে গেল এক বাড়ীর মধ্যে। সেখানে এক অন্ধকার ঘরে তাদের বসিয়ে রাখা হোল কিছুক্ষণ। ভোর বেলা শান্ত্রীরা তাদের দাঁড় করিয়ে দিলে বাড়ীর উঠানে, তারপর নম্বরের এক একটী টিনের চাক্তি এক একজনের গলায় ঝুলিয়ে দিলে। চাক্তিখানায় জাপানী ভাষায় কি লেখা সরোজ বুঝতে পারলো না। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হোল না। রক্ষীরা আবার তাদের নিয়ে এল আরেকটী ঘরে। হল ঘর। সমস্ত ঘরখানিতে খড় বিছিয়ে তার উপর একখানি চট পাতা আছে, সেই চটের উপর শুয়ে জন কতক লোক ঘুমোচ্ছিল। জাপ-রক্ষী ইংরাজীতে বললে,—তোমরা এইখানে বিশ্রাম কর, এইটাই, তোমাদের গ্রুপ।

সরোজ সাহস করে জিজ্ঞাসা করলে—আমাদের বোনকে তো দেখছি না, সেও তো এল আমাদের সঙ্গে।

জাপসৈনিক গম্ভীরভাবে বললে—জানিনা।

সৈনিকটী গট্‌গট্‌ করে ওদিকে চলে গেল, সরোজ বুঝলে কোন কথা বলতে সে রাজী নয়।

অনাহারে ও অনিদ্রায় দেহে মনে সরোজ অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয় করছিল, আরও পাঁচজনের মত সেও সেইখানে শুয়ে পড়লো।

সরোজ ঘুমিয়ে পড়েছিল, আচম্বিতে পিঠের উপর চাবুকের জ্বালা উপলব্ধি করে তার ঘুম ভেঙে গেল।

চারিপাশে রাত্রির অন্ধকার, টর্চ হাতে একজন জাপসৈনিক তাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে, ডান হাতে তার একখানি দীর্ঘ বেত।

বন্দীদের তখনই সারবন্দী হবার আদেশ হোল।

বন্দীর দলকে সেই অন্ধকারেই তারা মার্চ করিয়ে নিয়ে চললো।

প্রায় দু-তিন মাইল পথ হবে। অগ্রসর হতে হতে তারা বুঝতে পারলে ক্রমশঃই তারা যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী হচ্ছে। এখানে ওখানে চোখের সামনে বুম্ বুম্ করে সেল্ ফাটছে, আলোর ঝিলিমিলি চারিপাশ ঝল্‌সে দিচ্ছে। দু-একখানি বাড়ী ভেঙে পড়ার দুরদুর্ শব্দও কানে এসে লাগছে।

একটি ভেঙে-পড়া বাড়ীর মধ্যে তাদের নিয়ে আসা হোল। বাড়ীটীর বাইরে অন্ধকার, ভিতরটা কিন্তু আলোয় আলো। বাইরে থেকে আলোগুলির এতটুকু আভাষ পাওয়া যায় না। বাড়ীটীর উঠান থেকে 'ট্রেঞ্চ' কাটা হয়েছে। ট্রেঞ্চটী বরাবর মাটীর উপর দিয়ে না গিয়ে, সুঁড়িপথের মত ক্রমশঃ মাটীর নীচে চলে গেছে। ইলেকট্রিকের আলো বরাবর চলে গেছে সুঁড়িপথের মধ্যে। বন্দীদের সেই পথে অগ্রসর হতে হোল। সরোজের মনে বারেক একটা আতঙ্ক জাগলো—এখানে তাদের জীবন্ত সমাধি দেবে না তো? কিন্তু জাপানীরা যা'ই এখন করুক, নিরস্ত্র তারা, প্রতিবিধান করার শক্তি তাদের নেই। আর পাঁচজনের মত সরোজকেও অগ্রসর হতে হোল সেই সুঁড়িপথে।

আটদশ ফিট চওড়া গলিপথ, বরাবর চলে গেছে। লোহার পাত আর লোহার থাম দিয়ে ছাদটাকে এমন ভাবে গেঁথে রাখা হয়েছে যেন মাথার উপর না ধ্বসে পড়ে। ইলেকট্রিকের পাম্প চলার মত ঘস্ ঘস্ করে একটা মৃদু শব্দ পাওয়া

যাচ্ছে। ক্রমশঃ শব্দটি জোরালো হয়ে উঠলো, কাছে এসে দেখা গেল, ছোট একটা মাটি-খোঁড়া কল চলছে। কলে মাটি কাটা হচ্ছে। সেই মাটি পিছনে এসে পড়ছে, ঠেলা গাড়ী বোঝাই করে একদল লোক সেই মাটি সুঁড়িপথের বাইরে ফেলে আসছে। আরেক দল লোক সঙ্গে সঙ্গে লোহার পাত লাগিয়ে পাশে পাশে থাম গেঁথে সুঁড়িপথের কাঁচা ছাদকে ধ্বসে পড়া থেকে রক্ষা করছে। প্রতি মিনিটে সুড়ঙ্গ দীর্ঘতর হয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছে।

সরোজ এসে পৌছাতেই হুইশিল্ বাজলো। দুর্বোধ্য ভাষায় এক আদেশ শোনা গেল, যারা কাজ করছিল তারা কাজ বন্ধ করে সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। তারপর মার্চ করে চলে গেল বাইরের দিকে। নবাগতের দল তাদের স্থান দখল করলো।

সরোজের উপর একখানি ঠেলা গাড়ী ঠেলবার ভার পড়লো। মাটী বোঝাই গাড়ী একজন এনে দিচ্ছে, লোহার রেলপথের উপর দিয়ে সেই গাড়ী ঠেলে সরোজ বাইরে নিয়ে আসছে। একজন তৎক্ষণাৎ গাড়ী খালি করে দিচ্ছে, আবার খালি গাড়ীটী নিয়ে সরোজকে সেই ঢালু পথে ফিরে আসতে হচ্ছে সন্তর্পণে।

গাড়ী ঠেলে ঠেলে সরোজ হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল। টস্‌টস্ করে ঘাম ঝরতে লাগলো। স্নায়ুগুলি ঝিম্‌ঝিম্ করে,—শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। বারেক দাঁড়িয়ে একটা নিশ্বাস ফেলার অবসর নেই, জাপ শান্ত্রীরা অবিরাম ঘুরছে, কোথাও বন্দীদের কাজের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলেই হাতের চাবুক নাচাতে নাচাতে পিঠের উপর ফেলছে—সপ্‌সপ্।

সরোজের গলা শুকিয়ে আসে। প্রতি পদক্ষেপে যে তার পা টলছে তা সে বেশ বুঝতে পারে। ক'বার ডেভিড ও ফাতুর সঙ্গে তার চোখোচোখি হয়েছিল কিন্তু কথা বলতে সাহস পায়নি বেত খাবার ভয়ে।

সেইভাবেই সরোজ খাটছিল, ঠেলা গাড়ী একবার ঢালু পথে নামিয়ে আনার সময় সহসা তার পা টলে গেল, ঘুরে সে পড়ে গেল, আর উঠলো না।

জাপ শান্ত্রীটী এগিয়ে এল, সপাং করে হাতের বেত দিয়ে সরোজের পিঠের উপর এক ঘা বসিয়ে দিলে। কিন্তু পর পর তিন-ঘা মেরেও যখন সরোজের দিক থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না, তখন তার হাত দুটো ধ'রে টেনে সরিয়ে দিলে একপাশে। অচেতন লোকটীর চেতনা সম্পাদনের জন্য আর কিছু করবার আছে বলে সে মনে করলে না

জ্ঞান হতেই সরোজ ধড়মড় করে উঠে বসলো।

তাকে উঠতে দেখে গট্‌গট্‌ করে একজন জাপানী শান্ত্রী এসে সামনে দাঁড়ালো। আব্‌ছা আলোয় কিছুক্ষণ সরোজ তাকিয়ে রইল তার মুখের পানে।

জাপ-সৈনিকটী একটী মগ সরোজের দিকে এগিয়ে দিলে, ইংরাজীতে বললে—তোর খাবার।

খিদে পেয়েছিল, মগটী সরোজ তুলে নিলে। ভিতরে কি একটী তরল পদার্থ, একচুমুক পান করে সরোজ বুঝতে পারলো সেটা ভাতের ফ্যান—খেতে নেহাৎ খারাপ লাগলো না, কয়েক চুমুকে সরোজ মগ খালি করে ফেললো।

শান্ত্রী আদেশ করলে—শুয়ে পড়।

সরোজ একবার চারিপাশে তাকিয়ে দেখলো, বন্দীরা সকলেই ঘুমুচ্ছে, তাদের মধ্যে ডেভিড ও ফাতুর মুখ সে ঠাহর করতে পারলো না।

শান্ত্রী হাতের বেতটী দিয়ে সরোজের কপালে খোঁচা দিলে, বললে—শুয়ে পড়।

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরোজ শুয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে বিউগিলের শব্দে বন্দীদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। এক কাপ করে চা খেয়ে আবার তাদের মার্চ স্বরু হোল'

সেই সুঁড়িপথে আবার সেই মাটী কাটা আর গাড়ী ঠেলার কাজ—নির্বাক পরিশ্রম,...কথা বললেই প্রহার...কয়েক ঘণ্টা গলদঘর্ম হবার পর কাজের বিরতি,—ফিরে এসে এক মগ করে ফ্যানভাত আহার, তারপর খড়ের বিছানায় শুয়ে নিদ্রা।

—এই ভাবেই দিন কাটে।

সরোজ চঞ্চল হয়ে উঠলো। কেন সে জাপানীদের জন্য খাটবে? কিসের জন্য? এই সুঁড়িপথ তারা কি উদ্দেশ্যে তৈরী করাচ্ছে কে জানে? নিশ্চয়ই এখানে জাপানীদের কোন বিশেষ স্বার্থ আছে, যেজন্য এতগুলি বন্দীর কোর্টমার্শাল না করে এখানে এনে খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এবং সে উদ্দেশ্য হোল চীনাদের আঘাত করা। যে চীনাদের সে সাহায্য করতে চায়, প্রকারান্তরে তাদেরই ধ্বংসের পথ সে প্রশস্ত করছে! ভাবতে ভাবতে সরোজের মন উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

সহসা ডেভিডকে মুখোমুখি পেয়েই সরোজ বলে উঠলো—এখান থেকে পালাতে হবে ডেভিড, এখান থেকে পালাবই!

ডেভিড ছাদের লোহার পাতের উপর হাতুড়ি ঠুকছিল, বারেক সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে বললে—আচ্ছা, সে পরে হবে'খন।

—পরে হবে? পরে হবে কেন?—আজই হবে, এখনি হবে। সাংহাই বোম্বার্ড করে এলাম সে কি ওই জাপানীদের কুলিগিরি করার জন্য? এর চেয়ে তো কোর্ট-মার্শালে মরাও ভাল ছিল!

সরোজের কথা আর শেষ হোল না, শান্ত্রীর বেত এসে পড়লো তার পিঠের উপর—সপাং সপাং সপাং।

তখনকার মত সরোজ চুপ করলো বটে, কিন্তু দেহে মনে সে স্থির হতে পারলো না, পিঠের বেদনাও বটে মনের উত্তেজনাও বটে।

সুঁড়িপথ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে; শেষের দিকটা ইংরেজী T অক্ষরের মত দুমুখো হয়ে গেল। দুদিকে ঘস্ ঘস্ করে দুটো মেসিন চলছে, তারই সঙ্গে অত্যন্ত সন্তর্পণে ছোট ছোট ডিনামাইটের বাক্স সাজান হচ্ছে। বাক্সগুলির সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিকের তার লাগানো। দুটি তার সুঁড়িপথের একধার দিয়ে লতিয়ে লতিয়ে চলেছে। একবার চার্জ করলেই সব 'মাইন্' একসঙ্গে ফেটে গিয়ে মাটীর উপর যা আছে সব বিধ্বস্ত করে দেবে। মাটীর উপর কি আছে কে জানে, হয়তো কোন বিরাট সেনাবাহিনী, নয়তো চীনাদের অতি মূল্যবান কিছু, যা ধ্বংস করা জাপানীদের একান্ত প্রয়োজন।...

যতক্ষণ খাটে ততক্ষণ সরোজ ভাবে। বিশ্রামের সময়েও সে ছাদের পানে চোখ চেয়ে শুয়ে থাকে: অন্ধকার চারিপাশে থম্ থম্ করছে। বন্দীদের নিঃশ্বাস হিস্-হিস্ করতে থাকে—বিক্ষুব্ধ সাপের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত। সরোজ অশান্ত চিত্তে ছট্‌ফট্ করে, তার মনে হয় যেন জীবনটা হঠাৎ থেমে গেছে। মুহূর্তগুলি আর এগুচ্ছে না, বন্দীত্বের বন্ধনে কর্মময় জগৎ তাদের জীবন থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু দেহের মধ্যে প্রাণের স্পন্দনটুকু জেগে আছে,—তারা বেঁচে আছে! কিন্তু এই বেঁচে থাকার মূল্য কি? একটা কথা বলার স্বাধীনতা নেই, নিজের ইচ্ছামত একটী কাজ করার অধিকার নেই,—এক-একটী সজীব যন্ত্র শুধু। এভাবে জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না, মুক্তি চাই—মৃত্যুও শ্রেয়। কিন্তু মৃত্যুকে বরণ করার আগে পালাবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে—পালাতেই হবে! চিন্তিত সরোজ অন্যমনস্কের মত উচ্চারণ করলো—পালাতেই হবে—পালাবই!

—নিশ্চয় পালাব!

কানের পাশে বাংলা কথা শুনে সরোজ চমকে উঠলো। ফিরে তাকিয়ে দেখে : পাশে কে শুয়ে আছে, অন্ধকারে তাকে ঠিক ঠাহর করা যায় না। সরোজের মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

পাশের বন্দীটি অন্ধকারে সরোজের একখানি হাত চেপে ধরলো, বললে—আমি ডেভিড।

ডেভিডের মুখ সরোজ ভাল করে দেখে নেবার চেষ্টা করলো।

ডেভিড বললে—আমরা পালাব, ফাতু সব প্ল্যান করে ফেলেছে!

পালাব···ফাতু···প্ল্যান···সরোজের সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। জার্মাণ যুদ্ধের আমল থেকে এই ধরণের স্পাইদের কথা সে শুনে আসছে। কত বইয়ে পড়েছে, ফিল্মেও দেখেছে। মনের কথা বাহির করতে এরা অদ্বিতীয়। সরোজ আর কোন কথা বলে না, একেবারে মুখ বন্ধ।

কোন উত্তর না পেয়ে ডেভিড বুঝতে পারে, বলে—আমায় বিশ্বাস কর সরোজ আমি ডেভিড!

—অবিশ্বাস তো করিনি!

সরোজের কথায় আন্তরিকতার অভাব দেখে ডেভিড হতাশ হয়ে পড়ে, বলে—বেশ, কাল ফাতুর মুখেই সব শুনো।

পরদিন রাত্রে আলো নিভানোর সঙ্গে সঙ্গে পাশের লোকটী বলতে সুরু করে করে—তুংচি-কমরেড্‌!

সরোজ প্রথমে না-শোনার ভাণ করে।

—তুংচি সরোজ!—পাশের লোকটী আবার ডাকে।

সরোজ বললে—কি?

—আমি কমরেড্‌ ফাতু।

—হুঁ।

—আমরা পালাবার সব ঠিক করে ফেলেছি, তুমি তৈরী থাকবে।

ফাতুকে সরোজ সুঁড়িপথে বহুবার দেখেছে, কিন্তু সেই ফাতুই যে তার পাশে কথা বলছে সরোজ সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারে না, অন্ধকারে তাকে চেনারও উপায় নেই। হয়তো তাদের হত্যা করার একটা উপলক্ষ খুঁজছে জাপানীরা।

কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই ফাতু বলে—মাইন পোঁতার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের এক বিরাট বাহিনীকে ওরা ধ্বংস করার উদ্যোগ করছে,

তার সঙ্গে নান্‌কিঙের গবর্মেণ্ট-আফিস অঞ্চলও ওরা উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে ; এ আমরা চুপ করে দেখতে পারবো না। এদের প্ল্যান আমি ব্যর্থ করবো, আর সেই সঙ্গে আমাদের পালাবারও সুযোগ পাওয়া যাবে, আর যদি পালাতে না পারি, মরতেই হয়—বীরের মতই মরবো! এভাবে বাঁচতে আমরা চাইনা! তুমিও কাল প্রস্তুত থাকবে।

রক্ষী দুজন পদচারণা করছিল, একজনের এদিকে আসার শব্দ পাওয়া গেল—খট্ খট্ খট্। ফাতু চুপ করলো, একপাক গড়িয়ে সরোজের কাছ থেকে একটু তফাতে সরে গেল।

ঘস্‌ঘস্ ঘস্‌ঘস্ করে মাটি-কাটা কল চলছে।

ঠুন্‌ঠান্ ঠুক্‌ঠাক্ করে হাতুড়ি শব্দিত হচ্ছে।

ঘর্ঘর করে ঠেলাগাড়ীর চাকা ঘুরছে।

বেত হাতে জাপ প্রহরী ঘুরছে।

সুঁড়িপথে কাজ এগুচ্ছে।

বন্দীদের এতটুকু সাড়াশব্দ নেই, রক্ষীরা নির্বাক।

সেই স্তব্ধতার মাঝে সহসা স্বর শোনা গেল, কে একজন চীনাভাষায় গান গেয়ে উঠলো—জি-পান-জেন পাংয়ু—জাপানী বন্ধু আমার!

একজন জাপানী প্রহরী জনৈক বন্দীকে দু-ঘা চাব্‌কে দিলে।

বন্দীটা কিন্তু চুপ করলো না, খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো, তারপর শান্ত্রীর চিবুক ধরে বারেক নেড়ে দিয়ে কোমরে হাত দিয়ে নাচতে সুরু করলো। বন্দী ও শান্ত্রীরা এক সঙ্গে হেসে উঠলো, ইংরাজীতে কে একজন বলে উঠলো—পাগল!

প্রহরীটা এবার এক ধাক্কা মারলো, নর্তক চীনাটা ধুপ করে পড়ে গেল। সরোজ এবার তার মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পেলে : খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ উঠে, আর কাদামাটি লেগে সহসা চেনা যায় না, তবু জল্‌জলে দুটী চোখ দেখলে ভুল হবার উপায় নেই, সে কমরেড্ ফাতু।

সহসা ওদিকে কার হাত থেকে একটা হাতুড়ি পড়ে লোহার পাতের উপর ঠন্‌ঠন্ শব্দ তুললো। পরমুহূর্তেই সুঁড়িপথের আরেক দিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। আয়েষা ওদিকে ডিনামাইটের বাক্সগুলির পাশ দিয়ে ইলেকট্রিকের তার টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ঠন্‌ঠনানির সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির উপর আছ্‌ড়ে পড়লো, ধীরে ধীরে মৃদু স্বরে চীৎকার করে উঠলো—শাক্যমুণি, শাক্যমুণি!

এবার সত্যই বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। যে সব জাপ প্রহরী এতক্ষণ মুখখানি পেঁচার মত করে বিরক্তি প্রকাশ করছিল, তারাও এবার আয়েষার চারিপাশে জড়ো হল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফাতুর গলা শোনা গেল—নি হাউ—জয়স্ত !

বন্দীরা এই ইঙ্গিতেরই বোধহয় এতক্ষণ প্রতীক্ষা করছিল, একযোগে জাপ সৈনিকগুলির উপর তারা লাফিয়ে পড়লো। শান্ত্রীরা আত্মরক্ষা করবে কি, এই অভাবিত আক্রমণের জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বন্দীরা ছিল রক্ষীদের চেয়ে অনেক বেশী, প্রহরীরা কোন বাধা দেবার আগেই বন্দুক বন্দীরা কেড়ে নিলে। তারপরেই ফাতুর গলা শোনা গেল, চীনাভাষায় সঙ্গীদের কি যেন সে আদেশ করলো। চীনারা বন্দুক বাগিয়ে ধরলো, কট্‌কট্‌ কট্‌কট্‌ করে বন্দুকের ট্রিগার গর্জে উঠলো তাদের হাতে, কয়েকটী গুলি ডিনামাইটের কেসগুলি ফুটো করে দিলে। নিমেষে ভীষণ শব্দে কান ফাটিয়ে ডিনামাইট্‌ ফেটে পড়লো—বুম্‌ ভট্‌-ভট্‌ বুম্‌ম্‌—!

মাটি কেঁপে উঠলো, বিদ্যুতের আলোগুলি সব নিভে গেল, সুড়ঁিপথের ছাদের খানিকটা অংশ উড়ে গেল, নাকে মুখে এসে ঢুকলো ধূলো। ক্ষণেকের জন্য সরোজের মনে হোল মৃত্যু বুঝি এখনি তাকে গ্রাস করে ফেলবে, হৃদপিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। মাথার উপর এসে পড়লো মাটির চাপড়া, মাথাটা ঘুরে গেল, চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। সরোজ ঘুরে পড়ে গেল, বেশ বুঝতে পারলো বিধ্বস্ত সুঁড়ি পথের ধ্বংসস্তূপের মাঝে তার জীবন্ত সমাধি হচ্ছে।

চমক যখন ভাঙলো সরোজ দেখলে তার নড়াচড়ার এতটুকু সামর্থ নেই। বারেক স্তব্ধ হয়ে সরোজ সারা দেহকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলো, তারপর আবিষ্কার করলো তার দুটী পা হাঁটু অবধি মাটিতে গেঁথে গেছে। দুহাতে মাটি সরিয়ে কিছুক্ষণ গলদ্‌ঘর্ম হয়ে সরোজ পা দুখানি টেনে বাহির করলো। তারপর চারি পাশের অন্ধকারের মাঝে তার ধাঁধা লেগে গেল। কোন্‌দিকে যাবে, কি করবে ভাবছে, এমন সময় চোখের উপর টর্চের আলো এসে পড়লো, সরোজ চমকে উঠলো। ইংরাজীতে প্রশ্ন হোল,—কে কম্‌রেড্‌ সরোজ, না ?

কার গলা সরোজ চিন্‌তে পারলো না, বললে—কে ?

—আমি রোমানফ্‌।

—রোমানফ্‌ ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা বলার আর সময় নেই। আমার পায়ে চোট লেগেছে আমি উঠে দাঁড়াতে পারছি না। এই নাও টর্চ, যারা সুস্থ আছে তাদের নিয়ে বাহির হয়ে পড়, ওই সাম্‌নের পথে।

—আর তুমি ?

—আমার কথা ভাব্‌বার সময় এখন নয়, আমি এখানেই মরবো। আর কথা বলবার সময় নেই, এখনি জাপানীরা এসে তোমাদের ধরে ফেলবে, আর দাঁড়িও না, সামনের দিকে বরাবর চলে যাও—ছোটো।

—তা বলে তোমাকে এখানে ফেলে যেতে পারি না—বলে সরোজ এগিয়ে গিয়ে রোমানফ কে কাঁধের উপর তুলে নিলে, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—ডেভিডকে দেখেছ ? আয়েষা ? ফাতু ?

—সব আগে আছে, আগে—তাড়াতাড়ি চল, তাড়াতাড়ি—

সরোজ অগ্রসর হোল। সুঁড়িপথটা ধ্বসে পড়েছে, আকাশের তারা দেখা যায়। কিন্তু চারিপাশ এত উঁচু যে, উপরে উঠে যাবার পথ নেই। টর্চের আলোয় পথ দেখে সদ্য-বিধ্বস্ত উঁচুনীচু সুঁড়িপথের উপর দিয়ে কোন রকমে অগ্রসর হোল। সে যে কি কষ্টকর ব্যাপার তা লিখে বোঝানো যায় না। কদিন তো ভাল খাওয়াই হয়নি, তার উপর খাটুনি হয়েছে অত্যধিক, দেহ থেকে অবসাদ যেন আর ছাড়তে চায় না। এখন কাঁধের উপর একটা বোঝা নিয়ে অন্ধকারে অজানা পথে ছুটতে হচ্ছে। অথচ পায়ের নীচের মাটিকে বিশ্বাস করার উপায় নেই। পদে পদে পা বসে যাচ্ছে, পিছলে পড়ছে, বাধা লাগছে। প্রতিটী পা ফেলতে হবে সন্তর্পণে, তার উপর আবার ছুটতে হবে। কোথায় যাবে জানা নেই, কোন্‌দিকে যাচ্ছে তাও জানে না, আবার পিছনে শত্রুর ভয়ও আছে।

রোমানফ্‌ কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল, মাঝে মাঝে দু-একটা ঝাঁকানি লাগলে যন্ত্রণায় অব্যক্ত শব্দ করে উঠছিল। পথটা যেখানে তে-মাথায় এসে পড়েছে, সেখানে এসে সে সহসা চীনা-ভাষায় কি বলে চীৎকার করে উঠলো। সরোজ চমকে উঠলো। তারপরেই রোমানফ্‌ আবার ইংরাজীতে চীৎকার করে উঠলো—কমরেড্‌রা এই দিকে, এই টর্চের আলোর দিকে এগিয়ে এসো।

তারপর সরোজকে উৎসাহ দিয়ে বল্‌লো—ভারতীয় বন্ধু, ছুটে চল, সবাই তোমাকে এখন অনুসরণ করছে, এতগুলি বন্দীর মুক্তির সম্ভাবনা এখন তোমারই চলার উপর নির্ভর করছে—তুমিই এখন এদের সকলের নেতা, গাইড্‌ !

তার অগ্রগতিকে লক্ষ্য রেখে আর সবাই এগুবে ! কথাটা ভাবতেই

সরোজের মনে একটা উদ্দীপনা জাগলো। ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝাপ্‌টা ঝির-ঝির করে বহে গেল তার মাথার উপর দিয়ে, যেন এক ঝলক্‌ অমৃতের স্পর্শ এসে লাগলো তার দেহে। এতক্ষণ যে পা দু'টী টনটন করছিল, সারা দেহে যে অতি পরিশ্রমের একটা অবসাদ ঘনিয়ে উঠেছিল, সরোজ সেটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো। সব ব্যথা বেদনা উপেক্ষা করে সরোজ চললো, দৃঢ়পদে অগ্রসর হোল, যেদিক থেকে বাতাসের ঝাপ্‌টা আসছে—সেই দিকে।

অগ্রসর হওয়া ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠছে, প্রতিপদে আঘাত লাগছে। একবার তো পা মচ্‌কে কাঁধের সঙ্গে এক প্রচণ্ড সংঘাত লাগলো পাশের দেয়ালে, তথাপি সরোজ থামলো না।

আবার আরেক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আর তারই সঙ্গে ভেসে এল বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌—কামানের শব্দ।

গোলা ফাটার ঝিলিক্‌ অন্ধকার সুড়ঙ্গে দীপ্তিময় হয়ে উঠলো।

বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌—আবার গোলা ফাটলো।

মাথার উপর একটা অবজারভেশন রকেট্‌ জ্বলে উঠলো।

সরোজ এবার স্পষ্ট দেখতে পেলে সামনেই সুঁড়িপথ ফুরিয়ে গেছে। মাটী-কাটা কলটার উপর মাটি জমে উঠেছে স্তূপাকার হয়ে। ওই ঢিবিটার উপর উঠতে পারলে উপরে ওঠা সহজ হবে। সরোজ অগ্রসর হোল।

মাটি-কাটা কলটার কাছাকাছি এসে পড়েছে এমন সময় পিছন থেকে জোরালো আলো এসে পড়লো। সরোজ পিছন পানে তাকালো, পিছনে তাদের দলের জন কয়েক এগিয়ে আসছে, তাদের পিছনে ক'জন জাপানী সেনার সঙীন ঝকমক করছে। রোমানফ্‌ সরোজের পিঠে মৃদু একটা চাপড় মেরে বললে—তাড়াতাড়ি চল বন্ধু, তাড়াতাড়ি! পিছন পানে তাকাবার আর সময় নেই।

সরোজ দ্রুত অগ্রসর হবার চেষ্টা করলো। পিছনের জোরালো আলোয় তার এগিয়ে চলার সুবিধা হোল, সামনের প্রতি ইটের টুকরোটী পর্যন্ত তার কাছে হয়ে উঠলো স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। পিছনে বন্দীরাও তার অনুসরণ করলো, যতটা দ্রুত বেগে সম্ভব।

একদল পরিশ্রান্ত।

আরেকদল পূর্ণোদ্যম।

শীঘ্রই পিছনে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। শট্‌ শট্‌ করে কয়েকটী গুলি চলে গেল সরোজের পাশ দিয়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই জাপানীরা সরোজদের ধরে ফেললো।

একজন জাপানী ঠাস্ করে সরোজের গালে এক চড় বসিয়ে দিলে। অনাহারে পরিশ্রান্ত দেহ, কোনমতেই নিজেকে সামলাতে পারলো না, মাথা ঘুরে সরোজ সেইখানেই পড়ে গেল। রোমানফ্‌ও মাটীতে আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠলো। জাপানী সৈনিকটী হিহি করে খানিক হেসে জুতোর ঠোক্কর মেরে তাকে খানিকটা গড়িয়ে দিলে। এবার কিন্তু রোমানফের মুখ থেকে আর কোন শব্দ বাহির হোল না, মুখখানি কঠিন হয়ে উঠলো, দাঁতে ঠোট টিপে সে চুপ করে পড়ে রইল।

জাপানীটী আহত রোমানফ্‌কে নিয়ে একটু মজা দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই মজা হোল না দেখে তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, বেয়োনেট্ দিয়ে রোমানফ্‌কে একেবারে মাটীর সঙ্গে গেঁথে ফেললে। রোমানফের যেন ইলেকট্রিকের শক্ লাগলো, সারা দেহ বারেক সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো, তারপর সাপের মত এঁকে-বেঁকে স্তব্ধ হয়ে গেল। দুফোঁটা উষ্ণ রক্ত ছিট্‌কে এসে পড়লো সরোজের মুখে। সরোজের চোখের পলক পড়া বন্ধ হয়ে গেল। জীবনে অনেক অত্যাচারের কথা সে শুনেছে, কিন্তু আহতকে এমনভাবে খুন করতে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে কোথাও সে দেখেনি।

সরোজের বিহ্বল মুখের পানে তাকিয়ে জাপানী সৈনিকটী একবার অট্টহাসি হেসে উঠলো।

আচম্বিতে পিস্তলের শব্দ শোনা গেল, যে জাপানীটী রোমানফ্‌কে সঙীনে বিঁধে উল্লাস করছিল, থরথর করে একবার কেঁপে উঠেই সে ধরাশায়ী হোল। পিস্তল হাতে একজন জাপানী অফিসার গট্ গট্ করে এগিয়ে এলো, সৈনিকেরা তাকে স্যালুট দিলে। তাদের পানে ভ্রূক্ষেপ না করে অফিসার সরোজের পানে তাকিয়ে ইংরাজীতে বললে—আপনারা ভারতীয়, না?

—হ্যাঁ।

—সাংবাদিক, না সৈনিক?

—সাংবাদিক।

—কেন, আপনারা চীনাদের হয়ে তো লড়াইও করেছেন বলে জানি, সত্যি কথা বলতে ভয় হচ্ছে?

সরোজ কোন উত্তর দিলে না।

অফিসার আবার জিজ্ঞাসা করলে—আপনারাই তো ট্যানেল্ উড়িয়ে দিয়েছেন?

—না, আমি নয়।

অফিসারের মুখে এবার হাসি ফুটে উঠলো, বললে—আবার 'না' কেন, সত্যি করেছেন তা 'হ্যাঁ' বলতে ভয় কি? আপনি একা করেছেন তা তো আমি বলিনি, আপনারা চারজন বন্ধু মিলে করেছেন। বেশ করেছেন! নিজেদের দেশের অসংখ্য জোয়ান ছেলের প্রাণের বদলে অন্য দেশে খানিকটা রাজ্য, কি সামান্য সুখ-সুবিধার স্বার্থ আমি বড় বলে মনে করি না। এই যে এত বড় একটা শান্তিপূর্ণ সহর অকারণে উপর থেকে বোমা ফেলে, নীচে থেকে কামান দেগে ধ্বংস করার কি যে প্রয়োজন তা তো আমি বুঝি না। সাংহাই নান্‌কিঙের মত সহর কত বছর ধরে মানুষের কত সাধনায় গড়ে উঠেছিল, আর কাজ কিনা সামান্য স্বার্থের জন্য তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে! দু'দল মানুষ পাশাপাশি শান্তিতে বাস করতে পারবে না! এই রাজ্যলিপ্সার আমি বিরোধী। খুনোখুনি আমরা চাই না! নরহত্যার দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা লড়বো, প্রয়োজন হ'লে বিদ্রোহ করবো। সবাই আমরা ভাই, সবাই আমরা পরস্পরকে ভালবাসবো, মানুষ সবাই সমান। —বুঝলেন!

সরোজের কাঁধে অফিসার একটা চাপড় মেরে আবার বললে—বুঝলেন?

তারপর পিস্তলটা সরোজের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—এই নিন পিস্তল, বরাবর চলে যান, সামনেই চাইনীজ লাইন।

তার হাত থেকে পিস্তলটা নেবে কি, সরোজ বিমূঢ় হয়ে পড়লো। লোকটা অভিনয় করছে কি সত্যি কথা বলছে বুঝতে পারলো না। অফিসার সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে মনের ভাবটা বোধ হয় বুঝতে পারলো, বললে—ভয় পাচ্ছেন? আসুন আমার সঙ্গে।

কলের পুতুলের মত সরোজ তাকে অনুসরণ করলো।

মাটির স্তূপ অতিক্রম করে তারা উপরে উঠে এল। মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত বাতাসের মাঝে নবজীবনের স্পর্শ এসে লাগলো।

বাতাসে কর্ডাইটের গন্ধ···গন্ধকের পীতাভ ধোঁয়া···চোখের সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে কামানের গোলা···বুম্‌ বুম্‌ করে বিস্ফোরণের শব্দ···বিদ্যুতের মত আলোর ঝল্‌কানি···এদিকে ওদিকে কয়েকটা মানুষের ছায়া···আশপাশে মুণ্ডহীন রাক্ষসের মত ভেঙে-পড়া বাড়ী।

সরোজ এক নজরে চারিপাশ দেখে নিলে, বুঝলে সহরের মাঝেই লড়াই চলছে। একবার তার মনে দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগলো, সামনের জাপানী অফিসারটাকে এক

ঘুসিতে মাটিতে ফেলে দিয়ে পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে ছুটে চলে যায় সামনের ওই আলোছায়ায় হট্টগোলের মাঝে। কিন্তু তখনই মনে পড়লো ফাতু, ডেভিড ও আয়েষার কথা. নিজে তো সে মুক্তি পেলে, কিন্তু তারা? সরোজ পিছনে তাকালো: কয়েকজন চীনা আর তাদের অনুসরণ করে জাপ রক্ষীরা এগিয়ে আসছে। একবার চেষ্টা করলো চীনা বন্দীদের মুখগুলি দেখবার জন্য, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারলো না।

সহসা স্তব্ধতাকে চম্‌কে দিয়ে অফিসারের গলা শোনা গেল—তোমরা এখনও আসছ কেন? যাও।

বন্দীদের হাত ধরে রক্ষীরা ফিরলো।

অফিসার আদেশ করলে—বন্দীদের রেখে যাও।

সৈন্যরা ত্রস্তে ফিরে গেল, সেই ভেঙে-পড়া সুঁড়িপথের অন্ধকারে!

বন্দীরা কাছে এল। অফিসার বললে—সামনে ওই যে গোলন্দাজ শ্রেণী দেখছ, ওইটাই চীনাদের লাইন, তোমরা ওই দিকেই এগোও।

লোকটার কথা সরোজ আর উপহাস বলে উড়িয়ে দিতে পারে না, কিন্তু একা যেতেও তার পা ওঠে না, পিছু ফিরে ডাকলো,—ডেভিড···আয়েষা···ফাতু···

একটা ছায়া ভীড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল। তার কাঁধের উপর আরেক-জনের দেহ। সরোজ টর্চের আলো ফেললো তার মুখের উপর—সে ডেভিড। সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—কাঁধের উপর ও কে?

—আয়েষা। চোট লেগেছে, অজ্ঞান···

সরোজ জিজ্ঞাসা করলে—ফাতু?

—জানি না তো।

সরোজ আরেকবার ডাকলো—কমরেড্ ফাতু—

বন্দীদের মধ্যে থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না!

অফিসার বললে—তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও।

সরোজ পিছনের চীনাদের মুখের উপর টর্চের আলো ফেললো, প্রতি মুখটি দেখে নিলে—তাদের মধ্যে ফাতু নেই।

অফিসার সরোজকে জিজ্ঞাসা করলে—কি চাও? কি দেখছ?

—কমরেড্ ফাতুকে পাচ্ছি না—আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু।

—সে হয়তো মাটী চাপা পড়ে মরে গেছে।

—তা হোক, তবু আমি একবার খুঁজে দেখবো!

—তাহলে তোমরা যাবে না ?—অফিসার গর্জন করে উঠলো।

—না না, আমরা সবাই নয়, শুধু আমি একা! এরা সবাই যাক, আমি শুধু আমার বন্ধুকে একবার খুঁজে দেখবো ক্যাপ্‌টেন, যদি তাকে পাই—

—অর্থাৎ তুমি আবার ফিরে গিয়ে সব খুঁজবে ?

সরোজ মাথা নাড়লো।

—তার মানে মৃত্যু, তা জানো? এবার আমার সেনারা তোমাকে সহজে ছাড়বে না, দেখবে আর গুলি করে মারবে।

—তা হোক তবু আমি যাব।

সহসা অফিসার এগিয়ে এসে সরোজের কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে হেসে উঠলো, বললে—সাবাস বন্ধু, তোমার সাহসের প্রশংসা করি! কে বলে ভারতীয়েরা ভীরু!

সরোজ চমকে উঠলো, অফিসারের মুখের পানে তাকালো, লোকটার কি মতলব বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলো।

অফিসার বললে—আমিই ফাতু, কমরেড্‌!

—তুমি তুমি ফাতু ?

ফাতু মৃদু হেসে মাথাটা একবার দুলিয়ে বললে—আগে আমার ওই নামই ছিল, এখন আমি একজন জাপানী অফিসার লেফ্‌টেন্যাণ্ট আহাইরো। অফিসারকে মাটি চাপা দিয়েছি, তার পোষাকে আমিই এখন অফিসার। যাক, তোমরা আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, এগোও।

—আর তুমি ?

—আমি? হা হাঃ! আমি রইলাম; জাপানী বন্ধুদের শেষ না করে আমি আর ফিরছি না। একবার বোঝা-পাড়া করে দেখবো, চীনার সাহস বেশী, না জাপের! যদি বাঁচি, পরে একদিন দেখা হবে—বিদায়, au-revoir!

উত্তরের অপেক্ষা না করে ফাতু ওরফে লেফ্‌টেন্যাণ্ট আহাইরো গট্‌ গট্‌ করে ফিরে গেল ভেঙে-পড়া সুঁড়িপথের অন্ধকারের মাঝে।

ডেভিড বললে—চল!

ইতিমধ্যে পিছনে সুঁড়িপথটা গুম্‌ গুম্‌ করে উঠলো, এক লহমায় সুঁড়িপথের যেটুকু তখনও বাকী ছিল তা'ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত ভুস্‌ করে আকাশের পানে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, পায়ের নীচের মাটি কেঁপে উঠলো।

সরোজরা তাল রাখতে না পেরে পড়ে গেল। চীনা-গোলন্দাজ বাহিনীরা খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল, তাদেরও কলের কামান গর্জে উঠলো।

ডেভিড বললে—আর এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই।

—চল—সরোজ বললে।

মাথা তুলে দাঁড়াবার উপায় নেই; হামা দিয়ে সকলে অগ্রসর হোল।

হাতে-পায়ে চলতে চলতে সরোজ বললে—অদ্ভূত মানুষ এই ফাতু; এদের হারিয়ে এদেশ জয় করা জাপানীদের পক্ষে মোটেই সহজ হবে না।

ডেভিড সে কথার কোন জবাব দিলে না, দিলে সরোজ শুনতে পেত না,—চারিপাশে এমন কামানের গোলা ফাটছিল। শুধু আলোর ঝিলিক আর কান-ফাটানো মাটি-কাঁপানো শব্দ। আগুনের তীরের মত কামানের গোলা ছুটে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে। শুঁয়োপোকার সারির মত হাতে পায়ে হেঁটে চলেছে সরোজরা, ইংরাজীতে যাকে বলে **no man's land**য়ের মধ্যে দিয়ে।

ক্রমশঃ তারা গর্জমান কামানশ্রেণীর কাছে এসে পড়লো। সামনের বালির বস্তার আড়ালে কামান ও গোলন্দাজের ছায়া দেখা গেল। আর শ'-দু'-তিন গজ গেলেই ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছানো যায়। ইতিমধ্যে কোথা থেকে একটা গোলা এসে ফাটলো একেবারে অত্যন্ত কাছে। সরোজরা চমকে উঠলো। সাম্‌নের জনকয়েক চীনাকে একটা কামানের রেঞ্জ ঠিক করতে দেখা গেল। তারা যেন তাদেরই লক্ষ্য বলে মনে হোল। সরোজ বিচলিত হয়ে পড়লো, সামনেই ছিল বোমা ফাটার এক প্রকাণ্ড গর্ত, তাড়াতাড়ি ডেভিডের হাত ধরে সরোজ টানলো সেই দিকে, উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠলো—নেবে এসো—কুইক্ কুইক্—

সরোজের পিছনে চীনারা লাফিয়ে পড়লো গর্তের মধ্যে। এক হাঁটু জল-কাদা জমে আছে সেখানে। প্রাণ বাঁচাতে হলে তারই মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

ইতিমধ্যে সামনের কামান গর্জে উঠলো। গুম্ গুম্ করে দুটী গোলা ছিট্‌কে এসে পড়লো গর্তটার পাড়ের উপর, সরোজ চীৎকার করে উঠলো—লাই ডাউন্, লাই ডাউন্।—শুয়ে পড়ো!

সকলে সেই কাদার মাঝেই মুখগুঁজে শুয়ে পড়লো। কামানের গোলার টুকরোগুলো ছিট্‌কে এসে পড়লো তাদের চারিপাশে। একজনের আর্তনাদও বোধ হয় শোনা গেল। সরোজ একবার মুখ তুলেছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একটী

গোলা এসে ফাটলো গর্তের কিনারায়, সরোজ আর কিছু দেখবার অবসর পেল না। তাড়াতাড়ি মাথা নাবালো।

সেই জল-কাদায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকা যে কি কষ্টকর ব্যাপার, তা যার জানা নেই তাকে ব'লে বোঝান যাবে না। সারা দেহ কাদায় মাখামাখি, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার কথা তখন আর মনে থাকে না, জীবনের সব কিছু হারিয়ে গেছে কানের পাশে শুধু গোলা ফাটার শব্দ ছাড়া। মৃত্যুকে তারা অনুভব করছে প্রতি বিস্ফোরণে, মাটির প্রতিটী কাঁপন সেই কাদার মাঝেও তারা অনুভব করতে পারছে। মৃত্যু তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, প্রতিটী মুহূর্ত বিচার করার মত বুদ্ধি আর নেই, বিবেচনা করার মত মনও লুপ্ত হয়ে গেছে। বিশ্বাসী হৃদয় কিন্তু তথাপি ধ্বক্ ধ্বক্ করছে, মৃত্যুর আক্রমণকে প্রতিবাদ জানাচ্ছে অবিরাম।

বুম্ বুম্ বুম্—লহমার পর লহমা কাটছে! বীভৎস মৃত্যুর ভয়াবহ পরিচয় পাবার প্রতীক্ষায় সবাই স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে।

সহসা অতি কাছে একটী গোলা ফাটলো, তারই একটী টুকরো ছিট্‌কে এসে লাগলো সরোজের এক হাতে। সরোজ চমকে উঠলো, আরেক হাত দিয়ে সে-হাতটী একবার মুছে নিল; ঝর ঝর করে রক্ত ঝরে হাতখানি ভিজে গেল। হাতখানির পানে তাকিয়ে সরোজ ভয় পেয়ে গেল, আর্তস্বরে বলে উঠলো—খুন খুন, রক্ত।

তারপর কি হোল কে জানে, সরোজ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, উঠে এল গর্তের বাহিরে। সরোজের আর্তনাদ শুনে ডেভিড মুখ তুলে তাকিয়েই ব্যাকুল হয়ে উঠলো, চীৎকার করে ডাকলো—সরোজ—সরোজ—!

সরোজের সে দিকে তখন খেয়াল নেই, গর্তের কিনারায় উঠে এসে দুহাত মাথার উপর তুলে সে উত্তেজিত স্বরে চীৎকার করে উঠলো—ষ্টপ্ ফায়ারিং! ষ্টপ্ ফায়ারিং!—গুলি ছুঁড়ো না!

একটা কামানের গোলা মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, আহত হাতখানি ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো, সরোজ চীৎকার করে উঠলো—কমরেডস্ তোমরা গুলি ছুঁড়ো না, গুলি থামাও!

সামনের সৈন্যেরা বোধ হয় এবার সরোজকে দেখতে পেলে, পরমুহূর্তেই এসে পড়লো গুটিকয়েক হাত-বোমা।

একটি বোমা সামনেই ফাটলো, সরোজের গায়ে এসে কি যেন লাগলো, সে তাল সামলাতে পারলো না, টলে পড়ে গেল। একটা উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করলো, জলের

মত কি গড়িয়ে এল মুখের উপর, জিব দিয়ে স্বাদ নিয়ে সরোজ দেখলে—লোণা, বুঝলে রক্ত। সরোজের ইচ্ছা হোল কপালে একবার হাত বুলিয়ে দেখে, কিন্তু মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো, সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল, কানের মধ্যে কেমন যেন ভোঁ ভোঁ করে উঠলো, চোখের দৃষ্টি হয়ে এল ঝাপ্‌সা। সরোজ আর মাথা তুলতে পারলে না, সেইখানেই লুটিয়ে পড়লো।

ইতিমধ্যে সাম্‌নের 'ব্যারিকেডের' আড়ালে গুলিগোলার শব্দকে ছাপিয়ে শোনা গেল হুইশিলের তীব্রতা।

গোলাবর্ষণ থামলো। কয়েকটী জোরালো টর্চের আলো এসে পড়লো সরোজদের দলটীর উপর। পিঠের উপর থেকে আয়েষাকে নাবিয়ে দিয়ে ডেভিড সোজা হয়ে দাঁড়ালো, মাথার উপর ডান হাত তুলে চীৎকার করে উঠলো—হেল্‌প্, হেল্‌প্—সাহায্য চাই, সাহায্য…

চীনারা তাদের সাড়া পেয়েছিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল জনকয়েক চীনা স্কাউট ব্যারিকেডের বালির বস্তা পার হয়ে হামা দিয়ে এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে ডেভিডকে তারা কি সব জিজ্ঞাসা করলো, ডেভিড তার এক বর্ণও বুঝলো না। তবে সঙ্গে যে সব চীনারা ছিল, তারাই তার জবাব দিলে। ইতিমধ্যে জাপানীরা বোধ হয় দূর থেকে তাদের গতি-বিধি লক্ষ্য করেছিল, পিছন থেকে তাদের কামান গর্জে উঠলো। আর বৃথা সময় নষ্ট না করে, সরোজ ও আয়েষাকে তুলে নিয়ে স্কাউটরা নিজেদের ট্রেঞ্চের দিকে অগ্রসর হোল। ডেভিড সদলে তাদের অনুসরণ করলো।

ডেভিডের বিশেষ কিছুই হয়নি।

সরোজের সুস্থ হতে দিন পনেরো লাগলো।

আয়েষার কিন্তু সেরে ওঠার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তার মাথায় চোট লেগেছিল, ব্রেণ-ফিভারে ক'দিনের মধ্যেই সে মুমূর্ষু হয়ে পড়লো। জ্বর কমতে চায় না, তার সঙ্গে প্রলাপের চীৎকার—গুলি ছুঁড়ো না, কেন আমায় মারবে, আমি তো কিছুই করিনি…ইত্যাদি

সরোজ তখনও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না, তার পায়ে অপারেশন হয়েছে। ডেভিডের মুখে সে শোনে আয়েষার অবস্থা।

ইতিমধ্যে একদিন কমরেড্ চুটে হাসপাতালে এলেন। সরোজ ও ডেভিডের করমর্দন করে বললেন—আপনারা যা করছেন সেজন্য আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ!

—আমরা তো বিশেষ কিছুই করিনি কমরেড্‌, যারা করছে তারা আপনারই দেশের লোক। আমরা শুধু দর্শক মাত্র!

—কিন্তু সেই দেখা মানেই তো মরণের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো—

—কিন্তু যারা সত্যই মরণের কোলে ঢলে পড়লো—

—তাদেরও জানি, তাদের শ্রদ্ধা করি। তবে সে শ্রদ্ধা তাদের কাছে পৌঁছে দেবার মত কোন পোষ্ট-আফিস্‌ তো নেই!

সরোজ বললে—বারবার আমার শুধু রোমানফের কথাটাই মনে পড়ে, চোখ বুঁজলেই তার মৃত্যু-দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

—সব শুনেছি আপনার বন্ধুর মুখে—চুটে বললে—এই যুদ্ধে আমরা অমন কত বিশ্বস্ত কমরেড্‌কে হারালেম তার হিসাব রাখার সময় আজও আসে নি। যুদ্ধে যেদিন জিতবো, দেশ যখন শত্রুমুক্ত হবে তখন তার হিসাব করবো!

—তোমরা এখনও হারছো কমরেড্‌?

—হারছি বটে, তবে জাপানীদের যে ক্ষতি আমরা করছি তা সহজে পূরণ হবে না; ইয়াংসি নদীর বাঁধ ভেঙে হাজার হাজার জাপসৈন্যকে আমরা ভাসিয়ে দিয়েছি। আমাদের পিছনে আসতে আসতে বিরাট প্রান্তরের বুকে জাপানী সেনাদল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে, আমাদের গেরিলাবাহিনী সুযোগ পাচ্ছে তাদের নিঃশেষ করে দেবার। ওদিকে জাপানীদের দেশেও আর টাকা নেই। যুদ্ধের খরচ যোগানোর জন্য নিত্য নতুন কর বসানোর ফলে গবর্মেণ্টের উপর দেশের লোক বিরূপ হয়ে উঠছে; যারা এদেশে লড়াই করতে এসেছিল তাদের অনেকেই নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে বলে নতুন সৈন্যও আর পাওয়া যাচ্ছে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে দু'বছর হোক আর দশবছরই হোক, একদিন জাপানীদের পরাজয় মানতেই হবে।

সরোজ চুটের একখানি হাত চেপে ধরে বললে—তোমরা জয়যুক্ত হও বন্ধু, আমরা এই কামনাই করি। তোমাদের জয় হোক!

—ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!!

—তোমরা প্লেন তৈরী করছ বলে শুনলেম, এবার কিন্তু আমরা তোকিও বোম্বার্ড করতে বেরুবো, ভাল প্লেন চাই!

—প্লেন তো তৈরী হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের এখন লড়াই করা চলবে না।

—কারণ?

—ডাক্তার বলেছে আপনাদের এখন কিছুদিন বিশ্রাম করা দরকার। তাছাড়া

আপনাদের বোন সেরে উঠলে তাকে ভাল করে সুস্থ করার জন্য আপনাদের ভারতে ফিরে যেতে হবে।

—ফিরে যেতে হবে?

—হ্যাঁ। ভারতে ফিরে গিয়ে কিছুদিনের জন্য একটা স্বাস্থ্যকর জায়গায় থেকে শরীরটাকে তাজা করে নিয়ে আবার যদি মন চায়, 'ফিরে আসবেন। আপনাদের মত সহকর্মী পাওয়া আমরা সৌভাগ্য বলে মনে করি।

—আর আমাদের প্রতিশোধ?—ডেভিড বললে।

—সেজন্য আমরা রইলাম,—চুটে বলে—খুনের বদলে খুন করলেই যথার্থ প্রতিশোধ নেওয়া হয় না। অন্য উপায়ও আছে। জাপানীদের যে সব অত্যাচার আপনি দেখলেন, তা' সংবাদপত্রের মধ্যে দিয়ে ভারতবাসীকে জানাবেন, তাদের মধ্যে এমন মনোভাব গড়ে' তুলবেন, যেন তারা প্রোপাগাণ্ডায় ভুলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে কোনদিন না সমর্থন করে, তাহলেই নীতির দিক থেকে জাপদের পরাজয় ঘটবে।

—ঠিক কথা!—সরোজের চোখ দুটী জল-জল করে উঠলো, উদ্দীপনায় সে শয্যার উপর উঠে বসলো, বললে—ঠিক কথা, আমি তাই করবো!

কমরেড্ চুটে মৃদু হেসে সরোজের দুখানি হাত নিজের দু হাতের মাঝে চেপে ধরলো।

চার পাঁচ দিনের মধ্যে আয়েষার অবস্থা চরমে গিয়ে পৌছালো। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিলেন। ডেভিড সারাক্ষণই কাছে-কাছে থাকে। সরোজ চলতে পারে না, একখানি অক্ষম-আসনে (ইন্‌ভ্যালিড্-চেয়ার) করে সুবিধামত প্রায়ই যায় আয়েষার পাশে। মাঝে মাঝে আয়েষা চোখ চায়ঃ বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে থাকে দুজনের মুখপানে, চিনতে পারে না, তারপর আবার চোখ বোঁজে। প্রতিটী মুহূর্ত থম্ থম্ করতে থাকে, মুহূর্তের পেছনে কাটে ঘণ্টা, ঘণ্টার পিছনে দিন এগিয়ে চলে। সবাই প্রতীক্ষা করতে থাকে—কখন-কি-হয় ভাব।

কোন একসময় চোখ মেলে আয়েষা যেন সরোজ ও ডেভিডকে চিনতে পারে, ক্লান্ত কণ্ঠে ডাকে—সরোজদা·· ডেভিডদা···

—কি দিদি?

—যুদ্ধ এখনও চলছে?

—সে এখান থেকে অনেক দূরে ··

—ওরা তাহলে এখনও মানুষ খুন করা চালাচ্ছে!…তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—যুদ্ধ কবে থামবে বল্‌তে পার ?

সরোজ চুপ করে রইল, ডেভিড বললে—তার এখনও দেরী আছে।

—এখন তাহলে এই লড়াই চলবে,…এই গুলি গোলা…উঃ—কথা বলতে বলতে সহসা অব্যক্ত যাতনায় আয়েষা ঠোঁট দুখানি বিকৃত করে তুললো।

সরোজ ও ডেভিড ব্যাকুল ভাবে ঝুঁকে পড়লো তার উপর, বললে—খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি ? ডাক্তারকে একবার ডাকবো ?

আয়েষা ততক্ষণে কতকটা সামলে নিয়েছে ; ঠোঁটের গোড়ায় জোর করে একটু হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বললে,—আমি আর বাঁচবো না সরোজদা, বুকটার মধ্যে কেমন যেন হচ্ছে, একটু আগেই দেখলাম বাবা আর মা এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে…

আয়েষা হাঁপাতে লাগলো। সরোজ ও ডেভিড ব্যস্ত হয়ে পড়লো, বললে—তুমি আর এখন কথা বল না আয়েষা—

হাত নেড়ে তাদের ব্যস্ত হতে বারণ করে আয়েষা আরও খানিকক্ষণ টেনে টেনে শ্বাস নিলে, তারপর অতি মৃদু স্বরে অতি ধীরে বললে,—এখন কথা না বললে সেকথা আর কোনদিনই বলা হবে না।

—কি যে বল,…সরোজ বাধা দিয়ে বললে।

জোর করে ঠোঁটের উপর একটু হাসি টেনে এনে আয়েষা বললে—আজ খালি মনে পড়ছে বাংলাদেশের কথা। গঙ্গার ধারে আমাদের সেই বাগান, পাশেই সেই শিকড়-বের-করা বুড়ো বটগাছটা, পিছনে ধানের ক্ষেত আর সবুজ মাঠ, ফটকের দু'পাশে গোলাপ, রজনীগন্ধা, আর হাস্নুহানার ঝাড়, সেখানে একবার ফিরে যেতে আজ বড় ইচ্ছা করছে।

দম নেবার জন্য আয়েষা থামে, বিষাদমাখা উদাস দৃষ্টিতে সামনের জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ দূরের পাহাড়গুলোর পানে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে—পাহাড় আর পাহাড়, আর ভাল লাগে না, কঠিন পাষাণ আমার বুকের উপর চেপে ধরছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—

আয়েষা বুকের উপর হাত বুলায়, শ্বাস টানে।

সরোজ বললে—কথা বল না আয়েষা, কষ্ট হচ্ছে—

আয়েষা আবার হাসতে চেষ্টা করলো, বিবর্ণ ঠোঁট দুখানি আবার যাতনায়

বেঁকে উঠলো, বললে—সেই গানটা আজ গাইতে ভারী ইচ্ছা হচ্ছে, সেই গানটা আমায় শোনাবে ?—সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং ··

সরোজ মৃদু কণ্ঠে সুর ধরলো—

বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম,
সুখদাং বরদাং মাতরম্
বন্দেমাতরম্।

শ্বাস টানতে টানতে আয়েষা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো - আমি সেখানে ফিরে যাব—আমি বাঁচবো—আমি বাঁচতে চাই...উঃ ··

দুহাতে প্রাণপণে আয়েষা বুকখানা চেপে ধরলো, অসহনীয় যাতনায় ক্ষণেক শিউরে উঠেই সব স্থির হয়ে গেল।

সরোজ ও ডেভিড মুহ্যমান অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

বুম্ বুম্ করে ঠিক সেই সময় কাছাকাছি কোথায় কয়েকটা বিস্ফোরণের শব্দ হোল—সম্মানের তূর্যধ্বনির মত।

—শেষ—



প্রলয়ের পথিক

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—বুম্ বুম্ বুম্—

—শোঁ—ও—ও—

—কর্ কর্ কর্ কর্—বুম্ম্—

মধ্যরাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে কয়েকটী বোমা ফেটে পড়লো, মাথার উপর শোনা গেল বোম্বার প্লেনের প্রপেলারের গর্জন।

বিস্ফোরণের ঝিলিকে চোখ ঝল্‌সে গেল, চারিপাশে আর্তনাদ উঠলো, চলন্ত ট্রেনখানি চম্‌কে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। আবার কয়েকটী বোমা ফাটলো—বুম্ বুম্ বুম্—

ভীত ত্রস্ত যাত্রীর দল এবার ট্রেন থেকে নেবে পড়লো। তাদের চেঁচামেচি ছুটোছুটি সেই অন্ধকারের বুকে এক ভয়াবহ উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। অন্ধকারে কে কোন্‌দিকে যায়, প্রাণ বাঁচাবার জন্য হুড়োহুড়ি, হট্টগোল।

বুম্ বুম্ বুম্—আরো কয়েকটী বোমা পড়লো।

ট্রেনের দুখানি বগীতে আগুন ধরে গেল। সেই আলোয় প্রান্তরের অনেকখানি আলোময় করে তুল্‌লো। জাপানী বোমারুদের সুবিধা হয়ে গেল, আরো

নীচে নেবে এসে তারা এবার জনতার উপর মেশিনগান চালাতে সুরু করলো—কট্‌কট্ কট্‌কট্ কট্‌কট্—

চীনা নরনারীর মধ্যে এবার উত্তেজনা দেখা গেল, চীৎকার উঠলো—কিউৎজু—কিউৎজু, শয়তান—শয়তান !

কয়েকজন চীনা সৈনিক সেই ট্রেনে আসছিল, হাঁটুর উপর বন্দুক রেখে তারা গুলি চালাতে সুরু করলো।

অতগুলি বোম্বারকে কয়েকটা বন্দুক আর কতটুকু প্রতিরোধ করতে পারে ! প্লেনগুলি চিলের ছোঁ-মারার ভঙ্গীতে এক একবার নীচে নেবে আসছে আর অজস্র মেশিনগানের গুলি এসে পড়ছে জনতার মাঝে।

নিশীথ-নিদ্রিত প্রান্তর হত্যার আঘাতে কয়েক মিনিটে বীভৎস ভয়াল হয়ে উঠলো।

ইতিমধ্যে বহ্নিমান কামরাটীর উপর আরো গোটা দুই বোমা বিস্ফোরণের শব্দ হোল, কামরাখানির চারিপাশ ঘিরে আগুনের শিখা উঠলো, তখনও কামরাটীর সব লোক বাহির হতে পারেনি। দরজার সামনে আগুন ধরে যাওয়ার ফলে জীবন্ত পুড়ে মরার ভয়ে ভিতরে আর্তনাদ উঠলো। পাশের কামরায় দুটী লোক তখনও ট্রেনের দরজা ধরে বাহিরের জনতার ইতস্ততঃ ছুটাছুটি দেখছিল। বহ্নিমান কামরাটির দিকে সাহায্য করার জন্য কেউ আর এগিয়ে আসে না দেখে, দুজনে নেবে পড়লো। কামরাটির একদিকে তখনও আগুন ধরেনি, একটী জানালার সামনে এসে একজন অপরজনকে বললে—আমার একটু ধরতো কমরেড্—

দ্বিতীয় যুবকটী দুহাত একত্র সংযুক্ত করে ধরলো, প্রথম যুবকটী সেই হাতের উপর পা রেখে জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো।

ভিতরে তখন আগুন জ্বলছে সত্য, কিন্তু ধোঁয়াও বড় কম হয়নি, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তার উপর অগ্রসর হবার উপায় নেই মোটেই ; খানিক ভেঙেছে, খানিকটা দুমড়ে পড়েছে, খানিকটা-হেলে আছে—এখনি মাথার উপর ভেঙে পড়বে যেন। তারমধ্যে কোথায় যে কে আহত হয়ে পড়ে আছে, কার নীচে কে চাপা পড়েছে, তার উদ্দেশ করা বড় সহজ কথা নয়, উদ্ধার করা তো আরো কষ্টসাধ্য। তথাপি তারই মধ্যে যুবক তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চারিপাশে যতটা সম্ভব দেখে নেবার চেষ্টা করলো। আর্তনাদ গুম্‌রে গুম্‌রে উঠছে, ঠিক কোনখান থেকে বোঝা যায় না। সহসা দুমড়ে-পড়া একটা কাঠের পার্টিসান্ মচ্ মচ্ করে ভেঙে পড়লো ; আর্তনাদ আরো জোরে উঠলো—বাঁচাও—বাঁচাও—

যুবকটী এবার বুঝতে পারলে স্বরটা কোথা থেকে আসছে, দু'পা সরে গিয়ে মাথাটা নাবিয়ে খানিকক্ষণ কি যেন শোনার চেষ্টা করলো তারপর টানাটানি করে একখানি তক্তাকে খানিকটা উঁচু করে নীচে উঁকি মেরে দেখলো সত্যই একখানি হাত দেখা যাচ্ছে। আর এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ না করে যুবক তক্তার নীচে ঢুকে পড়লো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই হাতের মালিককে কাঁধে ফেলে সে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো, ডাকলো—ডেভিড, ধরো—!

বাহিরের প্রতীক্ষমান যুবকটী হাত বাড়িয়ে লোকটীকে নাবিয়ে নিলে, প্রথম যুবকটী জানালা টপ্‌কে বাহিরে নেবে পড়লো।

একটু তফাতে এসে যুবক দুটী আহত লোকটীকে শুইয়ে দিলে। লোকটী থর থর করে তখন কাঁপছে, মুখ দিয়ে কথা সরছে না, এমন হাঁপাচ্ছে যেন বুকের মাঝে কোথাও টান পড়েছে, দু'বার কথা বলার চেষ্টা করেও পারলো না।

একজন তার মুখে জলের ফ্ল্যাস্ক ধরলো, খানিকটা জল পান করে ভদ্রলোক যেন একটু সুস্থ হোল তারপর উদ্ধারকারী দুজনের মুখের পানে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ইংরাজীতে বললো—ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন—

একখানি প্লেন মাথার উপর অত্যন্ত নীচু হয়ে চলে যায়, শ'খানেক গজ দূরে ছোট একটী জনতার উপর টুপ্ টুপ্ করে দুটী বোমা ফেলে। বোমার বিস্ফোরণে, জনতার আর্তনাদে, ভদ্রলোক মাথা তুলে একবার সেদিকে তাকাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না, আকাশের পানে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বলে—ওরা এখনি আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

—না না, আপনার ভয় নেই, আমরা অনেকটা তফাতে আছি।

ভদ্রলোক সে কথা শুনতে পেল কি না কে জানে, আপন মনেই বলে চললো—আমাদেরকে ওরা বাঁচতে দেবে না, আমাদের কতজনকেই ওরা হত্যা করলে! কেন? ওদের কাছে আমরা কি অপরাধ করেছি?

ভদ্রলোক যুবক দু'জনের দুখানি হাত চেপে ধরলো, উত্তেজনায় তার চোখ দুটি সহসা জলজ্বল করে উঠলো, বললে—তোমরা পারবে বাঁচাতে—জাপানীদের এই গুণ্ডামির হাত থেকে এদেশকে রক্ষা করতে? লক্ষ লক্ষ লোককে আনন্দের সন্ধান দিতে,—স্বস্তি দিতে?

উত্তেজনায় বেশী কথা বলে ভদ্রলোক হাঁপিয়ে উঠলো, জোরে জোরে কয়েকটি নিঃশ্বাস ফেলে, ক'মিনিট চুপ করে থেকে সে এবার ধীরে ধীরে বললো—আমি

উত্তেজিত হয়ে পড়েছি সেজন্য আমি লজ্জিত, কিন্তু আমার দোষ কি, নান্‌কিঙে ওরা আমার দু'ভাইকে হত্যা করেছে, আমার মা'কে আর বোনকে খুঁজে পাচ্ছিনা, আমি শুধু পালিয়ে বেঁচেছি, আমাদের সর্বস্ব ওরা লুট করেছে, আমি আজ পথের ভিখারী। আমরা ওদের কাছে কি এমন অপরাধ করেছি—তোমরাই বল ?

যুবক দু'জন চুপ করে রইল।

ভদ্রলোক ক্ষণেক চুপ করে থেকে বললে—তোমরা ইংরাজ ?

—না, ভারতীয়।

—ভারতীয় ! খবরের কাগজের রিপোর্টার ?

—না, এমনি লড়াই দেখতে এসেছিলেম এদেশে।

—ভারতীয় কংগ্রেস তোমাদের পাঠিয়েছে বুঝি ?

—না, আমরা নিজেরাই এসেছি।

তোমাদের সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ, তোমাদের ঋণ আমরা কোনদিনই শোধ করতে পারবো না। তোমাদের এম্বুলেন্স এখানে কাজ করছে, তোমাদের পণ্ডিত জহরলাল এসে আমাদের দুর্দশা সেদিন দেখে গেছেন।

জলন্ত কামরাটির মধ্যে কি ছিল কে জানে, সহসা কামরাটী চৌচির হয়ে ফেটে পড়লো চারিপাশে। আহত চীনাটী সেদিকে তাকিয়ে গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—ওই আগুনের মধ্যে থেকে তোমরা আমায় বাঁচিয়েছ, নিজের জীবন বিপন্ন করেও তোমরা আমার জীবন রক্ষা করেছ, ধন্য তোমরা—খক্ খক্ করে চীনা ভদ্রলোক দুবার কেশে উঠলো, মুখ দিয়ে খানিকটা রক্ত উঠলো।

ভারতীয় দুজন এবার ব্যস্ত হয়ে পড়লো, একজন বললে—আপনি আর কথা বলবেন না।

চীনা ভদ্রলোক এবার হেসে উঠলো, বললে—ওই রক্ত কি আজ উঠছে, ও আজ একবছর হোল, টিবি—থাইসিস্।...গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই করেছি, এখানে সেখানে পালিয়ে বেড়িয়েছি, পরিশ্রম হয়েছে বেশী, খেতে পাইনি। আজ তার সুদ সুদ্ধ দেনা শোধ্‌বার সময় এসেছে—

একজন যুবক বললো—এমন শরীর নিয়ে লড়াই করা আপনার অন্যায় হয়েছে।

—ঠিক করেছি। চুপ করে নিশ্চিন্তমনে গুলি খেয়ে মরার চেয়ে, দু'দশজন শত্রুকে মেরে মরা কি ভাল নয় ? তাতে আরো দশজনের জীবন বাঁচবে, দেশের উপকার হবে !

—কিন্তু এই শরীরে……

—কিছু না, নিজের জীবনই তো সব নয়, আর পাঁচজনকে নিয়েই জীবন, তাদেরকে সুখী করার তো একটা দায়িত্ব আছে…খক্ খক্ খক্—ভদ্রলোক আবার কেশে উঠলো। এ-কাশি যেন আর থামতে চায় না। এবার রক্ত উঠলো আগের চেয়ে অনেক বেশী।

বুকে দুবার হাত বুলিয়ে ভদ্রলোক বললে—আমি বুঝতে পারছি আমার ডাক পড়েছে—

—কি যে বলেন……

মৃদু হেসে ভদ্রলোক বললে—শুধু বুকটাই নয়, দুটো হাঁটু একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে।

হাঁটুতে হাত বুলিয়ে দেখা যায়, সত্যি দুটী হাঁটু একেবারে তল্‌তল্ করছে।

মাথার উপর তখনও প্লেন গর্জন করছে, তবে এবার শুধু জাপানী প্লেনই নয়, চীনা প্লেনও আছে তাদের পিছনে। অন্ধকার আকাশে প্লেনগুলি চেনা যায় না, শুধু দেখা যায় লাল নীল আলোর ছুটোছুটি।

ভদ্রলোক এবার জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা গেরিলা সেনার নায়ক, কমরেড্ ফাতুকে জান?

—নিশ্চয়, তার সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় আছে।

—তাহলে এক উপকার কর, আমার কোটটী খুলে ফেল—

কোটটা খুলে নেওয়া হোল।

—ভিতরদিকে ওই যে অস্তরের মাঝে যে সেলাইটা দেওয়া আছে, ওইটা কেটে ফেল; একখানা চিঠি আছে—

সেলাই কেটে চিঠিখানি বাহির করা হোল।

—ওই চিঠিখানি যেমন কোরেই হোক ফাতুর হাতে পৌঁছে দেবে আর বলবে —কমরেড্ ফুসান্ মারা গেছে—

—আপনি মরবেন কেন, এখনি আমরা আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি—

—হাসপাতালে আর কি করবে? দুটো হাঁটু একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে, তার উপর থাইসিস্। পঙ্গু হয়ে বেঁচে থেকে দেশের বুকে একটা বোঝা বাড়ানো হবে শুধু, তার চেয়ে মৃত্যুই ভাল। মরার জন্য আমি প্রস্তুত,—অনেক আগেই মরতাম, কিন্তু শুধু ওই চিঠিখানির জন্য। ওটা আমার চিঠি নয়, ওটা গেরিলা

সৈন্যের একখানি জরুরী চিঠি—আপনারা চিঠিখানি ঠিক পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন—

—সেজন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।

—আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ, বিদায় কমরেড্, এ-যাতনা আর সইতে পারছি না—চাং-হ্বা-মিন্-কুও—বলে কমরেড্ ফুসান পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বাহির করে কি একটা গলায় ঢেলে দিলে।

একজন যুবক তাড়াতাড়ি বাধা দিতে গেল, বলে উঠলো—বিষ ?···

ফুসানের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো, সারা দেহ মৃত্যু যাতনায় ক্ষণেক সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো, তারপর সব স্তব্ধ।

অপর যুবকটী বলে উঠলো – পটাসিয়াম্ সাইনাইড্···

গেরিলা বাহিনীর নায়ক কমরেড্ ফাতু মেঝের উপর একখানি মানচিত্র রেখে তার উপর পেনসিলের কয়েকটী রেখা টানছিল, এমন সময় সরোজ আর ডেভিড এসে ঢুকলো, অভিবাদন জানালো—নি-হাউ তুংচি—শুভমস্তু কমরেড!

—নিহাউ—বলে ফাতু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো, বললে—তোমরা ফিরে এলে ?

—কি করে যাই বল, আমরা তো যেতে চাই, কিন্তু তোমরা যে ছাড়তে চাও না।

—অর্থাৎ ?

—কমরেড ফু-সান মারা গেছে, আর এই চিঠিখানি দিয়ে গেছে তোমার নামে—

সরোজ ট্রেনে বোমা পড়া থেকে, ফু-সানের আত্মহত্যার কাহিনীটী আগাগোড়া সব বললে।

ফাতু একট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে, বললে—মস্ত গুণী লোক ছিল, চার পাঁচটা ভাষায় সুপণ্ডিত, ওঁর লেখা আইনের বই নান্‌কিঙ আর ক্যান্‌টনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হোত।

তারপর খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বাহির করলো। চিঠিখানি ইংরাজীতে লেখা, আমরা তার বাংলা করে দিলাম :

কমরেড্—

অতীতে সিয়াংনদীর তটে পাশ্চাত্যের স্বর্গ থেকে এক সাধু এসেছিলেন জ্ঞানের আলোক নিয়ে। নদীরতীরে পাহাড়ের ধারে ছিল তাঁর কুটির। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এসেছিলেন।

তাঁর নাম ছিল বোধিধর্ম। গ্রামবাসীদের তিনি শোনাতেন মুক্তির বাণী, নির্বাণলাভের পথ। সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর মন্দিরে গ্রামবাসীরা এসে স্বর্গ-দেশের সাধুর জ্ঞানের অমৃত-বাণী শুনতো, শ্রদ্ধার অর্ঘ দিত বুদ্ধ মূর্তির পাদমূলে। আজও আছে সেই মন্দির কিন্তু সেখানে আজ আর প্রদীপ জ্বলে না, বোমার নীচে সে স্বর্ণ মূর্তি আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেখানে একদিন শান্তি ছিল, লক্ষ লক্ষ নরনারীর মৃতদেহে আজ সেস্থান রুধির-রঞ্জিত। যেখানে একদিন লোক যেত শান্তির সন্ধানে আজ সেখান থেকে লোক পালিয়ে যায় মৃত্যুর আতঙ্কে। এই জগতে স্বার্থই কি সব? এই জগতে ভোগ করাই কি মানব জীবনের চরম কাম্য? মনুষ্যত্ব, তার জ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্ষণার কি কোন মূল্য নেই? মানুষ কি শুধু মানুষকে খুন করতেই জন্মেছে। যুগ যুগ ধরে শাক্যমুণির সাধনা করে করে জাপানীরা কি শেষে এই ধ্বংসের সত্যটাই আবিষ্কার করলো! কবে তারা সত্য উপলব্ধি করবে কে জানে!

চিঠিখানি এইখানেই শেষ হয়েছে। চিঠির নীচে কাগজের বাকীঅংশে কালি দিয়ে একটী বুদ্ধমূর্তি আঁকা। ভগবান তথাগতের ধ্যান-গম্ভীর সৌম্য মূর্তি কালির এক একটী রেখায় মহীয়ান হয়ে উঠেছে। সামনে কয়েকটী প্রদীপ আর ধূপদান জ্বলছে।

ফাতু চিঠিখানি দুবার পড়লো, তারপর সরোজদের দিকে চিঠিখানি এগিয়ে দিয়ে বললো—আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারলেম না, মরবার সময় একজন পণ্ডিত লোক এমন একখানা চিঠি আমায় দিয়ে গেল কেন? কি এর অর্থ হতে পারে?

সরোজ ও ডেভিড ধীরে ধীরে চিঠিখানি পড়লো, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—'পাশ্চাত্যের স্বর্গ' মানে?

—পাশ্চাত্যের স্বর্গ মানে ভারতবর্ষ। প্রাচীনকালে আমরা ভারতকে বলতেম পাশ্চাত্যের স্বর্গরাজ্য।*

—আর ওই বোধিধর্ম?

—ভারতবর্ষ থেকে আগে অনেক বৌদ্ধ সাধু আসতেন এখানে ধর্ম প্রচার করতে, তাঁদের মধ্যে বোধিধর্ম একজন। ভিক্ষাপাত্র ছাড়া তাঁর আর কোন সম্বল ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি সেই ভিক্ষাপাত্রটী তাঁর শিষ্যদের উপহার দিয়ে যান, আজও তা মহামূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে কোয়াংটুং প্রদেশের এক বৌদ্ধ বিহারে রেখে দেওয়া হয়েছে।

---

* It was the ancient custom of China to call India as the "Western Heaven."—'Buddhism in China today' by Prof. Tan Yun Shan.

—তাহলে এটা একটা ঐতিহাসিক কাহিনী, ছবিখানিও তো অতি সাধারণ একটা বুদ্ধমূর্তি, অথচ এর মধ্যে এমন কি আছে যে জন্য ঐটাকে মূল্যবান সম্পত্তির মত জামার মাঝে সেলাই করে রাখতে হবে?—সরোজের কপালে চিন্তার রেখা পড়লো।

ডেভিড বললে—এর মধ্যে কোন সাংকেতিক ভাষা নেই তো?

ফাতু হেসে বললে—তাহলে তো আমি বুঝতে পারতাম। দুরকম সাংকেতিক ভাষা আমাদের মধ্যে চলে, সে দুটি 'কোডই' আমার খুব ভাল জানা আছে।

—তবে?

—দেখি, খামখানি একবার দেখি—বলে ডেভিড খামখানি তুলে নিলে। খামখানির উপর ভিতর সবই সাদা শুধু পিছন দিকে খামের মুখের কাছে ইংরাজীতে কয়েকটী সংখ্যা লেখা আর প্রতি সংখ্যাটিকে ঘিরে এক একটী চৌখুপি ঘর কাটা।

[১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭] [৮] [৯] [১০] [১১] [১২] [১৩]

ওই চিঠি, ছবি, আর খামের নম্বর নিয়ে ঘণ্টাখানেক গবেষণার পরেও যখন তিনজনে রহস্যের কোন সন্ধান পেলে না, তখন বাধ্য হয়ে তাদের হাল ছাড়তে হোল। ফাতু বললে—পণ্ডিত লোক, নিরিবিলি বসে অনেক পড়াশুনা করেছিলেন, শেষে যুদ্ধের হৈ চৈ আর হত্যাকাণ্ড এমন শক্ দিয়েছে যে খানিকটা মনোবিকার ঘটাও অস্বাভাবিক নয়।

ডেভিড বললে—কার কথা বলছ?

—পণ্ডিত ফু-সান।

—আমার কিন্তু তা মনে হয় না—ডেভিড বললে—ওর মধ্যে কিছু-না-কিছু রহস্য আছেই, আমার কাছে এই চিঠিখানা আজকের মত থাক, আমি একা একা খানিক গবেষণা করে দেখি। এতে তোমাদের কোন আপত্তি আছে?

—কিছু না।

ডেভিড চিঠিখানি পকেটে ভরে ঘর থেকে বাহির হয়ে গেল।

সারাদিন ডেভিডকে দেখা গেল কখন নিবিষ্ট মনে চিঠিখানির উপর ঝুঁকে পড়েছে, কখন-বা চেয়ারখানিতে হেলান দিয়ে বসে হতাশ ভাবে ছাদের পানে তাকিয়ে আছে, আবার কখন চঞ্চলপদে ঘরখানির মধ্যে পায়চারী করছে। সারাদিন এইভাবেই কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় ছুরী দিয়ে খামখানিকে সে টুকরো টুকরো করে কাটতে বসলো।

কিছুক্ষণ পরে সহসা পিস্তলটী পকেটে ফেলেই ক্ষিপ্রপদে ঘর থেকে বাহির হয়ে গেল।

এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলো, কোনদিকে এতটুকু আলো নেই, জাপানী বোম্বারের ভয়ে চারিদিকে ব্ল্যাক-আউট্। কোনদিকে মানুষের এতটুকু সাড়া পাওয়া যায় না, ছোট গ্রামখানির বুকে নেমে এসেছে মৃত্যুর স্তব্ধতা।

সরোজ একা। ফাতু সারাদিন মানচিত্র, সৈন্যসংখ্যা আর মেশিনগান নিয়ে অঙ্ক কষতে ব্যস্ত। ডেভিড সেই-যে ঘরে ঢুকেছে আর বাহির হয়নি। সরোজের হাতের কাছে এমন একখানি বই নেই যে একা একা খানিকটা সময় কাটায়। অন্ধকারে বাহিরে কিছু বেড়ানোও যায় না। নিরুপায় সরোজ শেষ পর্যন্ত ডেভিডের দরজায় 'নক্' করাই ঠিক করলো, সারাদিন বসে বসে ডেভিড কি রহস্যের কিনারা করলো তা জানতেও তার কম কৌতূহল হয়নি। ঘরের সামনে এসে সরোজ দেখলো দরজা খোলা, ভিতরে ঢুকে দেখলো ডেভিড নেই, টেবিলের উপর ছোট একটুকরো কাগজ পড়ে আছে, পেপার-ওয়েট্ চাপা, তাতে ইংরাজীতে সামান্য দু লাইন লেখা ঃ

রহস্যের সমাধান করেছি। চললেম। চিন্তার কারণ নেই, খুব সম্ভব শেষ-রাতে ফিরবো, ইতি—ডেভিড

চিঠিখানির পানে স্তব্ধ হয়ে সরোজ তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

বন্‌বন্-বন্‌বন্-বন্‌বন্—বোঁ—

ভোমরার মত জোরালো গর্জন তুলে কুয়াসাময় সন্ধ্যার অন্ধকারে একখানি চীনা প্লেন তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। প্লেনের গায়ে নীল আলোটী পর্যন্ত জ্বালা হয়নি, কালো আকাশের বুকে কালো বাদুরের মত প্লেনখানি উড়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হয় না, নীচে পাহাড়ের চুড়োগুলো আবছায়ার মত লাগে। তথাপি সেই ধূম্রলতার ভিতর দিয়েই পাইলট্ মাঝে মাঝে নীচের দিকে তাকাচ্ছে,

কি যেন খুঁজে নেবার চেষ্টা করছে। তারপরেই আবার দৃষ্টি ফেরাচ্ছে সামনের মানচিত্রটার পানে আর মিটার বোর্ডটার উপর।

সহসা ট্রান্স্মিটারে শব্দ তুললো কট্ কট্ কট্। বৈমানিক সচকিত হয়ে উঠলো, কান পেতে শুনলো ক'সেকেণ্ড, ট্রান্স্মিটার কথা কইতে লাগলো—কট্ কট্ কট্।

ইতিমধ্যে অন্ধকার আকাশের গায় কে যেন কয়েকটা খড়ির দাগ টেনে দিলে, চারিপাশ থেকে সন্ধানী আলোর ঝিলিক্ আকাশের একপাশ থেকে আরেকপাশে ছুটে বেড়াতে লাগলো, একটা আলোর শিখা এসে পিছলে পড়লো কালো চৈনিক প্লেনখানির গায়ে। পরমুহূর্তেই শট্ শট্ করে প্লেন-ধ্বংসী কামানের কয়েকটা অগ্নিময় গোলা হাউইয়ের মত উঠে গেল আকাশে। সন্ত্রস্ত পাইলট্ এক মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেল, টুপ্ করে একটা ডিগ্‌বাজী খেয়েই প্লেনখানি কয়েকটা গোলাকে পাশ কাটালো।

কট্ কট্ কট্—আরো কয়েকটা গোলা ছুটে এল। ক্ষণেকের মধ্যে বৈমানিক ইঞ্জিন বন্ধ করে, একটা ঝাঁকানি দিয়ে প্লেনখানি শ'খানেক ফুট নেবে এল। একটা গোলা ডানদিকের পাখার পাশ দিয়ে চলে গেল, সামান্য কয়েক ইঞ্চির জন্য প্লেনখানি বেঁচে গেল।

ফট্ ফট্ ফট্—আবার কয়েকটা গোলা। কিন্তু পাইলট এবার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্লেনখানি সোজা উপর দিকে ওঠাতে সুরু করলো। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই প্লেনখানি অদৃশ্য হয়ে গেল একখানি মেঘের আড়ালে। ধূমের মেঘালী মায়ায় সন্ধানী আলোর শিখা প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল। বৈমানিক এবার নড়েচড়ে শরীরটাকে একটু স্বাচ্ছন্দ্য-সহজ করে বসলো। তারপরেই গতিযন্ত্রের কাঁটাটা থর্‌থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চললো—একশো পঞ্চাশ—ষাট—আশী—দুশো—

মেঘখানির সীমা পার হতে-না-হতেই চালক সোজা হয়ে বসলো, সতর্ক চোখে পশ্চাতে একবার তাকালো, স্তিমিত জ্যোৎস্নায় চোখে পড়লো পিছনের আকাশে ক'খানি ছায়া পড়েছে। বৈমানিক দৃষ্টি ফেরালে নিজের বিমানের যন্ত্র সজ্জার (instrument board) উপর—আল্‌টিমিটার, ইণ্ডিকেটর, টাকোমিটার, প্রভৃতির উপর দিয়ে দৃষ্টি এসে পড়লো ভল্ট্‌মিটার, গান-কন্ট্রোল-সুইচ্ আর এম্যুনিশন-কাউণ্টার্সের উপরে।

ইতিমধ্যে কোথা থেকে একখানি প্লেন একটা ডিগ্‌বাজী খেয়ে একেবারে পাশে

এসে পড়লো। লেজের উপর লাল রঙের সূর্য আঁকা, গায়ে নম্বর লেখা ৯৬। তার মেশিনগান ঝক্‌ঝক্ করে তুটী গোলা উদ্‌গার করলে চীনা প্লেনটির দিকে।

চীনা চালক টুপ করে একটা ডিগ্‌বাজী খেয়ে উপস্থিত বিপদটা কাটিয়ে নিয়ে মেশিনগানে হাত দিল—কট্ কট্ কট্ কট্ কট্ কট্—

—কট্ কট্ কর্‌র্‌র্‌—পিছনের তিনখানি জাপ প্লেন থেকে একসঙ্গে তার প্রতিধ্বনি এল।

বারেক পিছন পানে তাকিয়ে একান্ত একা চীনা পাইলটটী বিচলিত হয়ে পড়লো। কিন্তু দক্ষ তার হাত, এঁকে-বেঁকে গোলার ঝিলিক গুলো পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললো।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকখানি ৯৬ এসে পড়লো পিছনে। ফিরে যাবার উপায় থাকলে চীনা প্লেনখানি ফিরেই যেত, কিন্তু এখন সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই। পাশে অবিরাম অগ্নিশিখা ছুটে যাচ্ছে, পিছন থেকে শব্দ আসছে ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ !

পিছন পানে একবার তাকিয়েই পাইলট্ বিপদ বুঝলো, সারি সারি নীল আলো উড়ে আসছে। প্লেনের স্পীড্ সে বাড়িয়ে দিলে।

হঠাৎ একটা 'এয়ার-পকেটে' পড়ে ক'লহমার জন্য প্লেনের গতি ব্যাহত হোল, একটা ঝাঁকানি দিয়ে প্লেনখানি খানিকটা নেমে এল, ঠিক সেই মুহূর্তে প্লেনের লেজে এসে লাগলো একটি গোলা। জাপানী প্লেনগুলি এসে পড়লো অতি নিকটে। বিপদ বুঝে চীনা পাইলট্ এবার মাইক্রোফোন তুলে নিলে, ত্বরিতে বলে চললো— লেফ্‌টেন্যান্ট কমরেড ফাতু···বিপদ···হাজার মাইল উত্তরে···।

বুম্—ফস্‌স্—

একটা গোলার আঘাতে পেট্রল ট্যাঙ্ক ফেটে গেল, পাইলটের চোখে-মুখে তেল ছিটিয়ে পড়লো। একপাশে প্লেনখানি হেলে পড়লো। ষ্টিয়ারিং হুইল্‌টি চেপে ধরে কোন রকমে প্লেনখানি ঠিক রাখার চেষ্টা করে পাইলট্ মাইক্রোফোনে তার শেষ বাণী উচ্চারণ করলো— কমরেড্ ডেভিড কথা বলছে—কম্‌রেড্ ডেভিড···

ইঞ্জিন থেমে গেল, বাতাসের একটা ঝাপ্‌টায় দপ্ করে চারিদিকে পেট্রল জলে উঠলো। ডেভিড ক্ষিপ্রহস্তে চামড়ার ষ্ট্রাপগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করে লাফিয়ে পড়লো। কানের পাশে বাতাসের ডাক শোনা গেল—শোঁ-শোঁ-শোঁ ! ডেভিড নীচের দিকে তাকালো, কিছুই দেখা যায় না। অবলম্বনহীন আকাশের অন্ধকারে নীচের মাটি দৃষ্টি সীমার আড়ালে মিলিয়ে গেছে। সারাদেহের সবটুকু

শক্তি ডান হাতে কেন্দ্রীভূত করে প্যারাচ্যুটের আংটা ধরে টানলো। মাথার উপর কি যে ঘটে গেল দেখা গেল না। শুধু কাঁধে কে যেন একটা ঝাঁকানি দিলে, চারিপাশে বাতাসের চাপ থেমে গেল, পতনের বেগ গেল কমে, প্যারাচ্যুট ফুলে উঠলো—মাথার উপরে কাশফুলের মত বাতাসে দুলে উঠলো জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ আকাশের বুকে। তারপর হেলে দুলে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে লাগলো।

বুম্‌ম্ করে জলন্ত প্লেনখানির ইঞ্জিনটা ফেটে গেল, এম্যুনিশন্ কাউণ্টার থেকে কয়েকটি গোলা ছিট্‌কে পড়লো এদিকে ওদিকে—মনে হোল আকাশের গায় কে যেন একটা রকেট ছুড়ে দিয়েছে। ধূমকেতুর মত পিছনে বহ্নিশিখার পুচ্ছ জাগিয়ে প্লেনখানি ঘুরতে ঘুরতে নীচের দিকে নামতে লাগলো একটি কলছেঁড়া-ঘুড়ী যেমন নীচের দিকে নামে, তবে আরও দ্রুত।

ডেভিড তাকিয়ে থাকে, তার দৃষ্টি নিম্নগামী প্লেনখানিকে অনুসরণ করে। নীচের সন্ধানী আলো প্যারাচ্যুটটার গায়ে স্থিরকেন্দ্র হয়ে যায়। পরমুহূর্তেই একখানি জাপানী বোম্বার চিলের ছোঁ মারার ভঙ্গীতে নেমে এল প্যারাচ্যুটটির পাশে। একটি হাত বড়িয়ে পাইলট প্যারাচ্যুটের একটি ষ্ট্র্যাপ ধরে ফেললো ; তার-পরেই নামতে সুরু করলো নীচের দিকে। অসহায় ডেভিডকে ছুটন্ত প্লেনখানি প্রচণ্ড আকর্ষণে টেনে নিয়ে চললো ঝড়ের বেগে, ডেভিডের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, আকাশের বুকে সে কয়েকটা ঘুরপাক খেয়ে গেল, তার মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। মনটাকে ঠিক রাখার জন্য সে চোখ বুঁজলো। প্রতিক্ষণে তার মনে হতে লাগলো এখনি বুঝি জাপানী বৈমানিক প্যারাচ্যুটটা ফাঁসিয়ে দিয়ে তাকে আছ্‌ড়ে ফেলে দেবে নীচের কোন পাহাড়ের গায়ে। এক লহমায় শরীরটা থেঁৎলে পিষে বীভৎস একটা মাংসের তাল হয়ে যাবে, যে রহস্যের সমাধান করতে সে এসেছিল— তা চিরকাল রহস্যই রয়ে যাবে। ডেভিড প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

এদিকে ডেভিডের চিঠিখানির পানে তাকিয়ে সরোজ আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। ডেভিডের উপর মনে মনে অভিমানও বড় কম হয় না : অতো বন্ধুত্ব অমন অন্তরঙ্গতার শেষ পরিচয় কি না সামান্য এই একছত্র কালির আঁচড়! এই মনোরম হৃদ্যতা ও নিবিড়তম প্রীতির কি কোন মূল্য নেই? সামান্য একটা এড্‌ভেঞ্চার, একটা তুচ্ছ রহস্যের কৌতূহল কি এ সবের উপরে?

সরোজ চিঠিখানি হাতে নিয়ে ঘর থেকে বাহির হয়ে এল, ফাতুর দরজার

সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে ফাতুর চারিপাশে গেরিলা-বাহিনীর নায়কদের ভীড় জমে গেছে, তাদের ভেদ করে ফাতুকে দেখা যায় না, তার স্বর শোনা যাচ্ছে—তুর্বোধ্য চীনাকথা। সে সব কথার অর্থ বুঝতে না পারলেও সরোজ এটুকু বেশ বুঝলো যে, টেবিলের ওপর মানচিত্রখানি দেখিয়ে ফাতু তার সহকর্মীদের যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দেশ করে দিচ্ছেন। এই সময়ে ডেভিডের সামান্য এই চিঠিখানি তার কাছে নিয়ে যাওয়া মানে, প্রথমতঃ তার কাজের খানিকটা ক্ষতি করা, দ্বিতীয়তঃ নিজের তুর্বলতার পরিচয় দিয়ে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া। সরোজ দরজার সাম্‌নে থেকে ফিরে এল! চারিপাশের বড় বড় পাহাড়গুলোর পানে তাকালো, কোথাও এতটুকু জীবনের সাড়া নেই। মানুষের যত দোষ আর নিষ্ঠুরতা মৃত্যুর পর সব পুঞ্জীভূত হয়ে মাটির বুকে নির্মম পাষাণ হয়ে জমে গেছে। মাটির কোমলতা হারিয়ে গেছে, আকাশের অসীমতা হয়েছে শূন্যময়, কঠিন পাষানের বুকে আশ্রয় নেই—সহানুভূতি নেই।

সরোজের মনে হয়, সে আজ বড় একা, একান্ত সঙ্গীহীন। যেটুকু বন্ধুত্ব স্নেহ প্রীতি ভালবাসা জীবনের চলার পথে মানুষ সঞ্চয় করে তা সব ভূয়ো, যাকে সে জীবনে একান্ত আপন বলে মনে করে স্বার্থের উৎসাহে সে দূরে সরে যায়। অতীতের সব-কিছু ছাপিয়ে ওঠে বর্তমানের ব্যক্তিত্ব—লাভ, ক্ষতি, স্বার্থ ও সাফল্য, তখন আর সে পিছন পানে তাকায় না, অতীতের স্মৃতিকে জঞ্জালের মত তুপাশে ঠেলে দিয়ে সামনের দিকে সে এগিয়ে চলে, ভবিষ্যৎ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ডেভিডও সেই ডাক শুনে আজ চলে গেছে। অন্ধকার, অন্ধকার, আর অন্ধকার, —সামনে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া অসীম অন্ধকার তারই মাঝে ডেভিড কোথায় হারিয়ে গেছে, কোন নির্দেশ নেই।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে সরোজের মন ভারী হয়ে ওঠে, গলার ভিতর কি যেন একটা ঠেলে ওঠে, একটা অনন্ত বেদনার সুর কানে বাজতে থাকে। তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের বুকে কুজ্ঝটিকার মাঝে দিক হারিয়ে অভিযানকারীরা যেমন ভাবে পথের পানে তাকায়, সরোজ তেমনি দিশাহারা হয়ে অন্ধকার রাত্রির পানে তাকিয়ে থাকে।

রাত্রি ওঠে ঘনিয়ে। চারিপাশে মৃত্যুর স্তব্ধতা। প্রাণবন্ত জগৎ হঠাৎ যেন রূপার কাঠির পরশ লেগে পাথর হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ঝুর ঝুর করে বাতাসের দোলা লেগে গাছের পাতাগুলি কেঁদে ওঠে। সরোজের মনে হয় সে যেন যমুনার কূলে হারিয়ে যাওয়া বাঁশীর সুর, যুগে যুগে আকাশে বাতাসে কেঁদে

কেঁদে ফিরছে, মানুষের কানে কানে এসে বলছে—'ওরে তোরা স্বার্থের ওপরে ওঠ্, মানুষ হ, পরস্পরকে খুন করিস্‌নে, ভালবাসতে শেখ! জীবন ক্ষণিকের, মৃত্যুর পর সব অন্ধকার, তবে কেন এত রেষারেষি, কেন এত বিদ্বেষ?' সরোজ একটি পাথরের গায় ঠেস্ দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। শুনতে থাকে গাছের পাতাগুলি সুর তুলেছে—ঝিরঝির ঝিরঝির ঝিরঝির!

বহুদূর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ আসে। বিলীয়মান আকাশের গায় পর পর কয়েকটি আগুনের দীপ্তি ছিট্‌কে ওঠে। ওদিককার ছোট্ট সহরটিতে জাপানীরা বোধ হয় আবার বোমা ফেলতে সুরু করেছে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ওই জনপদটিকে কতবার তারা আক্রমণ করলো! বীরের মত মুখোমুখি লড়াই নয়, রাত্রির অন্ধকারে নিছক গুণ্ডামি। শিশু ও মেয়েরা বাদ যাবে না, সবাইকে নিঃশেষ করতে না পারলে আনন্দ নেই। নিজের স্বার্থের জন্য অপরকে বাঁচতে দেবে না। যে যত সহজে অপরকে আঘাত করতে পারবে সে তত বড় কুশলী, তার বৈজ্ঞানিক সভ্যতা তত উৎকর্ষ।

সহসা কিসের যেন ছোঁয়া লেগে চিন্তাচ্ছন্ন সরোজ সচকিত হয়ে উঠলো, ফিরে তাকিয়ে দেখে পিছনে কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে ফাতু দাঁড়িয়ে। বললে – তন্ময় হয়ে কি ভাবছ তুংচি।

সরোজ সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানাবার জন্য ডেভিডের চিঠিখানি ফাতুকে দিতে গিয়ে দেখে চিঠি নেই, পকেটগুলো তন্ন তন্ন করে দেখলে, কোথাও নেই, তবে···?

ফাতু হোহো করে হেসে উঠলো, বললে—কি, চিঠি খুঁজছ বুঝি? এই যে—! এমন তন্ময় হয়ে আছ যে, কাগজখানা কখন্ হাত থেকে পড়ে গেছে খেয়াল নেই!

সরোজ লজ্জিত হোল, তাড়াতাড়ি সে-ভাবটা চাপা দেবার জন্য বললে—এমনি ভাবে আমাদের না জানিয়ে একা একা যাওয়াটা কি ডেভিডের বুদ্ধির কাজ হয়েছে, বল?

—তার ফলও পেয়েছে, এরোড্রোমে এই মাত্র খবর পাঠিয়েছে, এই দেখ—হাতের এক টুকরো কাগজের উপর ফাতু একটা টর্চলাইটের আলো ধরলো, সরোজ পড়লো: 'লেফ্‌টেন্যাণ্ট কমরেড্ ফাতু—বিপদ—হাজার মাইল উত্তরে—কমরেড্ ডেভিড কথা বলছে—কমরেড ডেভিড্—'

ক্ষণেকের জন্য সরোজের বুক কেঁপে উঠলো, তারপর ফাতুর পানে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে বললে—তাহলে এখন কি করা যাবে?

ফাতু মৃদু হেসে বললে—করবো আর কি, এখনি একবার বেরুতে হবে তার সন্ধানে। তুমি তৈরী হয়ে নাও; আমি ততক্ষণে হাতের কাজগুলো সেরে নিই—

আমি সব সময়েই তৈরী—সরোজ বললে।

রাত্রির অন্ধকারে হাজার কয়েক ফুট উপর দিয়ে একখানি প্লেন তিয়েনৎসিনের উপরে এসে থমকে দাঁড়ালো। প্লেনখানির পিছনের ককৃপিটে দুটী লোক ঘেঁষাঘেষি করে বসে আছে, বারেক তারা নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলো, কোথাও এতটুকু আলোর রেশ নেই, চারিপাশে কোথাও আলোর সঙ্গে এতটুকু সম্পর্কও নেই।

ইতিমধ্যে স্পিকিং টিউবের মধ্যে স্বর শোনা গেল—তিয়েনৎসিনের উপর এসে পড়েছি, তুংচি—

—জানি,—দুজনের একজন জবাব দিলে।

—এইখানেই নাববো?

—না, এখানে নয়, আরেকটু এগিয়ে যে পাহাড়ের চুড়োটা আছে, তারই মাথায় আমারা নাববো—

প্লেনখানি আবার গতিশীল হয়ে উঠলো, ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝাপ্টা ক্ষণেকের জন্য শৈত্যের পরশ জানিয়ে দিলে। দু'তিন মিনিটের মধ্যে সামনের মাটি একটা ঢেউ তুলে কাছে এগিয়ে এল। সেদিকে একবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে যাত্রীদ্বয়ের একজন স্পিকিং টিউবের মধ্যে দিয়ে চালককে বললে—এইখানেই আমরা নাববো—

মেশিন থামিয়ে বৈমানিক চক্রাকারে নীচের দিকে নামতে স্বরু করলো।

যাত্রী এবার পাশের সঙ্গীটীকে ধাক্কা দিয়ে বললে—রেডি হয়ে নাও—

দুজনে নড়ে চড়ে বসলো, দেহের সঙ্গে বাঁধা রবারের ষ্ট্র্যাপগুলো ঢিলা করে ফেললে, তারপর একটা দীর্ঘ ম্যানিলা দড়ি ঝুলিয়ে দিলে নীচের দিকে। প্লেনের গতির সঙ্গে দড়িটী দুলতে লাগলো। দুলে দুলে যখন প্রায় মাটি স্পর্শ করার উপক্রম করেছে এমন সময় যাত্রী দুজন দড়িটী বেয়ে নীচে নামতে স্বরু করলো।

সামান্য উপর থেকে টর্চটী বাহির করে প্রথম ব্যক্তি নামবার জায়গাটা একবার দেখে নিলে, তারপর ঝুপ করে নীচে লাফিয়ে পড়লো। দ্বিতীয় ব্যক্তিও তার অনুসরণ করলো।

পাইলট্ নীচের দিকে তাকিয়ে ছিল, প্রথম ব্যক্তি টর্চের আলোয় তাকে সঙ্কেত

করলো। মুহূর্তমধ্যে ইঞ্জিনের সাড়া পাওয়া গেল। একপাক ঘুরেই প্লেনখানি অন্ধকার আকাশের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যারা নামলো তাদের পানে তাকালেই বোঝা যায়, তারা জাপানী, অন্ততঃ তাদের বেশভূষা তাই বলে। তবে কাছে গিয়ে একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের মুখের সামান্য অদলবদল হলেও সে মুখ আমাদের চেনা। তারা ফাতু ও সরোজ ছাড়া আর কেউ নয়।

সরোজ বললে—তুংচি পথ তো দেখছি না?

—পথের দরকার নেই বরাবর সোজা পথে নাববো,—ফাতু বললে।

ধীরে ধীরে তারা নামতে সুরু করলো। ফাতু আগে-আগে যায় সরোজ তার অনুসরণ করে। উঁচু-নীচু পাথরের পর পাথর। কখনও বড় পাষাণ, কখনও বিপর্যস্ত নুড়ির স্তর। কখনও-বা লাফিয়ে নামা-ওঠা করে করে হাঁটু দুটি কন্ কন্ করে ওঠে, আবার কখনও-বা নুড়ির উপর সন্তর্পণে পা ফেলতে হয়, পতনের আশঙ্কায়।

নামতে নামতে বিনিদ্র রাত্রির অবসাদ ঘুচে যায়, শরীর গরম হয়ে ওঠে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠছে। পেশীগুলি ক্রমশঃ পরিশ্রান্ত হয়ে উঠছে, কিন্তু বিশ্রামের সময় নেই। উষার আলো ফুটে ওঠার আগেই তাদের সহরে গিয়ে পৌছাতে হবে। দুজনের মুখে কথা নেই, শুধু পায়ের গতি।

এইভাবে প্রায় দু মাইল পথ নামবার পরে, একটা পাথর পাশ কাটাতেই, সহসা দুজন জাপানী সৈন্য সামনে এসে পড়লো। তারা সেখানে বোধ হয় পাহারায় ছিল, চীৎকার করে উঠলো—হল্ট্! থাম!

পথিক দুজন থমকে দাঁড়ালো।

জাপ শান্ত্রী এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো—তোমরা কে?

—টেলিফোন মিস্ত্রি।

—দু' জনেই?

—হ্যাঁ, আমি আর আমার সহকারী

আরেকটু কাছে এসে তীক্ষ্ণ চোখে তাদের দু'জনের মুখের পানে তাকিয়ে তাদের মনটাকে পর্যন্ত দেখে নেবার চেষ্টা করে জাপ সেনাটী বললো—এখানে রাত্রে কি করছিলে?

—ও দিককার গাঁয়ে গিয়েছিলেম, পথে রাত হয়ে গেল, তাই সোজা পথে ফিরছি!

—হুম্, বলে খানিক চুপ করে থেকে বললো—হেড্ কোয়ার্টার্স ?

—তিয়েনৎসিন্ !

—হুম্ ! ছাড়পত্র আছে ?

—অফিসার আমাদের চেনেন !

—ছাড়পত্র আছে, না না ?

—নেই।

—আমি তোমাদের গ্রেপ্তার করলেম—বলে, দ্বিতীয় সৈনিকটীকে ইঙ্গিত করতে সেও সরোজদের দিকে এগিয়ে এল।

ফাতু থমকে দাঁড়ালো, নিমেষের জন্য তার দুপাশের পকেট থেকে দুটি পিস্তলের মুখ উঁকি মারলো, অবিলম্বে যেন ইলেক্‌ট্রিকের শক্ খেয়ে জাপ সেনানী দুজন ধরাশায়ী হোল, স্পষ্ট কাতরোক্তি করার মত এতটুকু অবসরও পেল না। ফাতু তাদের পানে একবার তাকিয়ে সরোজের হাত ধরে বললো—চল—

—একেবারে খুন করে ফেললে ?

—এটা যুদ্ধক্ষেত্র, যে দল প্রথম সুযোগ পাবে সেই অপর পক্ষকে হত্যা করবে। এবং আজ পর্যন্ত মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এইভাবেই লেখা হয়েছে।

—সব নীতিকথা আর দর্শন-তত্ত্বের এই শেষ কথা ?

—স্‌স্‌ ! আবার তুমি তর্ক তুলছ ? বিষ গ্যাসে তোমার বাকশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে না ?

—কিন্তু এখানে আর আমার কথা কে শুনতে পাচ্ছে বল ?

—আর কেউ না পাক্ আমি তো পাচ্ছি, কিন্তু আমি তোমার কথা শুনতে চাই না। তোমার কথা শুনলে যে কাজ করতে এসেছি তা আর করা হবে না।

—ওঃ, সরি !

ফাতু মৃদু হাসলো, সে হাসি সরোজ দেখতে পেলে কি না জানি না। দুজনে আবার উৎরাই ভাঙ্‌তে সুরু করলো।

সদর রাস্তা ছেড়ে রক্ষীদের চোখে ধূলো দিয়ে সহরের উপকণ্ঠে কতকগুলি বাড়ীর কাছে তারা এসে পড়লো। কয়েকটী বাড়ী পিছনে রেখে একটী বাড়ীর দরজায় গিয়ে আঘাত করলো।

আঘাতের পর আঘাত করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। শেষে যখন দরজা প্রায় ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম হয়েছে তখন আলো হাতে একটী চীনাম্যান এসে দরজা খুলে দিলে। চীনাটির বয়স হয়েছে। বিবর্ণ লণ্ঠনের আলোয় তার স্তিমিত

দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব ধারালো করে ফাতু ও সরোজের মুখের উপর নিবদ্ধ করে সে জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা কে? কি চাও?

—আমরা জাপানী সৈনিক, এখানে খানিক বিশ্রাম করতে চাই।

—ছোট বাড়ী, জায়গা কম, এখানে তোমাদের থাকার বিশেষ স্ুবিধা হবে না।

—আমরা থাকবোই এখানে। যদি আমাদের এখানে থাকতে না দাও, তাহলে তোমাদের সব কটাকে এখানেই শেষ করে যাব। যদি ভাল চাও, তো—

—তোমরা যদি জুলুম কর তো উপায় নেই, তবে জায়গা সত্যই কম।

—আমরা থাকবই!

বুড়ো ক্ষণেক চুপ করে রইল। নিরুদ্ধ আক্রোশে তার চোখ দুটী জ্বলজ্বল করে উঠলো, তারপর বললে—বেশ, ভিতরে এসো—

আগন্তুক দু'জন ভিতরে প্রবেশ করলো। বাড়ীটী সত্যই ছোট। স্বল্প পরিসর তিন-চার খানি ঘর। একটী ঘরে কে একজন ঘুমোচ্ছিল; বৃদ্ধ গৃহস্বামী তাকে ডেকে তুলে সেই ঘরখানি সরোজদের ছেড়ে দিয়ে গেল।

লণ্ঠনটী হাতে নিয়ে সে বাহির হয়ে যাচ্ছিল, ফাতু বললে—লণ্ঠনটী রেখে যাও।

—এখনি সকাল হবে—

—তা হোক, আলো আমাদের দরকার!

বৃদ্ধ আর দ্বিরুক্তি করতে পরলো না, ঠক্ করে লণ্ঠনটী নাবিয়ে রেখে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হোল।

—আর দেখ—ফাতু উচ্চকণ্ঠে বললে—আমাদের দলের পাঁচ-সাত জন অফিসার এখনি এখানে আসবে, তারা এলেই আমার কাছে নিয়ে আসবে—

বাইরে থেকে এই আদেশের উত্তরে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ফাতু ঝুপ করে বিছানাটীর উপর বসে পড়লো, সরোজকে বললে—বস!

সরোজ ঘরখানির চারিপাশে একবার দৃষ্টি ফেরালো: একটী কাঠের আল্‌না, দুটী কাঠের তোরঙ্গ, আরেকটী জলের কলসী। আলনায় দুটী কালো রংয়ের পা'জামা ঝুলছে। একটী তোরঙ্গ বোধ হয় ভাঙা, আষ্টেপৃষ্ঠে সেটীকে দড়ি দিয়ে জড়ানো হয়েছে। একটি মাত্র জানালা, তারও একটী গরাদে নেই। দারিদ্র্যের ছোঁয়া লেগে ঘরখানি মলিন। এই গরীব গৃহস্বামীর উপর ফাতুর রুক্ষ ব্যবহারের কোন কারণ সে খুঁজে পেলে না, বললে—এদের কাছে সত্য পরিচয় দিলেই তো পারতে?

—তাহলে ওই বুড়োর কাছ থেকে এতটুকু উপকার পাওয়া যেত না. আশ্রয় পাওয়া তো দূরের কথা। উপরন্তু জাপানীরা আমাদের খোঁজ করতে এলে বরং আমাদের ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতো।

—বল কি ! তাদের জন্য আমরা এত করছি···

—এদের কাছে এসবের কোন মূল্য নেই, এ হচ্ছে পরাধীনতার দুর্বলতা।

—তবে এ বাড়ীতে এলে কেন ?

—এই বুড়োর ছেলের কাছে আমরা 'মাতাহারি'র ঠিকানা পাব।

—মাতাহারি ?*

—সে মাতাহারি নয়, আমাদের এই যুদ্ধের মাতাহারি। তার কাছে এখানকার সব খবর পাওয়া যাবে।

তা বুড়োর ছেলেকে ডেকে পাঠালে না কেন ?

—এখন সে বোধ হয় বাড়ী নেই, থাকলে সে-ই দরজা খুলতো।

সারাদিনের খাটুনি, তার উপর রাত্রে পাহাড়ের উৎরাই নেমে দু'জনেই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বিছানা তো পাতাই ছিল, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফাতু শয্যায় দেহ এলিয়ে দিলে। সরোজ বললে—জুতো জোড়া খুলে ফেললে হোত না।

—এখান থেকে বেরুবার সময় হয়তো জুতো পরার সময়ই পাওয়া যাবে না।

দ্বিরুক্তি না করে সরোজও ফাতুর পাশে শুয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে কি যেন একটা শব্দে সরোজের ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিসের সে শব্দ কিছুই প্রথমে বুঝতে পারলো না, ঘুমন্তের মতই মিট্‌মিটে চোখে খানিকক্ষণ পড়ে রইল স্তব্ধ হয়ে।

ভাঙা জানালাটী দিয়ে একটী লোক যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো, তারপর নত হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হোল। সে-যে কোন সৎ উদ্দেশ্যে আসেনি তা তার গতিবিধি দেখলেই বোঝা যায়। আসন্ন বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সরোজের সারা দেহের পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। ভাল করে দেখার জন্য সরোজ পাশ ফেরে, ইচ্ছা করেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস

---

* গত জার্মান যুদ্ধে নর্তকী মাতাহারির নাম জগৎময় ছড়িয়ে পড়ে। নৃত্যের মাধুর্য, তীক্ষ্মবুদ্ধি এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় অনন্যসাধারণ দখল থাকায় গুপ্তচর হিসাবে কাজ করার তার বিশেষ সুবিধা হয়। শত্রুপক্ষের গুপ্তচর হিসাবে ধরা পড়ায় ফরাসী সামরিক আদালতে তার উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।—মেজর টমাস কুলসনের 'দি ট্রায়াল্ এণ্ড ডেথ্ অফ্ মাতাহারী' দ্রষ্টব্য।

ফেলে। দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে লোকটী ক্ষণেক আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর জামার ভিতর থেকে লুকানো একখানি ছোরা বাহির করলো। সরোজ এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলো তার উদ্দেশ্য, আর অপেক্ষা করতে পারলো না, ছোরাখানি মাথার উপর তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে যুযুৎসুর কায়দায় এক নিমেষে উঠে দাঁড়ালো, পরমূহূর্তেই আক্রমণকারীকে এতটুকু অবসর না দিয়ে লাফিয়ে পড়লো তার ঘাড়ের উপর। এমন অতর্কিত আক্রমণের আশংকা সে করেনি, প্রতিরোধের কোন চেষ্টা করার আগেই আছড়ে পড়লো সে মাটীর উপর, ছোরাখানি ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো দেয়ালের গায়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে নিজেকে সামলে নিলে। সরোজ তাকে সাপ্‌টে ধরার আগেই সে এমনভাবে যুযুৎসুর এক পাল্‌টা কৌশল প্রয়োগ করলো যে, যাতনায় সারা দেহের মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্‌ করে উঠলো। কয়েক লহমার মধ্যে দেখা গেল, চীনাটী সরোজের বুকের উপর বসে হাত বাড়িয়ে ছোরাখানি টেনে নিচ্ছে। সরোজ একবার কৌশলে চীনাটীকে বুকের উপর থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু যুযুৎসুর সে-সব পুরানো প্যাঁচ চীনাটীর ভালমতই জানা ছিল, সরোজ তাকে আয়ত্বে আনতে পারলো না। সরোজ তার মুখে ঘুসী মারার চেষ্টা করলো, হাঁটুর নীচে সরোজের ডান হাতখানি চেপে রেখে বাঁ হাতের বজ্রমুষ্টিতে সরোজের গলা টিপে ধরে আগন্তুক ডান হাতে ছোরাখানি তুলে ধরলো তার মাথার উপর। ঝিক্‌মিকে ছোরাখানির উপর তাকিয়ে নিরুপায় সরোজের স্নায়ুগুলি শির শির করে উঠলো, সে প্রতীক্ষা করতে লাগলো অসহনীয় কঠিন আঘাত।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, তথাপি বুকের মাঝে ছোরার উষ্ণ স্পর্শ যখন অনুভব করা গেল না, কানে এল ফাতুর কণ্ঠস্বর—উঠে পড় বন্ধু!

সরোজ চোখ মেললো, দেখলে একপাশে ফাতু দাঁড়িয়ে আছে, তার বুকের উপর থেকে আততায়ী উঠে গেছে। সরোজ উঠে বসলো। ফাতু বললে—এর কথাই আমি তোমায় বলেছি, গৃহস্বামীর ইনি বড় ছেলে, এই অঞ্চলে আমাদের অন্যতম গেরিলা এজেণ্ট!

মাথা নামিয়ে চীনাটী সরোজকে অভিবাদন করলো।

সরোজ অভিবাদন গ্রহণ করে বললে—চাঙ-হ্বা-মিন্-কুও!

পিজিন ইংরাজীতে চীনাটী বললে—আমি আন্তরিক দুঃখিত, আপনি আমায় ক্ষমা করুন!

সরোজ মৃদু হেসে বন্ধুভাবে তার হাত দুটী ধরলো;

সন্ধ্যার আবছায়ায় সাধারণ জাপানীর মত সরোজেরা নির্বিবাদে অগ্রসর হোল, জাপানী পোষাকে তাদের কেউ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার দরকার বলে মনে করলো না।

পথে চীনা যত চোখে পড়ে, তার চেয়ে বেশী দেখা যায় জাপানী। উত্তর চীনকে আয়ত্বে রাখার জন্য এই অঞ্চলে জাপদের একটা পাকাপাকি ছাউনি পড়েছে। উত্তর চীনের অমন পুরাণো নাম-করা সহরটা রাতারাতি যেন চৈনিক থেকে জাপানিকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

গেরিলা-এজেণ্টটা তাদের নিয়ে এল এক অপেরা হাউসে। জাপ-সৈন্যের ভীড়ে প্রেক্ষাগৃহে প্রায় ভর্তি হয়ে এসেছে। তিনখানি টিকিট কিনে তিনজনে ভিতরে গিয়ে বসলো। প্রেক্ষাগৃহের ভিতরটা সুদৃশ্য, দেয়ালের গায়ে নানারকম পাথরের কাজ করা। উপরে বুদ্ধদেবের জীবনী সংক্রান্ত সারি সারি ছবি। মায়া-দেবীর শাদা-হাতীর-স্বপ্ন-দেখা থেকে ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত। সরোজ বললে—উপরের ছবিগুলির পানে তাকালে মনে হয় সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহারে এসে পড়েছি!

—স্-স্-স্!—ফাতু তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলে, তারপর ফিস্ ফিস্ করে বললে—আস্তে, আমাদের ইংরাজী কথাবার্তা শুনলে আশপাশের জাপানীরা সন্দেহ করবে। এটা আগে বৌদ্ধ বিহারই ছিল এরা এটাকে অপেরা হাউস করেছে।

সামনের সারির দুজন জাপ সৈনিক ঘাড় ফিরিয়ে তাদের মুখের পানে তাকালো, পিছনে একজন অস্পষ্ট স্বরে তার সঙ্গীকে কি বললে। ফাতু সরোজের একখানি হাতের উপর মৃদু চাপ দিলে, সরোজ সতর্ক হয়ে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রোগ্রাম সুরু হোল। হাল্কা নাচগান জাপনীরা পছন্দ করে, সেই ধরণেরই অনুষ্ঠান-সূচী করা হয়েছে। শুধু নাচ, কখনও বা তার সঙ্গে সঙ্গীত আছে, কখন-বা নেই। কখনো একা, কখনো-বা অনেকে। আলোর রংচং, আর পোষাকের ঝিলিমিলিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তার উপর সঙ্গীতের সুর আর বাজনার মূর্চ্ছনার সঙ্গে চরণের ছন্দ আর দেহের ভঙ্গী এসে মেশে, মনটা তখন কোথায় যেন হারিয়ে যায়, বাহিরের জগতের সব দুঃখ কষ্ট অনুভূতি কোথায় মুছে যায়। 'সচ্চিদানন্দে'র আনন্দময় রূপের ক্ষণেক পরশ লাগে হৃদয়ের বীণায়।

একটি মেয়ে নাচছিল চমৎকার, তাকে দেখিয়ে ফাতু ফিস্‌ফিস্ করে সরোজকে বললে—এই মাতাহারি!

পর পর খানকয়েক নাচের পর বিরাম হোল। ফাতু সরোজকে নিয়ে বাহিরে এল। জাপানীরা ফুল ভালবাসে, বাহিরে ফুলওয়ালীর ভীড়। রকমারী ফুলের একটী ছোট তোড়া কিনে ফাতু সাজ-ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো, পরিচারিকার হাতে ফুলগুলি তুলে দিয়ে বললে—মাতাহারিকে—

ক্ষণেক পরেই ফুলগুলি হাতে নিয়ে মাতাহারি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো, মাথা তুলিয়ে অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আপনারা?

—প্রলয়ের পথিক!—ফাতু জবাব দিলে।

—শো শেষ হলে দেখা করবেন—আপনাদের নিমন্ত্রণ রইল।

ফাতু মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো, মাতাহারি আর সেখানে দাঁড়ালো না।

শো-শেষে মাতাহারি সাজঘরের দরজায় অপেক্ষা করছিল, ফাতু আসতেই মোটরে গিয়ে উঠলো। মোটরে কোন কথাই হোল না। আসল কথা উঠলো ড্রইংরুমে চা পান করতে করতে। ফাতু বললে—খবর চাই।

—কার?

—কাল সন্ধ্যায় আমাদের এক বন্ধু এই অঞ্চলে প্লেনশুদ্ধ নিরুদ্দেশ হয়েছে।

মাতাহারি ওদিককার টেবিল থেকে একখানি খবরের কাগজ এনে বললে—দেখুন তো এই লোকটী কিনা?

সেইদিনের কাগজ, একপাশে ডেভিডের একখানি ছোট ছবি ছাপা হয়েছে, নীচে সংক্ষিপ্ত খবর:

যে ক'জন ভারতীয় সাংবাদিক চীনের প্রচার কার্যে সহযোগিতা করছেন ইনি তাঁদের অন্যতম। কাল সন্ধ্যায় চীনা-প্লেনে ইনি আমাদের ছাউনির উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় আমাদের বিমান একে নামতে বাধ্য করে। চীনা গেরিলা বাহিনীর পক্ষ থেকে ইনি সম্ভবতঃ আমাদের ঘাঁটিগুলি পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। আগামী কাল সামরিক আদালতে এঁর বিচার হবে।

পাঠকদের বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে, তিনটী ভারতীয় যুবক ও একটী তরুণী সাংবাদিক হিসাবে এদেশে আসেন, অসাবধানতার জন্য একজন মৃত্যুমুখে পতিত হন। অপর সকলে চীনা বাহিনীতে যোগ দেন। এঁদেরই পরিচালনায় কিছুদিন আগে চীনা বিমান বাহিনী সাংহাইয়ে আমাদের দুখানি যুদ্ধ জাহাজ জলমগ্ন করে। সেই বিমান যুদ্ধে আমরা শতাধিক চীনা প্লেন ধ্বংস করি, এরাও বন্দী হয় কিন্তু পরে কৌশলে এরা বন্দীনিবাস থেকে পলায়ন করে। ইনি ছাড়া

এখনও আর একজন ভারতীয় যুবক ও একজন তরুণী কমরেড্ চুটের* দলে আছে।

সরোজ বললে—তুখানা প্লেন 'শতাধিক' হয়ে গেল ?

—যুদ্ধের খবর অমনিই হয়। শত্রুরা লক্ষ লক্ষ মরে আর স্বপক্ষের আহত হয় মাত্র তু-একজন—ফাতু বললে।

মাতাহারি বললে—ও-কথা পরে হবে, এদিকে কাগজখানা যে জন্যে দিলেম তার কি হোল ?

ফাতু বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ এই লোক।

—এখন কি করতে চান ?—মাতাহারি জিজ্ঞাসা করলে—শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের সামরিক আদালতে বিচার মানেই তো প্রাণদণ্ড।

—সেই বিচার হবার আগেই একে উদ্ধার করতে হবে।

—তা আমি জানি, কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে তাই আমি জানতে চাই।

—কোথায় আছে আগে সেই খবরটা জানতে চাই, তারপর যেমন ব্যবস্থা হয় করা যাবে।

—কিন্তু অতো সময় আপনি পাচ্ছেন কোথায় ? কাল সকালে যদি কোর্ট-মার্শাল হয় তাহলে যা কিছু করবার এই ক'ঘণ্টার মধ্যেই করতে হবে, সেইজন্য এমন ফন্দী-ফিকির চাই যাতে তাড়াতাড়ি কাজ হবে। সেই জন্য আগে থেকে মতলব ঠিক করে নেওয়া উচিৎ।

—সব-তো জানি, কিন্তু কোথায় তাকে রেখেছে না জানলে...

—জেলখানা বোমা পড়ে ভূমিসাৎ হয়ে গেছে, কাজেই আর যেখানে রাখুক না কেন, সেখানে রাখেনি। সে জায়গা সহরের মধ্যেই, কেননা সহরটা সুরক্ষিত,

---

* কমরেড্ চু-টে ধনী জমিদার ঘরের ছেলে। জার্মাণীতে ইনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তারপর চণ্ডু খেয়ে আর বাবুগিরি করে দিব্বি দিন কাটাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে ১৯২৭ সালে 'বিদেশীদের বিশেষ অধিকারের' প্রতিবাদে চীনে যে বিপ্লব ঘটে তা তাঁর মনেও এমন বিপ্লব ঘটায় যে সব-কিছু ছেড়ে ইনি রুশিয়া চলে যান। ফিরে এসে চীনের সাম্যবাদী দলে যোগ দেন। সাম্যবাদীদের সঙ্গে তখন চিয়াং-কাইশেকের যুদ্ধ হচ্ছে। অল্পদিনের মধ্যে 'চীনা লাল ফৌজ' এঁকে সেনাপতিত্বে বরণ করে। চিয়াং কাইশেক তখন এঁর মাথার জন্য ৫০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেন...বহিঃশত্রুর আক্রমনে এখন ভিতরের গোলযোগ মিটে গেছে, এখন ইনি যোগাতার সঙ্গে জাপানীদের বিরুদ্ধে চীনাসৈন্য পরিচালনা করছেন। ইনি বাস্কেটবল খেলতে ভারী ভালবাসেন। সব সময় হাসিখুসি, আচার ব্যবহারে এতটুকু অহঙ্কার নেই; সকলের সঙ্গেই বন্ধুভাব।

গেরিলা সৈন্যের ভয়ে বন্দীদের সহরের বাহিরে রাখার সাহস জাপানীদের নেই। এবং যেখানে রাখা হয়েছে তার চারিপাশে যে অনেকগুলি সশস্ত্র সেনা পাহারা দিচ্ছে—এ কথাও সত্যি। এই সব বিচার করে আমাদের আগে একটা মতলব স্থির করে তারপর অগ্রসর হতে হবে।

—বেশ! কিন্তু·· ফাতু কপালে হাত বুলাতে সুরু করলো। তার চোখের সামনে দিয়ে বায়োস্কোপের ফিল্মের মত চিন্তার ঝড় বহে গেল। একটীর পর একটী বুদ্ধি আসতে লাগলো কিন্তু পরক্ষণেই যুক্তির আঘাত সইতে না পেরে হারিয়ে যেতে লাগলো, পিছনে টেনে আনলো আরেক বুদ্ধিকে। শেষে শোফার উপর হাতপা এলিয়ে দিয়ে বলে উঠলো—হোপ্‌লেস! তুমি একটা কিছু ভেবে ঠিক কর কমরেড্, আমি তো পারলেম না!

সরোজ ফাতুর মুখের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। এতক্ষণ চীনা ভাষায় কথা হচ্ছিল, সরোজ তার একবর্ণও বোঝেনি। ফাতু এবার ইংরাজীতে সংক্ষেপে তাকে সব বুঝিয়ে বললে। সরোজ বললে--এই! এরই জন্য এত দুশ্চিন্তা? আমি শুনতে শুনতেই মতলব ঠিক করে ফেলেছি।

—যথা?

—জাপ সেনারাই তো এখন এই নগরের শাসন-কাজ চালাচ্ছে; সেই সৈনিকদের যিনি সর্বে-সর্বা তার সঙ্গে মাতাহারির ভালরকম পরিচয় আছে কি?

—আছে।

—বেশ তাহলে এখনি মাতাহারি তাকে টেলিফোনে এখানে নিমন্ত্রণ করুক।

—তারপর?

—সে এলে মাতাহারি কথায়-কথায় তাকে জিজ্ঞেস করবে, ডেভিড কোথায় আছে, কবে কখন্ ও কোথায় তার কোর্টমার্শাল হবে, সেই মজার ঘটনা সে দেখতে পাবে কি না, ইত্যাদি—

—তারপর?

—অবস্থা বুঝে তার পরে ব্যবস্থা হবে।

ঘণ্টাখানেক পরে নীচে মোটরের হর্ণ পাওয়া গেল। মাতাহারি বললে—ওই এসেছে!

ফাতু, সরোজ ও চীনাযুবকটী তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে আত্মগোপন করলো। কাঠের সিঁড়ির উপর দুম্‌দুম্ করে পায়ের শব্দ শোনা গেল, মাতাহারি

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো, মৃদু হেসে বলে উঠলো—আসুন, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি—বানজাই দাই নিপ্পো—জাপানী মহিমা চিরজীবী হোক।

প্রতি-অভিবাদন জানিয়ে লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল কাহিরো ঘরের মধ্যে এসে একখানি সোফায় বসে পড়লো, বললে—হঠাৎ জরুরী নিমন্ত্রণ—ব্যাপার কি ?

তার সামনের আসনটী দখল করে মাতাহারি বললে—অপেরা থেকে ফিরে কাগজে একটা খবর দেখলেম, একজন ইণ্ডিয়ান স্পাইকে তোমরা পাকড়াও করেছ, কাল সকালেই তার কোর্টমার্শাল হবে। কোর্টমার্শাল কখনও দেখিনি, দেখার বড় ইচ্ছা, তুমি যদি একটা ব্যবস্থা করে দাও—

—বেশ বেশ! তার আর কথা কি ? কাল সকালেই তোমার জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দোব।

—কোথায় হবে ? কোথায় সে এখন আছে ?

—আমাদের কোয়ার্টারের পিছনে একটা বাগান-বাড়ী আছে, যেখানে আগে তোমাদের কি একটা আশ্রম ছিল, সেইটাই আমরা এখন জেলখানা করেছি। আগে লোকে সেখানে ভগবানকে ডাকতো পরকালের ভয়ে, এখন লোকে সেখানে ভগবানকে ডাকছে আমাদের অত্যাচারের ভয়ে—ভগবানকে সেখানে ঠিক ডাকা হচ্ছে, আশ্রমের এতটুকু অমর্যাদা আমরা করিনি, কি বল!—চমৎকার রসিকতা করা হয়েছে ভেবে কাহিরো হিহি করে হেসে উঠলো।

—ধরো, যদি আজ রাত্রে তারা কোন রকমে দরজা খুলে পালিয়ে যায় ?

—দরজা খুলবে কে শুনি, সব চাবি তো আমার কাছে, এ ছাড়া তো আর চাবি নেই, তাহলে তাদের পাথরের দেয়াল ভাঙতে হবে।

—যদি রাত্রে জন কতক চীনা গেরিলা এসে তাদের সাহায্য করে ?

—জন কতকে কিছু হবে না। অন্ততঃ দুটি হাজার সৈন্য ওই বাড়ীটীর চারিপাশে আছে, তাছাড়া ও-তল্লাটে একজন চীনাকেও আমরা আস্ত রাখিনি!

—সব খুন করেছ ?

—খুন মানে ? একদলের স্বার্থের জন্য আরেকদল জীবন দেবে—এর নাম ত্যাগ। তাদেরকে আমরা এই ত্যাগটুকু স্বীকার করতে বাধ্য করেছি। আর তারা সেইজন্যই এখানে ছিল, নাহলে আমরা আসছি জেনেও তারা এখানে নিজেদের বাড়ী-ঘর জিনিস-পত্তর আগলে বসেছিল কেন বল—সেই সব দামী-দামী জিনিষ-পত্তরগুলো আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাবে বলেই তো!

—জিনিষ-পত্তর গুলো নিয়ে লোকগুলোকে ছেড়ে দিলেই পারতে—

—তা হয় না, পাঁঠা না মারলে কি পাঁঠার মাংস খাওয়া যায়!—বলে কাহিরো আরেকবার হাসবার চেষ্টা করলো, মাতাহারির মনে হোল সে যেন মুখ ভেংচাচ্ছে।

—তোমাদের মনে কি দয়া-মায়া বলে কোন জিনিষ নেই? যারা লড়াই করেনি তাদেরকেও তোমরা খুন করবে?

—তার মানে?—কাহিরোর ভ্রূদুটি কুঁচকে উঠলো।

—মানে আবার কি? তোমরা নানকিঙ দখল করে চল্লিশ হাজার নাগরিককে অনর্থক হত্যা করেছ। সাধারণ লোকদের এ-ভাবে খুন করার তো কোন দরকার ছিল না!

—তবু তো আমরা লড়াই করতে এসে খুন করেছি, আর তোমাদের সাংহাইয়ে যে প্রতি বছরে উনত্রিশ হাজার লোক অনাহারে পথের উপর মরে পড়ে থাকে। তোমাদের বড়লোকেরা তার একটুকু প্রতিকার করে না, তখন্? তাছাড়া তোমাদের দেশে এমনিই তো না খেতে পেয়ে বছরে বিশ লাখ লোক মারা যায়, তত লোক তো এখনও আমাদের হাতে মরেনি।* থাক সে কথা, তুমি কি এখানে এই সব কথা শোনাবার জন্য আমায় ডেকেছ?

রুক্ষ দৃষ্টিতে কাহিরো মাতাহারির মুখের পানে তাকালো।

—শুধু শোনাবার জন্য ডাকিনি, ডেকেছি প্রতিশোধ নেবার জন্য—

কাহিরো আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো,—কি! কী!!

তারপর কোমরে ঝুলানো পিস্তলের খাপটার মধ্যে হাত ভরেছে ইতিমধ্যে নিঃশব্দে পিছনের ঘরের কালো পর্দা ঠেলে সরোজ ও ফাতু এক সঙ্গে তার উপর লাফিয়ে পড়লো। ফাতু তার গলা টিপে ধরলো, সরোজ চেপে ধরলো দু'হাত। তথাপি জাপানী লেফ্টেনাণ্টটীকে কাবু করা সহজ হোল না, মাতাহারির সুদৃশ্য ঘরটীর মাঝে একটা ছোটখাট লড়াই সুরু হয়ে গেল। তিনজনে গিয়ে পড়লো টেবিলের উপর, উপরিস্থিত চায়ের সমঞ্জাম-আদি থন্ থন্ ঝন্ ঝন্ করে চারিপাশে ছিটকে পড়লো। তারপর সুরু হোল ধস্তা-ধস্তি।

কিন্তু দুটী সম-বলিষ্ঠ লোকের সঙ্গে একজনের লড়াই বেশীক্ষণ চলে না, তার

---

*"When the Japanese took Nanking 40,000 Chinese—many of them civilians—are said to have been executed,"...

"About 20,000,00 people die of starvation in China every year. In 1935, a normal year, 29000 bodies were picked off the streets of Shanghai alone—one of the great metropolises of the world—of men, women, children dead of hunger,"—Inside Asia by John Gunther.

উপর যদি সে অপ্রস্তুত থাকে তাহলে তো কথাই নেই। শ্বাস নেবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বার কতক গোঁ গোঁ করে কাহিরো অচেতন হয়ে পড়লো। তার মুখের মধ্যে একখানি রুমাল ভরে দিয়ে ফাতু ও সরোজ ক্ষিপ্রহস্তে তাকে বেঁধে ফেললো। ঠিক সেই সময় কাঠের সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ শোনা গেল—খট্ খট্ খট্।

মাতাহারি মুখ বাহির করে দেখলোঃ একজন জাপানী সৈনিক উপরে উঠে আসছে।

মাতাহারি ত্রস্তে চাপা গলায় বলে উঠলো—টি-জেন্—শত্রু!

ফাতু চমকে উঠলো, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলো—টি-জেন্?

—হ্যাঁ, 'জি-পান্-জেন্'!

সরোজ এবার বুঝলো, এই দুটি কথা এই ক'দিনে বহুবার শুনেছে, পিস্তলটা সে চেপে ধরলো।

মাতাহারি মুখের পানে তাকিয়ে ছিল, ফাতু বললে—ক'জন?

—একজন।

—আসুক, আসতে দাও—

জাপানী সৈনিকটা সশব্দে সিঁড়িগুলি অতিক্রম করে মাতাহারির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো, মাতাহারি জিজ্ঞাসা করলো—কে?

—কমাণ্ডারের ক্যাডেট্।

—কি চাই?

—ভিতরে যেতে চাই।

—এসো—

মাতাহারিকে পাশ কাটিয়ে লোকটা ঘরের মধ্যে এক পা দেওয়ামাত্র ফাতু ও সরোজ দরজার দুপাশ থেকে তার উপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়লো, বেচারা একটা নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পেলে না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জাপানী দুজনের যত কিছু সাজসজ্জা ফাতু খুলে নিলে, তারপর নিজে সাজলো কম্যাণ্ডার, সরোজকে সাজালো তার ক্যাডেট্। মাতাহারিকে বললে—তুমি তো এতদিন ধরে নিজেরই মেক্আপ্ করে আসছ, এবার আমাদের মুখ-দুটো সুবিধামত জোড়াতালি লাগিয়ে দাও তো দেখি!

মাতাহারি রং ও তুলি নিয়ে বসলো তাদের সামনেঃ ক্রমশঃ কম্যাণ্ডারের মুখের নকল উঠে এল ফাতুর মুখে, সরোজকে দেখেও আর বাঙালী বলে চেনার উপায় রইল না।

তারপর কম্যাণ্ডার ও ক্যাডেট্‌কে বেঁধে রেখে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে তারা বাহির হয়ে পড়লো।

নীচে কম্যাণ্ডারের মোটর দাঁড়িয়ে ছিল, সোফারের খালি আসনটী ফাতু দখল করে বসলো। ষ্টার্ট দিয়েই বাঁ পায়ে ক্লাচ্ টিপে ধরলো, থর থর করে মোটর কেঁপে উঠলো। সরোজ ও মাতাহারি এক লাফে গাড়ির মধ্যে উঠে বসলো। তৎক্ষণাৎ ফার্ষ্ট গিয়ারে মোটর চলতে স্থরু করলো।

সহরে সামরিক-আইন জারী হয়েছে, পথে একটীও আলো নেই, তার উপর মাঝে মাঝে বোমা বিস্ফোরণে আশপাশের বাড়ীগুলো মুখ থুব্‌ড়ে পথের উপর এসে পড়েছে—এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো। চাকায় ঝাঁকানি লেগে 'এক্‌সেলে' কিচ্‌কিচ্ শব্দ উঠছিল। ভিতরের আরোহীরা নির্বাক, ধারালো চোখে তাকিয়েছিল সামনের পানে, অন্ধকার ভেদ করে বহুদূর পর্যন্ত দেখে নেবার চেষ্টা করছে যেন। হেডলাইট্ জ্বালানোও চলবে না, অন্ধকারে একটু এদিক-ওদিক হলে কোথায় ধাক্কা লাগবে কিছুই জানা নাই। তথাপি মোটরের গতি উত্তর-উত্তর বেড়েই চলেছে। স্পীডোমিটারের লাল কাঁটাটি থর থর করে কাঁপছে, সাদা ষ্টিয়ারিং হুইল্‌টাও থর থর করছে। ফাতুর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অনিমেষ, মুখ তার ভাবলেশ হীন, নির্বিকার।

সহসা কাণের পাশ দিয়ে কি একটা কালো জিনিষ সট্ করে চলে গেল, একটা ল্যাম্প পোষ্টই হবে হয়তো। মাত্র কয়েক আঙুলের তফাৎ। চমকে উঠে সরোজ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো, স্পিডোমিটারের কাঁটাটীর পানে তাকিয়ে বলে উঠলো —ইস্ তিরিশ! এই অন্ধকারে···

—হাস্‌স্—ফাতু অধৈর্যের মত বাঁ হাত নেড়ে সরোজকে থামিয়ে দিলে, বললে —পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে আমি এখানে ন'মাস লুকিয়ে ছিলেম, পথঘাট সব আমার মুখস্থ—

একটা মোড় ফিরেই পথের উপর একটী বড় ফটকের সামনে মোটর এসে থামলো। দুপাশে দুজন শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছিল, কম্যাণ্ডারের মোটর দেখেই বুটের খট্ খট্ শব্দ করে তারা কাঠের মত স্থির হয়ে গেল। ফাতু মোটর থেকে নেমে পড়লো, পিছনে সরোজ ও মাতাহারি নামলো। কম্যাণ্ডারের টুপি দেখে শান্ত্রী দুজন স্যালুট্ দিলে। মাথাটী একটু দুলিয়ে মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে ফাতু সদলবলে ফটক পার হয়ে গেল।

ভিতরে মাঠ, চারিপাশে কয়েকটী দেওদার গাছের সারি, তারপরেই সৈন্য-ব্যারাকের মত একটানা ঘর। সামনেই এক জায়গায় জন কয়েক জাপানী গল্প

করছিল, সামনে সেনাপতির টুপি দেখে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়ালো। একটা মাথা-ঢাকা আলো জ্বলছিল, তাতে সৈনিকদের পাগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, ফাতু তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গট্ গট্ গট্ গট্ করে অগ্রসর হোল।

একজন সৈনিক এক পা এগিয়ে এসে বললে – বান্‌জাই দাই নিপ্‌পঁ!

—বান্‌জাই!···শোনো—বলে ফাতু তাকে একপাশে ডাকলো, মাতাহারিকে দেখিয়ে বললে, জাপানী ভাষাতেই বললে—এঁর ভাই কদিন আগে বন্দী হয়েছে, এঁদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বন্দীদের দেখিয়ে আনো! তাকে সনাক্ত করলে নিয়ে আসবে আমার মোটরে—তাড়াতাড়ি কর—জরুরী দরকার!

প্রহরী সরোজ ও মাতাহারিকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। প্রথম ঘরের সারি পার হয়ে তারা ব্যারাকগুলির পিছন দিকে চলে গেল। সেদিকটা যেন আরো বেশী অন্ধকার। সরোজের বুক বারেকের জন্য থম্ থম্ করে উঠলো, এর মধ্যে একবার ধরা পড়লে আর নিষ্কৃতি নেই, স্বেচ্ছায় বাঘের গুহায় মাথা বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু তখনই মনে পড়লো, ডেভিড বেচারা তো এর মধ্যেই রয়েছে; যদি মরতে হয় দু-বন্ধু না হয় এক সঙ্গেই মরবে। সরোজ আর দ্বিধা না করে দৃঢ়পদে অগ্রসর হোল।

একটা গলিপথ পার হয়েই একটা দরজা। অন্ধকারে এই পঁচিশ-ত্রিশ হাত আসতেই মনে হোল যেন পাতালে প্রবেশ করছি। দরজার আড়ালে মৃদু আলোর আভাষ পাওয়া গেল, সরোজদের দেখে দুজন জাপ সৈনিক সামনে এসে দাঁড়ালো। সরোজদের সঙ্গী সৈনিকটার সঙ্গে শান্ত্রী দুজনের কি কথা হয়, সরোজ তার এক বর্ণও বুঝলো না। তবে কথাবার্তা শেষে শান্ত্রীদের একজন তাদেরকে নিয়ে অগ্রসর হোল সামনের আরেক সারি ঘরের দিকে।

প্রত্যেক ঘরের দরজায় ন'দশ ইঞ্চি এক একটা চৌখুপি কাটা আছে। প্রথম ঘরের দরজার সামনে এসে জাপানী শান্ত্রীটা সরোজের হাতে একটা টর্চলাইট দিয়ে বললে—নাও, দেখ—

কথার অর্থ না বুঝলেও সরোজ অর্থটা আন্দাজ করে নিলে। খুপ্‌রির মধ্যে দিয়ে টর্চ লাইট বাড়িয়ে দিয়ে সে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলো: একটি লোক দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে, আলোর ঝিলিক দেখে একবার মুখ তুলে তাকালো—ভাবলেশহীন।

দ্বিতীয় ঘরের কয়েদী ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল, আলো চোখে পড়তেই

যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, চীনা ভাষায় কি যেন চীৎকার করে উঠলো—গালি দিল বোধ হয়।

তৃতীয় ঘরে এক কিশোর, আলো দেখেই দরজার কাছে ছুটে এল, কি যেন চাইলে, সরোজ তার একটী কথা মাত্র বুঝলে—'স্থই'—জল, ছেলেটী জল চাইছে। বেচারার মুখখানি বড় মলিন। মাতাহারি তার সম্বন্ধে কি যেন বললে, জাপ শাস্ত্রীটা একটী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে মাত্র।

চতুর্থ ঘরে দরজার সামনেই একজন দাঁড়িয়েছিল, সরোজদের দেখেই সে চীৎকার করে উঠলো—তা তাও জি পান,—জাপানের পতন হোক, তা তাও জি পান জেন্—জাপানীরা ধ্বংস হোক্!

পঞ্চম ঘরে দু হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে একটী লোক দিব্যি ঘুমুচ্ছে, তাকে দেখেই সরোজের কেমন যেন সন্দেহ হোল, মুখ দেখবার জন্য দরজায় দুম্‌দুম্ করে দুবার শব্দ করলো, লোকটী কিন্তু তথাপি নির্বিকার, সে মাথা তুললো না। সরোজ এবার মৃদুস্বরে ডাকলো—ডেভিড্—ডেভিড্!

লোকটী এবার মুখ তুলে তাকালো, দরজায় সরোজকে দেখেই চমকে উঠলো—ইউ! তুমি!

সরোজ ক্ষণেকের জন্য ঠোঁটের উপর একটী আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলো, তারপর মাতাহারির হাতে মৃদু চাপ দিলে। মাতাহারি এই সঙ্কেতের অর্থ বুঝলো, দুর্বোধ্য ভাষায় শাস্ত্রীটাকে কি সব বললো। এক গোছা চাবি বাহির করে শাস্ত্রীটা দরজার তালা খুললো। ডেভিড অবাক হয়ে গিয়েছিল, সরোজ তার কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে ইংরাজীতে বললে—চল, কম্যাণ্ডার তোমায় ডাকছে—

ডেভিড সরোজের পিছু পিছু অগ্রসর হোল।

মোটরে ফাতু অপেক্ষা করছিল। প্রতিটি মুহূর্ত তাকে অসহিষ্ণু করে তুলছিল। যত দেরী হয়, ধরা পড়ার আশঙ্কা ততই বাড়ে। এই অবস্থায় একবার ধরা পড়লে জাপানীরা যে তাদের নিয়ে কি করবে তা ভাবতেও পারা যায় না।

অন্ধকারের পানে তাকিয়ে ফাতু বসেছিল এমন সময় সরোজরা এসে পড়লো। ডেভিডের হাতে তখনও হাতকড়ি লাগানো, দেখে ফাতু সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো; রুক্ষ স্বরে জাপ শাস্ত্রীকে কি যেন বললে, সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চাবি বাহির করে হাতকড়ি খুলে দিলে, সরোজরা মোটরে উঠে বসলো। ষ্টার্ট দেওয়াই ছিল, ক্লাচ টিপে গিয়ার ঠেলে দেবার জন্য নত হতেই, মিটার বোর্ডের আলো এসে

পড়লো ফাতুর মুখের উপর, জাপ সৈনিক দুজন চমকে উঠলো। কম্যাণ্ডারকে স্বয়ং মোটর চালাতে দেখে প্রথমেই তাদের কেমন যেন অস্বাভাবিক লেগেছিল। এখন কম্যাণ্ডারের পোষাকে ভূষিত লোকটীর মুখখানি কম্যাণ্ডারের নয় দেখে তারা কম বিস্মিত হোল না। ইতিমধ্যে মোটর মৃদু মৃদু চলতে সুরু করেছে। সহসা একজন সৈনিক চীৎকার করে উঠলো—থাম! থাম!!

অপর সৈনিকটী এবার নিজের কর্তব্য বুঝতে পারলো, এক লাফে চলমান মোটরের পা-দানের উপর উঠে দাঁড়ালো। সরোজ এজন্য তৈরীই ছিল, এক ঝট্কায় তাকে মোটর থেকে ফেলে দিলে। অপর সৈনিকটী ততক্ষণে কোমরবন্ধ থেকে পিস্তল টেনে নিয়ে আদেশের স্বরে চীৎকার করে উঠলো—থাম!

কিন্তু থামবে কে, মোটর তখন সেকেণ্ড গীয়ারে চলতে সুরু করেছে।

ঠন্ ঠন্ করে কয়েকটী গুলি এসে মোটরের গায়ে লাগলো। পিস্তলের শব্দে বাগানের ভিতর থেকে আরো অনেকে ছুটে এল, হৈচৈ শোনা গেল। তারপরেই চারি পাশের স্তব্ধতা প্রতিধ্বনিত করে বেজে উঠলো বাঁশীর ধারালো শব্দ।

ফাতু গীয়ার টিপে ঠেলে দিলে, পা চেপে বসে গেল এক্সিলেটারে—মোটর ছুটলো, যত জোরে ছোটা সম্ভব···

মিনিট খানেক পরেই ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ করে মোটরখানি একটা রাবিশের স্তূপের উপর উঠে পড়লো, তারপরে হুড়মুড় করে সুরু হোল নামা, ঝাঁকানির চোটে মাতাহারির মাথাটা একবার ঠুকে গেল মোটরের গায়, এক্সিডেণ্টের ভয়ে সে আর্তনাদ করে উঠলো। সরোজ চীৎকার করে উঠলো—হেড্ লাইট্, হেড্ লাইট্!

ফাতু কোন কথা বললো না। কট্ করে একটা শব্দ তুলে হেড্ লাইটের আলো সামনে অনেকখানি পথ আলোকিত করে তুললো। যতদূর দেখা গেল—শুধু ইট কাঠ আর রাবিশ। দুপাশের বাড়ীগুলো বোমা খেয়ে মুখ থুবড়ে এসে পড়েছে পথের উপর, পূর্ণবেগে মোটর ছোটার মত এতটুকু সমতলতা চোখে পড়ে না কোথাও।

সরোজ বললে—সর্বনাশ!

ফাতু ঠোঁটের কোণে উপেক্ষার হাসি ফুটিয়ে বললে—কিছু না, এ আমার অভ্যাস আছে।

মোটরের গতি গেল কমে, সামনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ফাতু ষ্টিয়ারিং চেপে ধরলো। বন্ধুর ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে, যতটা সম্ভব সমতলতা খুঁজে নিয়ে ক্যাচ্-

কোঁচ্ শব্দ তুলে, ঘচাংঘচ্ করে নাচতে নাচতে মোটর এগিয়ে চললো, প্রতি মুহূর্তে ভিতরের আরোহীদের জানিয়ে দিতে লাগলো যে তারা সত্যি এগুচ্ছে।

সরোজ বললে—এই ভাবে আমরা কদ্দূর যাব ?

—যদ্দূর দরকার। অন্ততঃ যতক্ষণ না টায়ার টিউব্ ফাটছে।

—এর চেয়ে মোটর থেকে নেবে…

—মোটেই না, তাহলে এখনি ওদের হাতে ধরা পড়ে যাব। যেভাবেই ওরা আসুক না কেন, এই পথে ঘণ্টায় পাঁচ মাইলের বেশী ওরা আসতে পারবে না, আর আমরা চলেছি ঘণ্টায় দশমাইল—

ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ কচ্…কথায় কথায় মোটর লাফিয়ে উঠতে লাগলো।

সরোজ বললে—সর্বনাশ এই পথে ঘণ্টায় দশমাইল! এক্সিডেণ্ট করবে নাকি!

ফাতুর মুখে হাসির আভাষ ফুটলো, বললে—এক্সিডেণ্টে মরা জাপানীদের হাতে মরার চেয়ে অনেক ভাল—তাতে অপমান নেই।

ঝিক্ ঝিক্ করে নাচতে নাচতে আরো কিছুক্ষণ এগিয়ে যাবার পর একটা ঢালু রাবিশের স্তূপের সামনেই চোখে পড়লো—সামনেই নদী, পথের বরাবর একটা ভাঙা পুল দুমড়ে গিয়ে পড়েছে নদীর জলে।

মোটার ঢালু স্তূপের উপর দিয়ে গড়গড় করে গড়িয়ে যাচ্ছিল, ফাতু ঘস্‌স্ করে ব্রেক টিপে ধরলো, তথাপি গাড়ী রোখা যায় না দেখে, প্রাণপণে ষ্টিয়ারিংটা যতটা সম্ভব ঘুরিয়ে দিলে, বাম্পারটা গিয়ে ধাক্কা মারলো পুলের একটা লোহার থামের সঙ্গে, এদিকের হেড্‌লাইট্‌টা ভেঙে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো, ঘট্‌ঘট্ করে একটা শব্দ উঠলো, চারিপাশের স্তব্ধতা দিলে চমকে।

প্রচণ্ড ঝাঁকানিতে মোটারখানি কেঁপে ওঠার পর-মুহূর্তে সকলে একসঙ্গে বলে উঠলো—যাক তবু রক্ষা!

পরক্ষণেই ডেভিডের গলা শোনা গেল—গেট্ রেডি, কুইক্—

চারিপাশ থেকে তীরের ফলার মত বিদ্যুৎমশালের আলো এসে পড়লো মোটরখানির উপর। দেখা গেল পিছনের রাবিশের স্তূপের আড়াল থেকে বেয়োনেট্ বাগিয়ে ধরে জন কয় জাপ সৈন্য ছুটে আসছে।

ফাতু দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়ছিল, কিন্তু সট্ সট্ করে কয়েকটি গুলি ছুটে গেল পাশ দিয়ে, ফাতুর আর নামা হোল না। মোটরের পিছনের বডিতেও

দু'চারটে গুলি লাগার ঠন্ ঠন্ শব্দ শোনা গেল, সকলেই নেমে পড়ার উদ্যোগ করছিল, থমকে দাঁড়ালো।

ইতিমধ্যে জন দুই সেনা ফুটবোর্ডের উপর উঠে পড়লো, সরোজ তৎক্ষণাৎ এক আপারকাট্ ঘুসি বসিয়ে দিলে একজনের চোয়ালে, সে ঘুরে পড়ে গেল। দ্বিতীয় সৈনিকটী তার প্রতিদানে বেয়োনেটে সরোজকে ফুঁড়ে দেবার উপক্রম করলো, ফাতুর হাতের পিস্তলটী সরোজকে সে যাত্রা রক্ষা করলে। সেই সেনাটী পড়ে গিয়ে চীৎকার করে উঠলো। পিছনে এক সঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া গেল। ফাতু আর অপেক্ষা করতে পারলো না, 'কুইক্'—বলেই মোটরের দরজা খুলে বাহিরে লাফিয়ে পড়লো। সরোজও বুঝলে এই মুহূর্তের সুযোগ হারালে চলবে না, ডেভিড ও মাতাহারিকে বারেক আকর্ষণ করে সামনের দরজা খুলে সেও বাহিরে লাফিয়ে পড়লো। ডেভিড ও ফাতু তার অনুসরণ করলো।

মোটরখানির অন্তরাল দিয়ে ফাতু বরাবর পুলের উপর দিয়ে ছুটলো, সরোজরা তার পিছনে চললো। পুলটী দুমড়ে জলের মাঝে গিয়ে পড়েছে খাড়াই পাহাড়ের উৎরাইয়ের মত। সে পথে একবার ছুটতে সুরু করলে থমকে দাঁড়াবার উপায় থাকে না, সংযত হবার চেষ্টা করলেই মুখ থুব্ড়ে পড়তে হবে। হাতে একটী লাঠি না থাকলে সে পথে শরীরটীকে ধীরে-সুস্থে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত।

সরোজরা তো দুর-দুর করে এগিয়ে চললো। মোটরখানি মাঝে পড়ায় জাপানীদের বন্দুকের গুলি আর টর্চের আলো বাধা পাচ্ছিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা মোটরের কাছে যখন এসে পড়লো, তখন তাদের হাতের টর্চে সমস্ত পুল-পথ আলোকিত হয়ে উঠলো, সরোজদের দেখতে পেয়েই তারা হৈ-চৈ করে উঠলো, উপর থেকে নীচের দিকে গুলি চালানো সহজ, তাই তারা সেখান থেকে সট্ সট্ করে গুলি চালাতে সুরু করলো।

—শুয়ে পড়, শুয়ে পড়!—ফাতু চীৎকার করে উঠলো। সকলে তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লো।

ফাতু গড়গড় করে গড়িয়ে গিয়ে পড়লো জলে। সকলে তার অনুসরণ করলো। ঝুপ্ ঝুপ্ করে জলে ভারী জিনিষ পড়ার শব্দ শোনা গেল ক'বার। জাপানীরা হুড়মুড় করে নেমে আসতে সুরু করলো জলের দিকে।

নামতে নামতে দু'তিন জন জলে পড়ে গেল, অপর সকলে কোন রকমে সামলে নিয়ে উবু হয়ে বসে পড়লো জলের কিনারায়, তাদের হাতের আলো কাঁপতে

লাগলো জলের বুকে, সরোজদের আভাষ পেলেই তারা গুলি চালাতে লাগলো—শট্ শট্ শট্!

সরোজদের জানা আছে, এই ধরণের বিপদের মুখে তারা আরো ক'বার পড়েছে, প্রয়োজন মত তারা জলের উপর বারেক মাথা তুলে নিঃশ্বাস নেয়, তারপরেই 'ক্রুল্' করে জলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। জলটা অসহনীয় ঠাণ্ডা, মনে হয় মাথাটা যেন বরফের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, শিরায় শিরায় গতিশীল রক্ত যেন ক্রমেই শুদ্ধ হয়ে জমে আসছে। সরোজ বার বার মাথা তুলে তুলে দেখতে থাকে। দু একটা গুলি তার এদিকে-ওদিকে জলে এসে পড়ে, তার মাথায় যে লাগে না, সেটুকু তার সৌভাগ্য বলতে হবে। টর্চের আলোর কতটুকুই বা বহর, দেখতে দেখতে তারা নাগালের বাহিরে চলে আসে। এবার আর মাথা ডোবাবার দরকার হয় না, একটু যেন স্বস্তি পায়। আর তাড়াহুড়া করে না, যতটা স্বচ্ছন্দে সম্ভব ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে।

অল্প কিছুদূর এসেই চোখে পড়ে কালো জলের বুকে আরো-কালো কি একটা জিনিষ যেন ভাসছে। জলজন্তু তো অমন হয় না, তবে ওটা কি? ভাঙ্গা পুলটারই একটি অংশ নাকি? যা হয় হোক, সরোজ এগিয়ে সেইটাকেই চেপে ধরলো। সেটা দুলে উঠলো, জলের বুকে নেচে উঠলো, কিন্তু ভেসে গেল না। সেটাকে পুলের একখানি বাহাদুরী কাঠ বলেই সরোজের মনে হোল, তা সে যাই হোক, সরোজ তার উপর উঠে বসলো। পরক্ষণেই তার কাণে এল—তুংচি!

—ফাতু!

—হ্যাঁ, ফাতু আর মাতাহারি।

—ডেভিড?

—তাকে তো এখনও দেখিনি।

—সে কি আসতে পারবে? না, এখান থেকে হাঁক দেব।

—হাঁক দিতে পারেন—নির্লিপ্তের মত ফাতু বললে।

সরোজ হাত দুখানি একত্র করে মুখের কাছে ধরে ডাকতে সুরু করলো—ডেভিড! ডেভিড!!

খুব জোরে না ডাকলেও দিগন্তবিস্তারী শূন্যতার মাঝে স্পষ্ট প্রতিধ্বনি উঠলো—ডেভিড! ডেভিড! অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে আবার সরোজ ডাকলো—ডেভিড!

বাহাদুরী কাঠখানি দুলে উঠলো; একটা জলের ঝাপ্টা এসে লাগলো সরোজের গায়, তারপরেই উত্তর হোল—তুংচি!

ডেভিড একটা ঝাঁকানি দিয়ে কাঠখানির উপর উঠে বসলো। ফাতু ওদিক থেকে জিজ্ঞাসা করলো—কে, ডেভিড এলো ?

—হ্যাঁ !

—বেশ, আমরা তাহলে চারজনেই রক্ষা পেয়েছি, সৌভাগ্য বলতে হবে। যাক্, তোমরা ভিজে জামা-কাপড়টা খুলে ফেল, নাহলে গায়ে জল বসে নিমোনিয়া হবে—

—এই ঠাণ্ডায় খালি গায় সারা রাত বসে থাক্‌তে হবে।

—তাতে শীত করবে, কিন্তু নিমোনিয়া তো হবে না !

সরোজ ও ডেভিড গায়ের জামা খুলে নিংড়ে গায়ের জল মুছে ফেললে। ঠাণ্ডা বাতাসের এক একটী ঝাপ্‌টা তাদের কাঁপিয়ে তুললে, বুকের ভিতরটা পর্যন্ত শির শির করতে লাগলো, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগলো।

—খুব শীত লেগেছে যে দেখি, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে,—ফাতু হেসে ওঠে বলে—যাক্ এ-শীত আর বেশীক্ষণ থাকবে না, এই নাও ধরো, বাইতে স্থরু কর ওপারের দিকে—

একখানি টেবিল্-টেনিসের ব্যাটের মত ছোট দাঁড় ফাতু সরোজের দিকে এগিয়ে দিলে। ডেভিডকেও দিলে আরেকখানি।

সরোজ বললে—এসব কি আমাদের জন্য এখানে তৈরী ছিল নাকি ?

—এগুলো আমাদের গেরিলা বাহিনীর ভেলা, সহজে তো আর ডোবে না, কোথাও থেকে ভাসতে ভাসতে এসে এই ভাঙা পুলের নীচে আটকে ছিল। এখন আমাদের দরকারে লাগলো।

—আমরা তাহলে ভাগ্যবান বলতে হবে !

—সে বোঝা যাবে আগে ওপারে গিয়ে পৌছাই তারপর।

ভেলা চলতে স্থরু করে। স্রোতের টানে দুলে দুলে ভেলা এগিয়ে যায়। ছপ্ ছপ্ করে চারখানি দাঁড় ওঠে আর পড়ে। ভাঙা পুলটীকে পাশ কাটিয়ে অন্ধকার নদীর বুকে ভেলাটী হারিয়ে যায়। কোন দিকে তট, স্রোতের মুখে কোনদিকে চলেছে, কিছুই ঠাহর হয় না, তথাপি ভেলা ঠেলার বিরাম নেই, চলতে হবে বলেই যেন ভেসে চলা, অন্ধকারময় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে মানুষের জীবনতরীর মত। কিছুক্ষণ দাঁড় টানার পর শীতের শির-শির ভাবটা কেটে যায়, সরোজ জিজ্ঞাসা করে—ঠিক যাচ্ছি তো ?

—ঠিক-বেঠিক কি আছে? সকালের দিকে ঠিক পৌঁছানো যাবে, তারপর তখনকার ব্যবস্থা তখন হবে!

তারপর ফাতু গল্প স্বরু করেঃ যেদিন থেকে সে সাম্যবাদীদের দলভুক্ত হয়েছে, বড়লোকদের অনাচার থেকে গরীবদের মুক্ত করার জন্য চাষা-ভূষাদের কল্যাণের ব্রত গ্রহণ করেছে, সেইদিন থেকে তার জীবনে স্বরু হয়েছে এই দুর্যোগ। প্রথমে চিয়াংয়ের দল দশ বছর ধরে তাদেরকে কুকুরের মত তাড়া করে বেড়িয়েছে, যেখানে তাদের পেয়েছে গুলি করে মেরেছে, ধরতে পারলে ফাঁসী দিয়েছে, এতটুকু দয়া দেখায় নি। তখনকার দিনে এমনি রাত্রির অন্ধকারে এই সব ভেলায় চেপে নদীর বুকে তারা অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াতো, যখন যেখানে গিয়ে পড়তো, তখন তেমন ব্যবস্থা হোত।

—ধরা পড়তো না কেউ?—সরোজ জিজ্ঞাসা করে।

—ধরা আবার পড়তো না, ক-তো। আমি নিজেই কতবার ধরা পড়তে পড়তে রয়ে গেছি। একদিন সকালে দেখি আমাদের এমনি তিন-চারিখানি ভেলার পিছনে চিয়াংয়ের নীল-পোষাকীর দল ধাওয়া করেছে। ভেলা ছেড়ে সব তো জলে লাফিয়ে পড়লেম, কে কোথায় যে গেল ঠিক নেই, আমি তো একখানি নৌকার নীচে ডুবে রইলাম সারাদিন। ওরা সারা নদী তোলপাড় করে ফেললো, কিন্তু নৌকার নীচে যে কেউ ডুবে থাকতে পারে, এ তারা কল্পনাও করতে পারে নি, আমি তো সে যাত্রা রক্ষা পেলেম। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন ডাঙ্গায় এসে উঠলেম, তখন আর দাঁড়াতে পারছি না। হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা এসে, একঘণ্টা ধরে পা দুটি মালিশ করি তবে উঠে দাঁড়াতে পারি।

একদিকে ভেলা ভেসে চলে, আর একদিকে চলে ফাতুর গল্প। সেই সব কাহিনী শুনতে শুনতে অবিরাম দাঁড় টানার পরিশ্রমটা আর কেউ অনুভব করে না, মন চলে যায় অন্যদিকে।

ফাতু বলে যায় তার জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনা, চীনদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ইতিহাস। ডাক্তার সান্-ইয়াং-সেন মুমূর্ষু চীনাজাতিকে জাগিয়ে তুললেন। তাঁর সাধনাকে সার্থক করে তোলার জন্য তখন তাঁকে যারা সাহায্য করছিল চিয়াং-কাই-শেক্ তাদের অন্যতম। ডাক্তার সান অনেক আশা করেছিলেন তার উপর, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই চিয়াং মন বদলে ফেললো। ডাক্তার সান চেয়েছিলেন গরীবদের মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্ন দিতে, বড়লোকদের অনাচার থেকে তাদের রক্ষা করতে, কিন্তু চিয়াংয়ের বেশী অন্তরঙ্গতা হোল বড়

লোকদের সঙ্গে, চীনদেশের নামকরা ধনী সুঙ্‌ বংশের মেয়েকে তিনি বিয়ে করলেন। তারপর যারা গরীবের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল, তাদের 'লালবিদ্রোহী' নাম দিয়ে দেশ ছাড়া করবার ব্যবস্থা করলেন। উনিশ-শো-সাতাশ থেকে সাঁইত্রিশ সাল পর্যন্ত তিনি এই 'লাল-বিদ্রোহীদের' পিছনে লেগে রইলেন, এদের দমন করার জন্য তিনি যে অর্থ অপব্যয় করেন তাতে চীনদেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য অনেক কিছু করা চলতো। মার্কিণ সাংবাদিক এডগার-স্নো সব হিসাব করে লিখেছেন 'এক একজন লালবিদ্রোহীকে খুন করার জন্য চিয়াং ষোল হাজার পাউণ্ড করে খরচ করেছে।'* সে তো আর আমাদের লোক নয় যে বাড়িয়ে বলেছে!

—মাথা পিছু ষোলহাজার পাউণ্ড! বল কি?—সরোজ বলে উঠলো।

—শুধু টাকার হিসাবটাই দেখছ, তবু মাথার হিসাবটা দেখনি,—ফাতু বললে—তার নীল কোর্তার দল এমন অত্যাচার সুরু করলে যে 'কিয়াংসি' অঞ্চলে একলক্ষ প্রজা ঘর ছাড়া হোল। তারা ঠিক করলে চীনের এমন কোন সুদূর প্রদেশে বাস করবে, যেখানে চিয়াংয়ের বিশেষ কোন কর্তৃত্ব থাক্‌বে না। শান্তিতে বাস করার জন্য একটি বছর ধরে চীনের বারোটী প্রদেশে তারা ঘুরে বেড়ালো, কিন্তু কোথাও 'নীল ফৌজ' তাদের সুস্থির হতে দিলে না। কারণে অকারণে নীল ফৌজরা তাদের আক্রমণ করতে লাগলো, আত্মরক্ষা করার জন্য আমাদেরও লড়তে হোল। শেষ পর্যন্ত ছ'হাজার মাইল পার হয়ে আমরা যখন 'য়েনানে' এসে পৌছলেম, তখন আমাদের পঞ্চাশ হাজার লোকের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে চিয়াংয়ের সঙ্গে জাপানীদের বিরোধ বেধে গেল তাই রক্ষা, নইলে আমাদের অদৃষ্টে আরো কত দুর্ভোগ ছিল কে জানে। চিয়াং তখন আমাদের ছেড়ে জাপানীদের দিকে মনোযোগ দিলে।

—তাহলে এখন আবার তোমরা চিয়াংয়ের সঙ্গে যোগ দিলে কেন?

—তার কারণ এখন দেশকে রক্ষা করাই বড় কাজ, দেশকে যদি আমরা রাখতে পারি, তবেই তো আমরা দেশবাসীর জন্য কাজ করতে পারবো।

—সে তো তোমরা চিয়াংকে বাদ দিয়েও করতে পারতে?

—না, তা পারতেম না। চিয়াংকে বাদ দিতে গেলে দেশের বড় লোকেরাও সরে দাঁড়াতো, যুদ্ধ চালাতে হলে যে টাকার দরকার সে টাকা তাহলে পেতেম না,

---

* এডগার স্নো'র লেখা Red star over China পঠিতব্য।

তাতে নিজেদের মধ্যে নতুন গোলযোগের সৃষ্টি হোত, ফলে জাপানীদের খানিকটা সুবিধা হয়ে যেতো। যেমন ভাবে তারা মাঞ্চুরিয়া দখল করেছে তেমনি অনায়াসে তারা পূর্ব চীনও দখল করে ফেলতো। *

—কিন্তু যুদ্ধ জয়ের পর যদি চিয়াং আবার তোমাদের সঙ্গে পূর্বের মত ব্যবহার করে, তখন্ ?

—সে আশঙ্কা নেই। এই যুদ্ধে গরীবদের তুলনায় বড়লোকের ক্ষতিই হচ্ছে বেশী। বড় বড় সহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড়লোকদের ধন-দৌলতও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কাজেই যুদ্ধ যখন শেষ হবে তখন এমন লোক অল্পই পাওয়া যাবে, যাদের জন্য চিয়াং আমাদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করবে, বরং আমাদের গেরিলাবাহিনীর সংস্পর্শে এসে আর জাপানীদের অত্যাচারে ততদিনে চীনের বেশীর ভাগ লোকই সমাজতন্ত্রী হয়ে যাবে। তখন আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে ওয়েউচাঙকে† দেশ বাসীর অপ্রিয়ভাজন হতে হবে।

ডেভিড জিজ্ঞাসা করলো—তুংচি, সেই লক্ষ-যাত্রীর মধ্যে তুমি তো ছিলে ?

—শুধু ছিলেম না, তাদের একটা দলের সমস্ত সুখ-সুবিধার দায়িত্ব ছিল আমার উপর—সে সব কথা লিখলে একখানি চমৎকার য়্যাডভেঞ্চারের বই লেখা যায়। তখনকার দিনের তুলনায় এখনকার এই গেরিলা যুদ্ধ কিছুই নয়।

—তাহলে সেই কাহিনীই বল—ডেভিড বললে—ওসব রাজনীতির চেয়ে সেই কাহিনী বেশী ভাল লাগবে।

—বেশ বেশ—বলে ফাতু সুরু করলো : একলক্ষ লোককে প্রতিদিন গড়ে কুড়ি মাইল করে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। তা'ও পাঁচ সাত দিন নয়,

---

* মাঞ্চুরিয়া দখল করার জন্য জাপেরা বহুদিন ধরে উৎসুক হয়েছিল। শুধু একটা হেতুর অপেক্ষা করছিল ; ইতিমধ্যে মাঞ্চু শাসক মার্শাল্ চ্যাংসুয়েলিয়াঙ্ জাপানীদের অভিসন্ধি খানিকটা বুঝতে পেরে চ্যাংসুয়েলিঙের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ রাখতে সুরু করলো। জাপেরা দেখলো আর বেশী অপেক্ষা করতে গেলে মাঞ্চুরিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কাজেই…১৮।৯।৩১ সালে জাপ পরিচালিত দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ান রেলপথে একটা বোমা ফাটলো, জাপানীরা বললে—'এই বোমা তাদের ক্ষতি করার জন্যই নিক্ষেপ করা হয়েছে।' বোমানিক্ষেপকারী দুষ্ট চীনাদের শিক্ষা দেবার জন্য জাপানী সেনারা মাঞ্চুরিয়া দখল করে বসলো। ১৯শ রুট আর্মির লালফৌজরা তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু চিয়াং তাহাদের সাহায্য করা দুরের কথা এতটুকু প্রতিবাদ পর্যন্ত করলো না। জাপানীরা মাঞ্চুরিয়া দখল করে নাম রাখলো মাঞ্চুকুও।

† কর্মচারী মহলে চিয়াংকাইসেককে বলতো 'ওয়েউচাঙ' অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট, আর সেনারা বলে 'চ্যাংসুয়েলিঙ' অর্থাৎ জেনারেলিসিমো।

একাদিক্রমে এক বছর। পাহাড় যদি বা পার হওয়া যায়, খাল-বিল, নদ-নদী পার হওয়া সহজ হয় না। তাও কি শুধু পথ চললেই হোল,—লক্ষ লোকের প্রতিদিনের খাবার চাই। তার উপর আবার ভুট্টার ক্ষেতে, বনের আড়ালে, পাহাড়ের উপর, পথের পাশে শত্রুসেনা অপেক্ষা করছে। রাত্রির অন্ধকারে হয় তাদের পাশ কাটাতে হবে, নাহলে মুখোমুখি লড়তে হবে। যা করে হোক এগিয়ে যেতেই হবে…

চারিপাশ থম্‌থম্ করছে। ফ্যাকাশে মেঘের ওড়নায় আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে, চাঁদ উঠেছে কিনা জানা যায় না, তারাও দেখা যায় না। চারিদিক শুধু অন্ধকার। এতটুকু হাওয়া নেই, ঝড় ওঠার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত। প্রকৃতি বিশ্বের বাতাসের লাগাম টেনে ধরেছে, সহসা রাশ ছেড়ে দেবে বলে। ভেলার চারখানি দাঁড়ের সামান্য ছলাৎ ছলাৎ শব্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ফাতু তার কাহিনী বলে যাচ্ছে: প্রচণ্ড শীতের রাত। শন্ শন্ করে ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে তুষারের ঝাপটা এসে লাগছে। এমন সময় কোথা থেকে ফস্ করে সন্ধানী আলো এসে পড়লো, তারপরেই পাহাড়ের আড়াল থেকে কট্‌কট্ করে গর্জে উঠলো মেশিন গান্—আর্তনাদ তুলে কতজন সেখানে লুটিয়ে পড়লো।…

সকলে তন্ময় হয়ে শুনছিল, আচম্বিতে কিসে যেন একটা বাধা পেয়ে ভেলাটী থরথর করে কেঁপে উঠলো। সরোজদের চমকে উঠার অবকাশ-টুকু না দিয়ে ফস্ করে চারিপাশ থেকে তাদের উপর কয়েকটি টর্চের আলো এসে পড়লো, পরমুহূর্তেই কজন শক্তিশালী লোক তাদের ভেলার উপর লাফিয়ে পড়ে তাদের চেপে ধরলো। চোখের নিমেষে সব ঘটে গেল, সরোজরা বাধা দেবার এতটুকু সময় পেল না।

আক্রমণকারীরা তাদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেললে, অন্ধকারে তাদের চিনতে পারা গেল না। তা না যাক্, তাদের হাতে বিপদের আশঙ্কা যে যথেষ্টই আছে তা সরোজরা বুঝলে।

ইতিমধ্যে একজন তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো, পিজিন্ ইংরাজীতে বললে—তোমরা ইংরাজ, না?

ফাতু তাড়াতাড়ি বললে—না, আমরা চীনা এবং ভারতীয়—

—একেবারে মিছে কথা বাপু, একেবারে মিছে কথা,—বলে লোকটী বিশ্রী ধরণে হেসে উঠলো,—এমন ফুট্‌ফুটে চেহারা তো বাপু এদেশের লোকের হয় না, ভারতবাসীরও হয় না, আমার ভয়ে তোমরা মিছে কথা বলছ—যাক্ সেজন্য কিছু

বায় আসে না। তোমাদের কাণগুলি দিব্যি ফুট্‌ফুটে, ওই কাণ চার জোড়া কেটে নিয়েই আমি তোমাদের ছেড়ে দোব—

চকিতে সরোজের মনে পড়ে গেল ইংরাজী-মাসিকে-পড়া চীনা বোম্বেটেদের কাহিনী, যারা শুধু লোকের সর্বস্বই লুঠ করে না, ছুটি করে কাণও কেটে নেয়। সেই কাণগুলি তারা মালার মত গেঁথে রাখে, সেইগুলিই হচ্ছে তাদের জীবনের গর্ব।

ফাতু বললে—দেখ, তুমিও চীনা আমিও চীনা, তোমার দেশের লোকের কাণ কেটে যদি তুমি আনন্দ পাও, আমার কাণছুটি কেটে নাও। কিন্তু এঁরা হচ্ছে বিদেশী বন্ধু, কমরেড চুটে এঁদের জীবনের নিরপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন, এঁদের কাণ কেটে নিয়ে সারা চীন দেশের কলঙ্ক রটিও না।

—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি স্বয়ং মহাপ্রভু শাক্যমুণি,— বলে লোকটী আবার কর্কশ হাসি হেসে উঠলো!

—আমায় তুমি শাক্যমুণি, যিশুখ্রীষ্ট যা খুসি বলতে পার। কিন্তু তোমার মধ্যে যদি এতটুকু দেশাত্ববোধ থাকতো, দেশকে যদি তুমি এতটুকু ভালবাসতে পারতে, তাহলে আমি যা বললেম তুমি তার অর্থ বুঝতে, এভাবে বিদেশীর কাছে দেশবাসীকে হেয় করার চেষ্টা করতে না, অন্ততঃ আমাদের দেশের এই ঘোর ছুর্দিনে···

—নিশ্চয় নিশ্চয়, আলবৎ, একশোবার। তোমার উপদেশগুলি একখানা কাগজে আমায় লিখে দিয়ে যাও, আমি অক্ষরে-অক্ষরে তা মেনে চলবো, কিন্তু তার আগে তোমাদের চার জোড়া কাণ তো কেটে নিই—লোকটির হাতে একখানি ধারালো ছোরা ঝক্ ঝক্ করে উঠলো। সেদিকে তাকিয়ে সরোজরা প্রত্যেকে অস্বস্তি বোধ করলো।

সরোজ বলে উঠলো—আমার কাণ ছুটি কেটে নেওয়ার আগে আমায় মেরে ফেল—

—বটে! তাহলে আমার নাম করবে কে, দেশ-বিদেশে আমার নাম ছড়াবে কেমন করে? যখনই তোমাদের কাটা কাণ দেখে লোকে জিজ্ঞেস করবে তখনই তোমরা আমার নাম করে বলবে 'পাইহো নদীতে চীনা বোম্বেটে চ্যাং-সোর হাতে পড়েছিলেম,' তবে তো লোকে আমায় জানবে!

—অতো যদি নাম জাহির করার সখ থাকে জাপানীদের কাছে গিয়ে জানাও-গে না তোমার নাম, সেখানে চালাকি চলবে না, যত ওস্তাদী এই ছুজন চারজনের উপরে—ডেভিড বলে উঠলো।

বোম্বেটে সর্দার বললে—আমার কাছে দুশো জাপানী কাণ আছে, দেখতে চাও ?

—যার তার কাণ দেখিয়ে বলবে জাপানী কাণ, আমরা চিনবো কেমন করে ? —ডেভিড বললে।

সরোজ বললে—যদি সত্যিই সব কাণগুলো জাপানীদেরই হয়, তাহলেও তুমি কি বলতে চাও সেগুলি তুমি লড়াই করে কেটেছ ? কোথায় কোন জাপানীর মৃতদেহ পড়েছিল, বাহাদুরী করে তার কাণ দুটি কেটে নিয়েছ।

—তোমরা কি বলতে চাও, জাপানীদের আমরা ভয় করি, তাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করতে পারি না ?

হাহা করে ফাতু এবার অট্টহাসি হেসে উঠলো, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললে—নিশ্চয়, কেন পারবে না, বাক্‌যুদ্ধে জাপানীরা নিশ্চয়ই তোমার কাছে হার মানবে !

বোম্বেটে সর্দার এবার ফাতুর দিকে ফিরে দাঁড়ালো, রুখে উঠে বললে—আমি মিছে কথা বলছি ? দেখিয়ে দেব আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে ?

—সেই হলেই তো সব চেয়ে ভাল হয়।

—বেশ, তারপরে তোমাদের কাণও কাটবো, নাকও কাটবো, তোমাদের মত লোকের নাকও কেটে নেওয়া উচিৎ !

ছোরাখানাকে কোমরবন্ধের যথাস্থানে রেখে সর্দার তার সঙ্গীদের হাউ হাউ করে কি কতকগুলো কথা বললে, আদেশ করছে বলেই মনে হোল। তার কথা শেষ হতে না হতেই, সরোজদের পাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা তাদের ছেড়ে চলে গেল। তাদের অনুসরণ করে সরোজ দেখলে, তারাও আরেকখানি ভেলায় ভাসছে, তবে সে-ভেলাটী সরোজদের তুলনায় অনেক বড়। আরোহীর সংখ্যাও অনেকগুলি। ক্ষিপ্র হস্তে তারা সরোজদের ভেলাটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিলে, তারপর দাঁড় টানার শব্দ হোল। সরোজদের ভেলার মোড় ঘুরে গেল, বোম্বেটেরা তাদের টেনে নিয়ে চললো আরেক দিকে।

সর্দার কিছুক্ষণ সরোজদের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে তার অনুচরদের কাজকর্ম, তারপর সরোজদের সামনেই বসে পড়লো।

ভেলা এগিয়ে চললো, ছল্‌ছল্‌ করে। ছোট ছোট দাঁড়গুলির ওঠা-পড়া ঘুম-পাড়ানী সঙ্গীতের মত জল-কল্লোল তুলতে লাগলো। সরোজরা হাত পা বাঁধা অবস্থায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইল।

এদিকে আকাশের বুকে মেঘের উপর মেঘ জমছে। লাল মেঘগুলি ঘন আঁধারকে কেমন-যেন বিবর্ণ করে তুলছে, মনে হয় এখনি যেন সব স্পষ্ট হয়ে আসবে, সামনে উপবিষ্ট সর্দারের নিষ্ঠুর রেখাঙ্কিত মুখখানি, ছোট ছোট ক্রূর দুটি চোখ এবার স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিদ্যুৎ ঝল্‌কে ওঠে, বার বার চোখকে ধাঁধিয়ে দেয় তার চম্‌কানি। বাতাস চঞ্চল হয়ে ওঠে, নদীর জলও যেন গুড় গুড় করে ওঠে। বোঝা যায় ঝড় উঠছে।

মাতাহরি এবার সাহস করে ডাকে—সর্দার, অ সর্দার !

—কী ?—সর্দার খিঁচিয়ে ওঠে।

—আমাদের হাতের বাঁধনগুলো খুলে দেবে ?

—না হলে পালাবার সুবিধা হবে কেন ? আমি বাঁধন খুলে দিই আর তোমরা টুপ্‌ টুপ্‌ করে নদীর জলে তলিয়ে যাও !

—জামাগুলো পরে নিতেম, বড় শীত করছে।

—শীতকালে অমন একটু শীত করে থাকে, ওসব পালাবার ফিকির আমি জানি। আগে জোড়ায়-জোড়ায় কাণ কাটবো, তার পরে যা করা যায় করা যাবে, তার আগে কিছু নয়। তাও করতেম, হ্যাঁ—যদি কিছু মোটামুটি পাবার আশা থাকতো, পকেট তো করে রেখেছ গড়ের মাঠ, একটা সেন্টেরও প্রত্যাশা নেই। তোমাদের আবার শীত গ্রীষ্ম কি ?

ডেভিড জিজ্ঞাসা করলে—সেণ্ট পেলেই তুমি আমাদের কথা শুনবে ?

—সেণ্ট মানে কি সেণ্ট ? ডলার চাই ডলার,—হাজার হাজার ডলার !

—তাই তোমাকে দেব, তুমি আমাদেরকে এক জায়গায় পৌছে দিতে পার ?

—কোথায় ?

—এই পাইহো নদীর তীরে বোধিধর্ম নামে অনেকদিনের পুরাণো এক মঠ আছে, জান ? সেইখানে—

—বেশ, নিয়ে যাব, তা টাকাটা কি নগদ দেবে, না ধার ?

—এখন তো আমাদের কাছে কিছুই নেই, সেখানে পৌছে......

হাহা করে সর্দার হেসে উঠলো, বললে—মতলব ফেঁদেছ বেশ, সেখানে একবার গেলে আমার এই কটা লোক কি আর মাথা নিয়ে ফিরে আসতে পারবে নাকি ! সেখানে এখন রীতিমত লড়াই চলছে—

বাতাসের এক প্রচণ্ড ঝাপ্‌টা বহে গেল, শোঁ শোঁ করে শিষ্‌ দেবার শব্দ শোনা গেল, সত্যই এবার ঝড় উঠলো। নদীর জল এবার ভাল করে দোলা

দেয়। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। ঝড়ের বেগ বেড়ে চলে উত্তরোত্তর। নদীর ঢেউ উত্তাল হয়ে ওঠে, ভয় দেখায় ভেলাটিকে ভেঙ্গে-চুরে এখনি যেন সে গ্রাস করে ফেলবে। ভেলার উপর—দেহের উপর দিয়ে ঢেউ চলে যায়, ভিজে জামাগুলি কোথায় ভেসে যায়। সর্দার উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে কি বলে, বোম্বেটের দল স্থিরভাবে ভেলা ঠেলে নিয়ে চলে সেই ঝড়ের মাঝে।

ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক দু'চোখ ঝল্‌সে দেয়। গুড় গুড় করে মেঘ গর্জে ওঠে অবিশ্রাম। কোন এক সময় বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি এমন ভাবে গায়ে এসে বেঁধে যে সহ্য যায় না। ঠাণ্ডা ফোঁটাগুলি মুখের উপর, গালের উপর, বুকের উপর এক একটী করে সূচের মত বিঁধতে থাকে। ঝড়ের ঝাপ্‌টা লেগে মনে হয় কেউ যেন চাবুক মারছে। চোখ চাইতে ভয় হয়। ঢেউগুলি যখন বহে যায় দেহের উপর দিয়ে অস্বস্তির মাঝে ক্ষণেকের জন্য স্বস্তি জাগে। মনে হয় গড়াতে গড়াতে জলে গিয়ে পড়ে, সূচিবিদ্ধ বৃষ্টির অসহনীয়তা থেকে রক্ষা পায়, কিন্তু প্রাণের মমতা বড় হয়ে দেখা দেয়; সামান্য অবলম্বনটুকু ছাড়তে ইচ্ছা করে না।

জলে ও বাতাসে মাতামাতি চলে। নীচের জল যেন উপরের মেঘ স্পর্শ করতে চায়, বাতাস তোলপাড় করতে চায় জলের নীচে। উপর থেকে মেঘ চোখ রাঙায়; তাদের আস্ফালন শাসনে রাখার আকাঙ্ক্ষায় বজ্র হেসে উঠে, বিদ্যুৎ করে উপহাস। তারা সকলে মিলে জগৎটাকে যেন ওলট-পালট করতে চায়। পৃথিবীর উপর তারা যেন বিরূপ হয়ে উঠেছে। মানুষের সব কিছু হিংস্র নিষ্ঠুরতা রক্ত-লোলুপতা তিলে তিলে যেন এতদিন ধরে তারা সঞ্চয় করে রেখেছিল, আজ সহসা একত্রে সেই সব পরিশোধ করতে তারা উন্মুখ। এই দয়াহীন ধরিত্রীর বুকে তারা শেষ যবনিকা টেনে দিতে চায়, ফিরে যেতে চায় সেই বিস্মৃত দিনের অতীত পৃথিবীর মাঝে।—ধরণীর বুকে যখন জল আর মাটি ছাড়া কিছু ছিল না, এমনি অন্ধকারকে ঘিরে জগৎ যখন মহাশূন্যে নীহারিকার পিছু পিছু ছুটে চলেছিল, মানুষ ও পশুর এতো ভীড় যখন ধরিত্রীর কালো মাটি আর নীল জলকে রুধির রঞ্জিত করে তোলেনি, সেই শুব্ধ নিরুপদ্রব আত্ম-সমাহিত গোলকের মাঝে সৃষ্টির আদিম যুগে ফিরে যাবার জন্য প্রকৃতি বুঝি আজ চঞ্চলা হয়ে উঠেছে, সুরু করেছে মৃত্যুর প্রলয় নাচন।

সরোজ আর সইতে পারে না। উপুড় হয়ে বৃষ্টি থেকে মুখখানিকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। বোম্বেটেগুলোর কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, হাতের দাঁড়

সমভাবেই ওঠে পড়ে,—পড়ে ওঠে, কিন্তু সেই দুর্যোগের মাঝে ভেলাদুটি সত্যিই এগুচ্ছে কি না ঠিক বোঝা যায় না।

সেই ঝড় জলের মধ্যেই ভেলা তীরে ভিড়লো। সরোজরা প্রথমে বুঝতে পারে নি, যখন তাদের ভেলাখানি হিড় হিড় করে বোম্বেটেরা পাড়ের উপর টেনে আনলে, তখন ঝাঁকানি খেয়ে সরোজরা জানলে তারা তটে এসে পৌছেচে। সর্দার সরোজের গায়ে পায়ের ঠোক্কর মেরে বললে—ওঠো!

একে একে ঠোক্কর খেয়ে সকলকেই উঠে দাঁড়াতে হোল, ঝড় কমে তখন মুষলধারে জল পড়তে সুরু হয়েছে। ফাতু জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যেতে হবে?

—আমাদের আড্ডায়। তোমাদের কাণ দুটি কাটার ব্যবস্থা করতে।

ডেভিড বললে—তবে যে তুমি তখন বললে জাপানীদের……

চ্যাংশো হেসে উঠলো, বললে—বলেছি বলে তাই করতে হবে নাকি, জাপানীদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যদি আমি মরি তাহলে তোমাদের কাণ কাটবে কে?

—তাহলে তখনই কাটলে পারতে?

—তখন কাটলে রক্তপাতের ফলে তোমরা মারা পড়তে, দেশে ফিরে গিয়ে তাহলে চ্যাংশো সর্দারের নাম করতো কে? আড্ডায় নিয়ে এলেম, এখানে ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা আছে, কাণদুটি কেটে নিয়ে ওষুধ লাগিয়ে রক্ত বন্ধ করে তবে তোমাদের ছাড়বো তো! ইংরাজিতে বলে না 'চ্যারিটি মাষ্ট বিগিন্ এট্ হোম্' —আমি তাই সব সৎকাজের অনুষ্ঠান বাড়ীতেই—মানে আমাদের আড্ডাতেই করে থাকি।—এবার চ্যাংশোর প্রাণখোলা হাসি সরোজদের বুক কাঁপিয়ে তুললো।

সরোজরা বারেক থম্‌কে দাঁড়ালো, সাইবেরিয়ার সীমান্তে এসে জারের বন্দীরা যেমনভাবে থমকে দাঁড়াতো। সামনের কালো পাহাড়ের ছায়া দৈত্যের মত হাঁ করে আছে, নদীতট নির্দেশ করে দিচ্ছে মৃত্যু-সীমান্তের। এই চীনা বোম্বেটের দল জারের শান্ত্রীর মত তাদের মার্চ করিয়ে নিয়ে চলেছে ওই মৃত্যুর প্রান্তরে। এর আগেও আরো কত জনকে ওরা এমনি ভাবে ধরে এনেছে, তারা কেউ সেখান থেকে কোন দিন ফিরেছে কি না কে জানে। কত ছেলে মেয়ে শিশু এইখানেই তাদের হাতে জগতের বুক থেকে শেষ বিদায় নিয়েছে। কতজন কেঁদেছে, ওই মানুষগুলোর পা'য় ধরে করুণা ভিক্ষা করেছে, কিন্তু দয়া পায়নি, বিনিময়ে হয়তো পেয়েছে নিষ্ঠুর ছুরিকার রক্তাক্ত স্পর্শ।

সহসা চ্যাংশোর এক ধাক্কা সরোজকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনলে, চ্যাংশো বললে—চলো!

সরোজ বলে উঠলো—টাকা দেব, টাকা! কত টাকা তুমি চাও?

বিদ্রূপের হাসি চ্যাংশোর মুখখানিকে বীভৎস করে তুললো, সরোজের কথার জবাব দেবার কোন প্রয়োজন সে বোধ করলো না, সরোজের কোমরবন্ধটা ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললো।

পথ বলতে কিছুই নেই,—এঁকে, বেঁকে, উঠে, নেমে, লাফিয়ে কোন রকমে শুধু অগ্রসর হওয়া। বৃষ্টিতে পাথর এমন পিছল হয়ে উঠেছে যে পা রাখা যায় না, আবার কোথাও বা এমনভাবে জলকাদা জমেছে যে পা পড়লেই পিছ্‌লে যায়, মচ্‌কে ওঠে, হাঁটু পর্যন্ত ব্যথা লাগে। কিন্তু তথাপি সেই ঝম্‌ঝমে বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারেই এগিয়ে যেতে হয়,—বন্দীর সুখ দুঃখের উপর কে কবে নজর রাখে! সরোজদের হিঁচ্‌ড়ে তারা টেনে নিয়ে চলে।

চলছে তো চলছেই। সরোজের মনে হয় সে যেন সারা জীবন ধরেই এই পথে চলছে—মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। শরীর ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে তথাপি চলার বিরাম নেই। অবসন্ন দেহের উপর বৃষ্টির জল যে পড়ছে, তাও যেন সে বুঝতে পারে না।

চলতে চলতে চড়াইয়ের শেষ সীমায় এসে তারা পৌছায়, সর্দার হাঁক দেয়—'হুঁসিয়ার!' সরোজ থম্‌কে দাঁড়ায়,—স্পষ্ট দেখতে পায় না, মনে হয় পথ এবার ঢালু হয়ে নামতে সুরু করেছে। নামবার জন্য পা বাড়ায়—

ঠিক সেই মুহূর্তে ফ্ল্যাশ-লাইট চমকে ওঠে বিদ্যুতের মতো, অপ্রস্তুত চোখগুলিকে ধাঁধিয়ে দেয়। চ্যাংশো সর্দার চীৎকার করে উঠলো—টিজেন—টিজেন—শত্রু! বিপদ ভাল করে উপলব্ধি করার আগেই ওদিককার আলোর পিছনে কট্ কট্ করে বন্দুক গর্জে উঠলো। শুয়ে পড়—বলে চ্যাংশো সর্দার সরোজের হাত ধরে মাটির দিকে আকর্ষণ করলে, সে আকর্ষণের বেগ সরোজ সামলাতে পারলো না, জলসিক্ত পিছল পাহাড়ের গা বেয়ে হড় হড় করে গড়িয়ে পড়লো নীচের দিকে। তবে পড়ার সময় সরোজ বোধ হয় প্রাণপণে সর্দারের হাতখানি চেপে ধরেছিল, ডুবন্ত লোক যেভাবে জলের উপর ভাসন্ত কুটোটি চেপে ধরে, সর্দারও সে বেগ সামলাতে পারলো না, সেও পিছলে পড়লো সরোজের সঙ্গে সঙ্গে।

পড়তে পড়তে চকিতে সরোজের মনে জাগলো মৃত্যুভীতি, কাণে এসে বাজলো বন্দুকের আওয়াজ। দেখতে দেখতে নীচের অন্ধকারে সে তলিয়ে গেল।

একটী অভাবিত মুহূর্তের আশঙ্কায় সরোজ চোখ বুঁজেছিল। নীচে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহটা থেঁৎলে পিষে কি যে হবে, সে কথাটা ভাবতেই সরোজের বুকের স্পন্দন থেমে আসছিল, দুর্বল চিত্তের লোক হলে এই মুহূর্তেই তার হার্টফেল করতো।

ছপ্ করে এসে পড়লো খানিকটা জলের মধ্যে, পড়েই দুটী ডিগবাজি। আঘাত যে একেবারে লাগেনি তা নয়, তবে যতখানি আশঙ্কা করেছিল তার শতাংশের একাংশও ঘটেছে বলে মনে হোল না। তুষারের মত ঠাণ্ডা জলে আপাদ মস্তক ভিজে যাওয়ায় বরং খানিকটা আরাম পেলে, আতঙ্ক আর উত্তেজনার উপর একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়লো।

একগলা জলে দাঁড়িয়ে সরোজ উপরে দৃষ্টি তুললে, ঢালু পাহাড়গুলি বরাবর উঠে গেছে চারিপাশে, মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড ইঁদারার নীচে এসে সে দাঁড়িয়েছে। চারিপাশ থেকে বৃষ্টির জল এসে জমেছে সেখানে।

সরোজ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল, কোন্ পথে উপরে উঠবে তাই ঠিক করছিল বোধ হয়, এমন সময় উপর থেকে পিস্তলের শব্দ কাণে এসে লাগলো। সরোজ আর কিছু না ভেবে উপরে উঠতে স্থরু করলে।

জলের প্রান্ত হতে সবে পা উঠিয়েছে এমন সময় কে তার পিছন থেকে এক টান মারলো, পিচ্ছিলতায় সরোজ সামলাতে পারলে না, গিয়ে পড়লো একেবারে তার গায়ের উপর। চ্যাংশো হেসে উঠলো, বললে—পালাচ্ছ কোথায়?

চ্যাংশো যে তার সঙ্গে আছে তা সরোজ ভুলেই গিয়েছিল, এবার বললে—চল, উপরে যাবে না?

—উপরে? নিশ্চয় যাব, তবে একটু পরে।

—একটু পরে কেন?

—আগে মারামারির প্রথম পর্বটা শেষ হয়ে যাক্ তারপর।

—জাপানীরা যে ততক্ষণে ওদের শেষ করে দেবে?

—তাতো দেবেই, দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় এইটাই তো স্বাভাবিক!

—আমরা নিশ্চিন্ত মনে এখানে চুপ করে বসে থাকবো?

—তা কি করবো? আমরা মানে তুমি আর আমি, দুজনে জাপানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে কতটুকু কি করতে পারি?

—তোমাদের দলের সবাই মরবে আর তুমি এখানে—

—তারা তো মরতোই একদিন, না হয় দুদিন আগেই মরলো, আমি নতুন লোক নিয়ে নতুন করে দল গড়বো।

এমন দলপতি সরোজ কোনদিন দেখেনি, স্তব্ধ হয়ে গেল। শেষে বললে—তোমার পিস্তলটা না হয় আমায় দাও, আমিই যাই।

—নেহাৎ যাবে, চল, তবে ওদিক দিয়ে নয় এদিকে এসো—

চ্যাংশো সরোজের হাত ধরে উল্টো পথ ধরলো।

সরোজ বললে—এদিকে ?

—হ্যাঁ, এইটাই পথ, ওদিক দিয়ে তুমি সাতদিনেও উপরে উঠতে পারবে না।

এক রকম গায়ের জোরেই চ্যাংশো সরোজকে টেনে নিয়ে চললো।

বৃষ্টি পড়ে পথ খুব পিছল হয়ে গিয়েছে সত্য, তবে তারই মধ্যে যতটা সম্ভব ক্ষিপ্র পদে তারা চড়াই ভাঙতে লাগলো।

খানিকটা ওঠার পর চ্যাংশো সরোজের হাতে একটু চাপ দিয়ে বললে—সাবধান! আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় সরোজ চারিপাশে তাকালো, অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারলো না।

চ্যাংশো বললে—পিস্তল চালাতে পার ?

সরোজ ঘাড় নাড়লে।

চ্যাংশো তার হাতে পিস্তলটি গুঁজে দিলে, বললে—সাবধান!

চ্যাংশো ছোট ভোজালীখানি হাতে নিয়ে একখানি পাথরের আড়ালে এসে থমকে দাঁড়ালো। সরোজ এইবার পাহাড়ের গায় পায়ের শব্দ শুনতে পেলে। শব্দটা যেদিক থেকে আসছিল ভাল করে ঠাহর করে দেখলে, উপর থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে ক'জন লোক নেবে আসছে, কালো ছায়াগুলি শুধু দেখা যাচ্ছে, মানুষগুলোকে চেনা যায় না।

সরোজ তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে চ্যাংশো সরোজের হাত ধরে টানলো, বললে—বসো—!

সরোজ বসলো।

অবরোহীদের পানে চোখ তুলে তারা বসে রইল। নামতে নামতে অবরোহীরা শেষে একখানি বড় পাথরের আড়ালে পড়ে গেল। কখন্ ওরা দৃষ্টি-পথে আবির্ভূত হবে তাই তারা প্রতীক্ষা করছে, এমন সময় হঠাৎ চ্যাংশো লাফিয়ে উঠলো। সরোজ চমকে উঠলো। ঠিক সেই অবসরে কে যেন তার

হাত থেকে এক ঝট্‌কায় পিস্তলটা ছিনিয়ে নিলে। সরোজ দেখলে কালো কালো ছায়াগুলি পিছন দিক থেকে তাদের আক্রমণ করেছে। সরোজ কি করবে প্রথমে ভবে পেল না। কিন্তু যখন একটি ধারালো বেয়নেট্‌ তার চোখের সামনে ঝক্‌মক্‌ করে উঠলো তখন সে আর স্থির থাকতে পারলো না। তার উপস্থিত বুদ্ধি ফিরে এল, ক্ষিপ্রপদে মুষ্টিযোদ্ধার কায়দায় একপাশে সরে গিয়েই সামনের ছায়াটির চোয়ালে এক প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিলে। সে ঘুরে পড়ে গেল, কিন্তু সে পড়তে না পড়তেই তার স্থানে এসে দাঁড়ালো আরেকজন। সে বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে আর একটু হলেই সরোজকে ধরাশায়ী করতো, সরোজ শুধু পূর্বমুহূর্তে তার আঘাতটা আন্দাজ করে নিয়েছিল তাই রক্ষা। সরোজ সরে গেল, নিজের আঘাতের বেগ সে নিজেই সামলাতে পারলো না, পড়ে গেল। সরোজ এ সুযোগ ছাড়তে পারলো না, তার বন্দুকটা কেড়ে নিলে। তারপর সামনে যাকে পেলে তারই মাথায় বসিয়ে দিলে বন্দুকের কুঁদোর এক ঘা। কিন্তু সরোজরা মাত্র দুজন, আর তারা যে কতজন অন্ধকারে তা ঠিক করে বোঝা মুস্কিল। এই অ-সম যুদ্ধ যে বেশীক্ষণ চলবে না, শেষ পর্যন্ত এতগুলি লোকের সঙ্গে তারা যে পারবে না, তা সরোজ বুঝতে পারলো কিন্তু তথাপি সে যুঝতে লাগলো।

—বুম্‌! বুম্‌!

কালো ছায়াগুলির মাঝে দুটি বোমা ফাটলো, ক'জন আহত হয়ে সেখানেই আর্তনাদ তুললো, বাকী সকলে উন্মত্তের মত সরোজদের আক্রমণ করলো, চীৎকার তুললো—তা-তাও জি-পান-জেন!—জাপানীরা ধ্বংস হোক!

—চ্যাং-হ্বা-মিন্‌-কুও!—পিছন থেকে কে সাড়া দিলে। সরোজ চমকে ফিরে তাকালো, চারিপাশে সকলের উদ্যত অস্ত্র তখন থেমে গেছে।

পিছন থেকে চ্যাংশো আবার বলে উঠলো—চ্যাং-হ্বা-মিন-কুও!

সকলে একসঙ্গে সাড়া তুললো—চ্যাং-হ্বা-মিন-কুও!

এতক্ষণ তবে কি অন্ধকারে শত্রু ভেবে তারা চীনাদের সঙ্গেই লড়াই করছিল? সরোজ বিমূঢ় হয়ে পড়লো।

অল্পক্ষণেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল: কাল স্কাউটের মুখে তারা খবর পেয়েছে যে জাপানীরা এই দিকে আসছে, তাদের প্রতিহত করার জন্য গেরিলা-বাহিনী নানা দলে বিভক্ত হয় এই পাহাড়ী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। রাত্রির অন্ধকারে সরোজদের জাপানীবাহিনীর অগ্রগামী দল মনে করে তারা আক্রমণ

করেছিল। আক্রমণের প্রারম্ভেই সরোজ আর চ্যাংশোকে নীচে নেমে যেতে দেখে তারা কজন তাদেরকে পাকড়াও করতে এসেছে।

চ্যাংশো বললে—ভাগ্যে দু'চারটি হাত-বোমা পকেটে ছিল, না হলে এতক্ষণে……

সরোজ জিজ্ঞাসা করলে—ওদিকে এখনও লড়াই চলছে নাকি?

—চলতে পারে, তবে পিস্তলের আওয়াজ যখন পাচ্ছি না তখন থেমেও যেতে পারে!

—ইস্ কি মারাত্মক ভুল!—সরোজ বলে উঠলো।

—আমাদের সকল দলের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখা তো সম্ভব হয় না, কাজেই এইভাবে তার মূল্য দিতে হয়।

—যাক্, ও সব কথা এখন থাক, আমাদের দলের ওদিকে কি হচ্ছে চল দেখিগে—চ্যাংশো বললে।

আহত সঙ্গীগুলিকে কাঁধে তুলে নিয়ে তারা অগ্রসর হোল।

যথাস্থানে যখন তারা এসে পৌছালো তার অনেক আগেই মারামারি থেমে গেছে, ডেভিড, ফাতু ও মাতাহারি তখন আহতদের ব্যান্‌ডেজ বাঁধতে ব্যস্ত।

প্রভাতী আলো আকাশের গায় ফুটে ওঠার আগেই পাহাড়ের কোলে এক গ্রামে এসে তারা পৌছালো। ছোট গ্রাম। পনেরো কুড়িখানির বেশী বাড়ী নেই। বাড়ী মানে, মাটির দেওয়ালের মাথায় খড়ে ছাওয়া একটি ছাদ। ঝড়-জলে মাঝে-মাঝে দেওয়ালের মাটি ধুয়ে গিয়ে কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। দেয়ালের পাশে বাড়ীর বাহিরে জঞ্জালের স্তূপ জমে আছে, তার পাশেই ছোটখাটো এক একটি ডোবা, তার পঙ্কিল জলের পানে তাকালে আর স্পর্শ করতে ইচ্ছা করে না।

যে বাড়ীটির মধ্যে তারা আশ্রয় নিলে, তার দাওয়া থেকে সামনের পাহাড়ে বার্চ আর পাইন গাছের বন চোখে পড়ে। তারই মাঝে ইতস্ততঃ বড় বড় রক্তাভ টাইগারলিলি ফুটে আছে। নীচের দিকে উপত্যকার শ্যামলিমা দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করে, ভুট্টা ও মটরশুঁটির খেত বাতাসে মাথা দোলায়।

সরোজ বললে—সামনের পানে তাকালেই আসামের উপত্যকার কথা মনে পড়ে—

—এবং এদেশের দারিদ্র্যের সঙ্গে কেবল ভারতবর্ষের তুলনা চলে—ডেভিড যোগ করে দিলে।

চ্যাংশো পাশে বসে ছিল, বললে—এদেশের সঙ্গে কোন দেশের তুলনা চলে না, ভারতবর্ষের সঙ্গে তো নয়ই। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ তার ইচ্ছামত চলার উপায় নেই, আমরা স্বাধীন দেশ আমরা ইচ্ছা করলে এই দারিদ্র্যকে জয় করতে পারতেম, কিন্তু তা করতে পারিনি, শুধু চিয়াংকাইশেকের জন্য। ডাক্তার সানের সে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল শুধু শাসন ক্ষমতাকে দখল করার জন্য।* তাঁর মৃত্যুর পর চিয়াং মত পাল্‌টে ফেল্‌লে, বড়লোকদের ঘরে বিয়ে করে পূরোদস্তর বড়লোক বনে গেল, গরীবদের পানে আর ফিরেও তাকালো না। যারা গরীবদের উন্নতির জন্য সামান্য কিছু করার চেষ্টা করছিল, তাদের কম্যুনিষ্ট নাম দিয়ে ধরে ধরে ফাঁসী দিয়েছে। নাহলে আজ আমাদের এমন অবস্থা হবে কেন? ইতিমধ্যে যে অবসর আমরা পেয়েছিলেম, চেষ্টা করলে তার মধ্যে এই দেশকে খুব ভালভাবেই তৈরী করা চলতো। কিন্তু চিয়াং তা চায় নি। 'সান-মিন-চু-আই' নীতির প্রতি সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তারই প্রায়শ্চিত্ত আজ করতে হচ্ছে আমাদের সকলকে…

—আর দেশবাসীর এই প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ নিয়ে তুমি দিব্যি ডাকাতি করে আর লোকের কাণ কেটে ঘুরে বেড়াচ্চ—ফাতু বলে উঠলো।

—তবে তোমরা কি ভাব চিয়াংয়ের জন্য আমি প্রাণ দোব, যাতে সুবিধা পেয়ে পরে আবার সে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে?—সে লোক আমি নই।

—কিন্তু সে তো এখন নিজের ভুল শুধ্‌রে নিয়েছে?

—সে জন্য যে সব অন্যায় সে করেছে তার গুরুত্ব কিছু কমেছে কি? ভুল করে তখন যাদের সে ফাঁসি দিয়েছে, চিয়াং মত পাল্‌টেছে বলে আজ কি আবার তারা ফিরে আসবে?

---

* ডাক্তার সানের পুরো নাম, সান ইয়াৎ সেন। এঁকে চীনের গান্ধী বলা চলে। দক্ষিণ চীনে 'মাকাও' অঞ্চলে গরীবের ঘরে এঁর জন্ম। হংকং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি প্রথম ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ডাক্তারীতে ভাল করে পসার জমানোর চেয়ে জাতির সেবাতেই ইনি জীবন উৎসর্গ করেন। কিন্তু দেশের সেবা করা সকল সময় সহজ কথা নয়, প্রাণ বাঁচাতে বেচারাকে শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগী হতে হোল, প্রথমে জাপানে, তারপর ইংলণ্ডে। এদিকে চীনদেশের মাঞ্চু গভর্মেণ্ট তাঁর মাথার জন্য লক্ষ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করলো। পুরস্কারের লোভে লণ্ডনে চীনা গুণ্ডারা তাঁকে ধরে লুকিয়ে রাখলো, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোল না। ১৯১১ সালে চীনারা মাঞ্চু রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করলো এবং ডাক্তার সানই হলেন তাদের নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট।

—তুমি তাহলে কি করতে বল ?—ফাতু জিজ্ঞাসা করলে।

—আমি বলি বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিয়াংয়ের আগে শাস্তি হওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে দেশের নেতারা আর কখনও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে সাহস না পায়।

—তাহলে এখন কাকে মেনে সবাই চলবে ?

—মানবার মত লোক অনেক আছে, দেশ নিজেদের মনোমত নেতা তৈরী করে নেবে।

—আর সেই অবসরে জাপানীরা এদেশে দিব্যি আসর জমিয়ে বসবে।

—হুম্—বলে রুক্ষ দৃষ্টিতে ফাতুর মুখের পানে একবার তাকিয়ে চ্যাংশো ঘৃণাভরে পায়ের কাছে একতাল থুতু ফেললে। তারপর জুতো দিয়ে সেখানে থুথুটা লেপ্টাতে লাগলো।

প্রথমে এমনিভাবে থুতু ফেলা দেখলে সরোজ অস্বস্তি বোধ করতো কিন্তু এদেশে কিছুদিন থাকার পর এরূপ ঘটনা তার চোখে সহে গেছে।

সরোজ জিজ্ঞাসা করলে— চিয়াংয়ের উপর তোমার এতো রাগ কেন বলত ?

—রাগ কি সাধে ? আমার বাড়ী-ঘর জালিয়ে দিয়েছে, আমার ভাই-বোনদের খুন করেছে, আমি শুধু একা বেঁচে আছি। আমাদের অপরাধ আমরা ম্যাডাম সানের দলে যোগ দিয়ে কয়েকস্থানে 'সান-মিন-চু-আই'* নীতির ব্যাখ্যা করেছিলেম মাত্র, সেই লঘু পাপে আমাদের উপর এই গুরু শাস্তির বিধান হয়েছে।

ডেভিড বললে- সাম্যবাদী হঠাৎ বোম্বেটে সর্দার হোল কেন ?

—আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে টাকা চাই। সেই টাকার জোগাড় করতে হলে আমাদের ডাকাতি করা ছাড়া আর উপায় কি আছে ?

—আদর্শকে সার্থক করতে পেরেছ একটুও ?

—পেরেছি কিনা, নিয়ে যাব তোমাদের, দেখবে—কমরেড্ চ্যাংশো বাজে কথা বলে না, চিয়াংয়ের মত আমরা নয়, ডাক্তার সানের আমরাই সত্যিকারের মন্ত্র-শিষ্য। পাছে জীবনে কখনও আদর্শ থেকে স্খলিত হয়ে পড়ি সেজন্য ডাক্তার সানের শেষ উইলখানি সব সময় কাছে রাখি এই দেখ,—বলে জামার বোতামগুলি

* ডাক্তার সান দেশের শাসন-কাজ চালাবার জন্য মোটামুটি তিনটি নীতির নির্দেশ দেন : প্রথমতঃ দেশবাসীকে জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে, দ্বিতীয়তঃ দেশে পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তৃতীয়তঃ প্রত্যেকটি লোকের অন্ন সংস্থানের সুব্যবস্থা করতে হবে—এই ত্রি-নীতি 'সান্-মিন্-চু-আই' নামে প্রসিদ্ধ।

খুলে গলায় ঝুলানো একটা চ্যাপ্টা তামার মাদুলি টেনে নিয়ে তার মধ্যে থেকে একটুকরো কাগজ বের করে সরোজদের চোখের সামনে মেলে ধরলো। চীনা ভাষায় তাতে কত কি ছাপা আছে, সরোজ বা ডেভিড তার একবর্ণও বুঝলো না, চ্যাংশো বললে—এতে কি লেখা আছে জানো : "চল্লিশ বছর ধরে আমার জাতির উন্নতির জন্য আমি সাধনা করেছি, আমার দেশবাসীকে আমি জগতের অন্যান্য জাতির সমকক্ষ দেখতে চাই। চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, এই জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি করতে হলে, এই জাতির বুকে সর্বাঙ্গীন জাগরণ ঘটাতে হবে।—সেই বিপ্লবের কাজ আমরা স্থরু করেছি, আমি বিশ্বাস করি আমার সহকর্মীরা আমার অবর্তমানে আমার নীতির উপর বিশ্বাস রেখে আমাদের আরব্ধ কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে কাজ করে যাবে··· তাদের প্রতি এই আমার শেষ অনুরোধ।"—আর এই অনুরোধ সব চেয়ে বেশী অবহেলা করছে তাঁরই অন্যতম সহকর্মী চিয়াং।* শুধু কি তাই, যারা ডাক্তার সানের এই স্বপ্নকে সার্থক করতে চেষ্টা করেছে তাদেরকেও সে সমূলে বিনাশ করেছে।

—চিয়াংয়ের উপর দেখছি তোমার জাতক্রোধ আছে!

—কেন থাকবে না, আমার ভাই তো মুখ্যু ছিল না—ক্যান্টন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ; সর্বস্ব সে ত্যাগ করেছিল দেশের জন্য, আর' তাকে কোথায় কি ভাবে খুন করলে আমরা জানতেও পারলেম না।

চ্যাংশো খানিক চুপ করলে, ভাইয়ের কথা মনে হওয়ায় তার মন বিষণ্ণ হয়ে উঠলো বোধ হয়।

---

* ১৯২৬ সালে ডাক্তার সানের মৃত্যুর পর চিয়াং-কাই-শেক তাঁর স্থান দখল করেন। চিয়াং যখন জাপানে সামরিক কলেজে পড়তেন, তখন সেখানে ডাক্তার সানের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, এবং জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি 'কুওমিনটাং' দলভুক্ত হন। বিপ্লবের পরে ১৯১১—১৬ সালে কয়েকটি ছোট-খাটো যুদ্ধে ইনি কৃতিত্ব দেখান, এঁর মধ্যে বিশেষ সম্ভাবনা আছে দেখে ডাক্তার সান এঁকে রুশিয়ায় পাঠান। সেখানে ছ'মাস থেকে সে-দেশের উন্নত শাসন প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করে ইনি দেশে ফেরেন এবং চীনাদের সামরিক শিক্ষা-প্রণালী উন্নত করেন।

ডাক্তার সানের মৃত্যুর পর চিয়াং সহসা মত বদলে ফেলেন, এবং দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতির জন্য যারা চেষ্টা করছিল তাদের 'লাল বিদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে 'নীল-পোষাকী' দল গঠন করেন। তারপর ১৯২৭—৩৭ দশ বছর ধরে সারা চীনদেশে এই সব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং শত সহস্র দেশপ্রেমিকের জীবন-নাশের কারণ হন।

ওদিকে শুঁট্‌কী মাছ রান্নার গন্ধে স্থানটি এমন আমোদিত হয়ে উঠলো যে, সরোজদের সেখানে বসে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠলো, সরোজরা উঠে পড়লো।

চ্যাংশো জিজ্ঞাসা করলে—উঠলে যে, চিয়াংয়ের নিন্দা সইতে পারছ না বুঝি?

সরোজ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—না না সেজন্য নয়, এই মাছের গন্ধ!

চ্যাংশো সেকথা বিশ্বাস করতে পারলো না, মুখখানি পেঁচার মত গম্ভীর করে বললে—হুঁ, বুঝেছি!

ডেভিডের হাত ধরে সরোজ স্থান ত্যাগ করলো।

সবেমাত্র খেতে বসেছে। অবশ্য সরোজ আর ডেভিডের খাবার আয়োজন তেমন বিশেষ কিছুই নয়—ফ্যানভাত আর একটু নুন। আর সবাই পোড়া-শুঁট্‌কীমাছ আর ভাতের গ্রাস মুখে তুলছে। এমন সময় কাছাকাছি বোমা বিস্ফোরণের শব্দ কানে এল—বুম্ বুম্ বুম্!

আওয়াজ যেন আর থামতেই চায় না। সকলে ভাতের থালা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কতক্ষণ পরে কত আশা করে দুটি ভাত তারা মুখে দিয়েছে, সেই মুখের গ্রাস ছাড়তে বিশেষ কারুর আগ্রহ দেখা যায় না।

বাহিরে এসে সবাই আকাশের পানে তাকালো: আকাশ পরিষ্কার, সূর্যের ধারালো আলোয় দু-একটা মেঘের টুকরো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। সবাই চারিপাশে তাকায়। যতদূর পর্যন্ত চোখ যায় জনমানব চোখে পড়ে না। অথচ বুম্ বুম্ করে বিস্ফোরণ হতেই থাকে, স্থানে স্থানে মাটী ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে, মনে হয় যেন এক একটি আগ্নেয়গিরির মুখ ক্ষণেকের জন্য অগ্নি উদ্গার করেই থেমে যাচ্ছে।

বুম্ম্—ওদিকের একখানি বাড়ীর চালা ঘুরতে ঘুরতে আকাশে উঠে গেল।

বুম্ম্—সেদিকের পাহাড়ের একটা খণ্ডাংশ ধ্বসে পড়লো।

বুম্ম্—এদিকে একটা পাইন গাছকে ঠেলে ফেলে দিয়ে মাটি ছুটে গেল মেঘকে ছুঁতে।

সরোজ বলে উঠলো—ডিলেড-বোম্‌স্ (delayed bombs) কাল রাত্রে কোন এক সময় এগুলো এখানে ফেলে গেছে, এখন ফাটছে।

—কিন্তু কাল তো আমরা কোন প্লেনের শব্দ পাইনি—একজন চীনা বলে উঠলো।

—সব প্লেনেরই তো আর বেশী শব্দ হয় না, এমন প্লেনও আছে একটু উঁচু

দিয়ে গেলে নীচেকার লোক তার কোন শব্দই পাবে না, শব্দধারক যন্ত্র তো সেই জন্যই বেরুলো।

—এসব তো জার্মানদের রণ-নীতি কৌশল বলেই জানতেম, জাপেরা এসব জিনিষ কি করে আয়ত্ত করলে—মাতাহারি জিজ্ঞাসা করলে।

—জার্মানরা এসব জিনিষ হয়তো ধার দিয়েছে—সরোজ বললে—যেমন রুশিয়া তোমাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ধার দিচ্ছে।

ফাতু বললে—এখন ধার দিচ্ছে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ষ্টালিন কি করবেন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

—কেন ?—মাতাহারি জিজ্ঞাসা করলে।

—ষ্ট্যালিনকে বোঝা ভারী শক্ত—ফাতু বললে—নাহলে যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করে নাম করেছিল, সেই রাইকোফ, বুখারিণ, জিনেভিয়েভ, ক্যামেনিয়েফ্, মার্শাল তুখাচেভ্স্কি,—প্রত্যেকেরই প্রাণদণ্ড হোল। ষ্ট্যালিন ইচ্ছা করলে তাদের বাঁচাতে পারতেন কিন্তু বাঁচলেন না।*

—তুমি কি বলতে চাও ?

—আমি বলতে চাই যে তাদের জনপ্রিয়তা সইতে পারলেন না বলেই ষ্ট্যালিন তাদের বাঁচতে দিলেন না।

—কোন অপরাধ না থাকলে দেশবাসীরা কি এই ব্যাপার চুপ করে দেখতো ?

—না দেখে উপায় কি ? সাধারণ লোকেরা একটি কথা বললেই তাদেরকে

* লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মীদের মধ্যে ষ্ট্যালিন ক্রমশঃ রাষ্ট্রের সর্বৈব ক্ষমতা করায়ত্ত করেন এবং নিজের সর্বময় কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ট্রট্স্কিকে নির্বাসিত করেন। তারপর ১৯৩৬-৩৭শে পর পর তিন দফা বিচারে কম্রেড্ লেনিনের সহকর্মী রুশিয়ার কয়েকজন বিশিষ্ট জননায়কের প্রাণদণ্ড হয়। ১৯৩৬এর আগষ্ট মাসে কমুনিষ্ট নেতা জিনেভিয়েভ্ ও ক্যামেনিয়েফ্য়ের নামে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগে বলা হয় যে তাঁরা ষ্ট্যালিনের উচ্ছেদ করার জন্য ট্রট্স্কির সহযোগিতায় জার্মাণীর নাৎসি-দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। বিচারে তাঁদের প্রাণদণ্ড হয়। ১৯১৭এর ফেব্রুয়ারী মাসে লেনিনের আর দুজন বিশিষ্ট সহকর্মী রাইকোফ্ ও বুখারিণকে ওই একই অপরাধে অভিযুক্ত করে মৃত্যু-ব্যবস্থা করা হয়। ওই বছরেই মে মাসে মার্শাল-তুখাচেভ্স্কি ও লালফৌজের উচ্চপদস্থ আর সাত জন সেনাপতিকে অভিযুক্ত করা হয়, তাঁরা নাকি সোভিয়েট শাসন-তন্ত্রের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে জার্মান সেনানায়কদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিলেন। এঁদের বিচার হয়েছিল প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। এঁদের গুলি করে মারা হয়।

এই বিচারগুলি 'মস্কো-বিচার' নামে খ্যাত।

তখনি বন্দী-শিবিরে পাঠানো হবে, তারপর সেখানে 'অগ্‌পু' পুলিশের অত্যাচারে হয়তো একদিন এই পৃথিবী থেকেই বিদায় নিতে হয়।

—রুশিয়ার কালো দিকটাতেই আপনি বেশী জোর দিচ্ছেন কমরেড, তার তো একটা ভালো দিকও আছে। তারা দেশের দারিদ্র্যকে জয় করার জন্য, সংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য শতকরা একশো জনকেই শিক্ষিত করে তুল্‌ছে, অপরাধীদের নৈতিক উন্নতির জন্য জেলখানার সংস্কার করেছে···

—তা জানি, কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছে 'অগ্‌পু' গুপ্তচরদের অত্যাচার।

সরোজ হেসে বললে—রুশিয়ায় আমরা কখনও যাইনি, কাজেই সেখানকার ব্যাপার নিয়ে বইপড়া বিদ্যেতে তর্ক চালাতে আমি চাইনা, তাতে শুধু মাথা গরমই সার হবে।

ডেভিড বললে—তার চেয়ে আমরা এখন যথাস্থানে ফিরে গিয়ে আহার শেষ করিগে।

সকলে ফিরে এল।

তখনও এখানে সেখানে বিস্ফোরণের শব্দ কাণে আসছে।

সরোজ বললে—এতো বিস্ফোরণ হচ্ছে, কিন্তু কোন বাড়ী থেকে একটি লোকেরও সাড়া পাওয়া গেল না।

—এর কোন বাড়ীতে একটাও মানুষ আছে নাকি,—চ্যাংশো বললে—তিনদিন ধরে এখানে অবিরাম 'এয়ার-রেড্‌' হচ্ছে, যারা ছিল সব প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে।

এই সময় একটি লোক এসে খবর দিলে—জাপানীরা আসছে!

লোকটী চ্যাংশোর দলের। চ্যাংশো জিজ্ঞাসা করলে—কি করে জানলে?

—একটা গাছে উঠে দেখছিলেম উত্তরের ওই পথটা দিয়ে অনেক লোক আসছে। জাপানী সৈন্য বলেই যেন মনে হোল।

—কত লোক হবে?

—হাজার হাজার!

—কামান?

—কামান-টামান বিশেষ নজরে পড়লো না, তবে কালো-পোষাক-পরা সৈন্য অনেক—

—কালো-পোষাক-পরা জাপানী সৈন্য?—ফাতুর ভ্রূ দুটি কুঁচকে উঠলো, বললে—চল তো আমি একবার দেখে আসি—

চ্যাংশো বললে—না না, তোমাকে যেতে হবে না আমিই যাচ্ছি।

সরোজ বললে—একটা বাইনোকিউলার নিয়ে গেলে হোত না?

চ্যাংশো মৃদু-হেসে বললে—পাবো কোথায়?

স্কাউট্‌টার সঙ্গে চ্যাংশো বেরিয়ে গেল।

ফাতু বললে—কালো পোষাক-পরা কখনো জাপানী সৈন্য হতে পারে না, ওরা নিশ্চয়ই চীনা।

ফাতুর কথাই ঠিক, তারা চীনাই বটে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে চ্যাংশো বললে—ওরা জাপানী নয়, চীনা।

—সৈন্য?—ফাতু জিজ্ঞাসা করলে।

—ঠিক বুঝলেম না, তবে আর অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা এসে পড়বে, তখন সব জানা যাবে।

কালো মেঘ যে ভাবে আকাশ ছেয়ে ফেলে, তেমনি ভাবে গ্রাম-প্রান্তর কালো পোষাকে ভরে উঠলো।

হাজার হাজার নরনারী।

বৃদ্ধ লাঠি নিয়ে চলেছে।

যুবকেরা পিঠে জিনিষপত্র বেঁধেছে।

মেয়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পিঠে বেঁধেছে, কাঁধে নিয়েছে।

বালক বালিকারাও দলে আছে অনেক।

সকলেরই মুখ মলিন, অনাহারে চোয়ালের উঁচু হাড়গুলি আরো উঁচু হয়ে উঠেছে। ভয়ে তেরচা চোখগুলি বিহ্বল বিস্ফারিত হয়েই আছে। পীতাভ মুখগুলি শ্রান্তিতে অধিকতর বিবর্ণ, ছেলেমেয়েগুলি ধুঁকছে, মুখে তাদের কথা নেই, চেঁচামেচি ছুটোছুটি যেন তারা ভুলে গেছে।

চ্যাংশো তাদের জিজ্ঞাসা করলে—তোমাদের সর্দার কে?

রুক্ষভাবে একজন জবাব দিলে—সর্দার কেউ নেই, আমরাই আমাদের সর্দার!

—তা এভাবে তোমরা বাড়ীঘর ছেড়ে চলেছ কোথায়?

—বাড়ীঘর ছেড়েছি কি সাধে? সাতদিন ধরে বোমা পড়লো, গাঁয়ের একখানি বাড়ীও আস্ত নেই। আমরা সব বনে পালিয়ে গিয়েছিলেম সেখানেও বোমা, সারা বনে শেষে আগুন ধরে গেল, আমাদের কতজন যে মারা পড়লো… একটা বোমা এনে পড়লো, আমার বোনকে আর খুঁজে পেলেম না…

—আমার ছেলে,…পাশ থেকে একটি মহিলা বলে উঠলো।

—আমার ভাই,···আরেকজন যুবক বললে।

—আমার বাড়ীর উপর তিনবার বোমা পড়েছে, আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই।

—আমার স্বামী আর একটি ছেলে···

—আমার বাবার মাথায় একটা জ্বলন্ত গাছ উপ্‌ড়ে এসে পড়লো···

চ্যাংশোকে ঘিরে সবাই একটা সোরগোল তুললো।

তারা একটু শান্ত হ'লে চ্যাংশো বললে—সেইজন্য তোমরা এখন চলেছ? তা যাচ্ছ কোথায়?

—বরাবর পশ্চিমে চলেছি, শুনেছি ওদিকে তিব্বতদেশ, সেখানে নাকি লড়াই হচ্ছে না।

—সে এখান থেকে কত মাইল জানো? শেষ পর্যন্ত সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবে তো?

—না পারলেও যেতে হবে, এখানে বোমা খাওয়ার চেয়ে সে অনেক ভাল। হয়তো একটু কষ্ট হবে, কিন্তু এমনভাবে প্রাণ নিয়ে ছুটোছুটি করতে হবে না তো!

—তবু তোমরা লড়বে না!

—কি করে লড়বো আমাদের একটা বন্দুক পর্যন্ত নেই আর উপর থেকে মাথায় টুপটুপ করে বোমা পড়ছে, এ কি হাতাহাতি লড়াই যে লড়বো?

—লড়বে না?

—না।

—এই সব আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে না।

—সে প্রতিশোধ নিতে হলে আগে তোমাদের সঙ্গেই আমাদের লড়াই করা উচিত। নিজেদের স্বার্থের জন্য তোমরা জাপানীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছ, তার জন্য আমরা বোমা খেয়ে মরবো কেন?

—তার মানে?

—তার মানে তোমাদের দুষ্ট মতলব আমরা সব জানতে পেরেছি। জাপানীরা তোমাদের সব খবর আমাদের জানিয়ে দিয়েছে!

ফাতু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কি করে জানালে?

—কেন, ছাপানো কাগজ সব বিলি করে গেছে এরোপ্লেন থেকে—

—কই দেখি? কার কাছে আছে সেই কাগজ বের করতো?

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে একখানি কাগজ দিলে। ফাতু এক নিঃশ্বাসে কাগজখানি পড়ে ফেললে, তাতে চীনাভাষায় লেখা :

চীনা ভাই বোনেরা !—

তোমাদের সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব করতে চাই। তোমাদের দুঃখ ও দারিদ্র্যকে আমরা শেষ করতে চাই। তোমাদের মধ্যে যারা বেকার তাদের আমরা কাজ দিতে চাই। তোমাদের মধ্যে যারা রুগ্ন তাদের আমরা বিনা ব্যয়ে ঔষধ-পথ্য দিতে চাই। যারা আহার পাও না তাদের আমরা খেতে দিতে চাই। তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চাই। আমরা চাই চীন ও জাপান মিলিত হয়ে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ জাতি গড়ে উঠুক। ধর্ম ও শিক্ষায়, আচারে ও ব্যবহারে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমরা একই জাতির বংশধর, আমাদের ঘনিষ্ঠভাবেই বাস করা উচিত। আমরা তোমাদের ভাল করতে চাই, তোমাদের দেশের নেতারা তা করতে দেবে না। এদের তোমরা ভাল করে চিনে রাখো, এদের মিথ্যা কথায় ভুলো না। ইতি—

জাপানী জনগণের পক্ষ থেকে প্রধান মন্ত্রী—
প্রিন্স কনোয়ে।

ফাতুর হাত থেকে কাগজখানি টেনে নিয়ে চ্যাংশো ফরফর করে ছিঁড়ে ফেললে, তারপর চীৎকার করে উঠলো—এই জন্যই তোরা পালাচ্ছিস, না ? ভীরু কাপুরুষের দল, আমরা নিজের জন্য লড়ছি ? কোথাকার কোন বিদেশী এসে জুতোর ঠোক্কর মারবে, মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে, মা বোনকে অপমান করবে, তারা হবে তোদের আপনার লোক ! আর যারা জীবনভোর তোদের ভাল করার জন্য, তোদের সুখী করার জন্য প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছে তারাই হোল কিনা তোদের শত্রু ! মূর্খ বুদ্ধিহীনের দল, জাপানী খুনীগুলোর কথা তোরা বিশ্বাস করবি আর নিজের দেশের লোকের কথা বিশ্বাস করবি না ? চুটের চেয়ে প্রিন্স কনোয়ের কথাই তোদের কাছে বড় হোল ? যা যা, তোরা শিগ্‌গীর আমার সাম্‌নে থেকে চলে যা—

অগ্রবর্তী দু-তিনজন বলে উঠলো—যতই কেন চোখ রাঙাও আমরা লড়বে না !

—কী ? আবার কথা ! তোদের প্রত্যেককে আমি গুলি করে এইখানে খুন করবো, শিগ্‌গীর সরে যা আমার সাম্‌নে থেকে, যা—যা—যা—

চ্যাংশো এবার সত্যই পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো। সামনে যারা দাঁড়িয়ে ছিল হতচকিত হয়ে সভয়ে তাড়াতাড়ি খানিকটা পিছু হটে গেল।

জনতা কিছুক্ষণ চ্যাংশোর মুখের পানে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তারপর জনতার শেষের দিক থেকে অনেকের সাড়া উঠলো—চলো, চলো, আমরা যাই—

জনতা এবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেলে, আবার সামনের দিকে অগ্রসর হোল। ক্লান্ত চরণে আবার ছন্দ-বদ্ধ গতি ধরা পড়লো একটির পর একটি পদক্ষেপে।

সরোজরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। জনতা ধীরে ধীরে তাদের পার হয়ে চলে গেল। বংশ পরম্পরায় যে-মাটিকে তারা ভালবেসেছে, সামান্য একটু ধান জমি, শতজীর্ণ একখানি কুটির যে মূল্য নিয়ে এতদিন তাদের চোখে ধরা দিয়েছিল তার মায়া আজ তারা ছেড়েছে, তার চেয়ে বেশী মূল্যবান প্রাণটুকু বাঁচাবার জন্য।

চ্যাংশো করুণার চোখে অনেকক্ষণ তাদের চলে যাওয়ার পানে তাকিয়ে রইল তারপর হতাশ কণ্ঠে বলে উঠলো—এরাই আমার দেশবাসী, এদের জন্যই প্রাণপণ লড়ছি, অথচ এরাই আমাদেরকে শত্রু বলে মনে করে। এরা অশিক্ষিত, ভীরু, অসহায়, নিজেকে চেনে না, নিজের দেশকে জানে না, রাজনীতি পড়েনি—এই সব ভেড়ার পাল নিয়েই আমার দেশ। জাপানীরা এদের উপর অত্যাচার করবে, উৎপীড়ন করবে, শোষণ করবে, যুগযুগ ধরে এদের পশু করে রাখবে?—না না, তা হয় না, এদের উদ্ধার করতেই হবে, এদের মানুষের মত বাঁচার অধিকার চাই! সারা চীনকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, শক্তি চাই--শক্তি চাই!

চ্যাংশো দুহাত দিয়ে বুকখানা চেপে ধরলো, তারপর এমন ভাবে সেখানে পদচারণা স্থুরু করলো যেন তার বুকের মধ্যে অত্যন্ত যাতনা হচ্ছে।

ফাতু তার পাশে গিয়ে তার কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে বললে—এত ক্ষুব্ধ হচ্ছ কেন কমরেড? আমরা সবাই যে আজ একসঙ্গে লড়বো, তোমার একার শক্তির অভাব হয়, আমরা সবাই তো আছি। এই দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এমন আগুন আমরা জালিয়ে তুলবো, যে আগুনে অহংকারী জাপান পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের একটা ক্ষুদ্র জাতকে জগতের শুভ ও শান্তির জন্য পৃথিবীর বুক থেকে আমরা অবলুপ্ত করে দোব।

—তা আর হবে না কমরেড, ও শুধু আমাদের স্বপ্ন—চাংশো বললে—

—জাপানীদের বিতাড়িত করতে হলে টাকা চাই,—কামান কিনতে হবে, গুলি গোলা কিনতে হবে, এরোপ্লেন কিনতে হবে—কে দেবে আমাদের সে টাকা? জাপানীদের পরাজয়ের পরেও টাকা চাই, দেশে নতুন করে কল-কারখানা ক্ষেত-খামারের পত্তন করতে হবে—সেই টাকাই বা আমরা পাব

কোথায় ? লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা চাই, কোথায় পাব,—কে দেবে ! আমাদের কোন আশা নেই, আমরা অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেছি ।

—এখনকার প্রয়োজন মেটাবার মত টাকা যদি আমিই দিই—ডেভিড বলে উঠলো ।

—তুমি ?—সুরোজ বিস্ময়ে তার মুখের পানে তাকালো ।

—হ্যাঁ আমিই ।

—তুমি টাকা কোথায় পাবে ?

—যেখান থেকেই পাই, দিলেই তো হোল !

—পাঁচ-সাত লাখ ডলার দিতে পারবে ?—চ্যাংশো জিজ্ঞাসা করলে ।

—মনে তো হয় পারবো ।

—কোথায় আছে সে টাকা ?

—সে কথা পরে হবে ।

—বেশ !

শান্ত ও সংযত কণ্ঠে সংক্ষেপে 'বেশ' কথাটা উচ্চারণ করলেও সকলের অলক্ষ্যে চ্যাংশোর চোখ দুটি বারেকের জন্য শিকারী বিড়ালের মত জলে উঠলো। সে চোখ নজরে পড়লে ডেভিড চমকে উঠতো ।

সেইদিনই সরোজরা চ্যাংশোর আড্ডায় এসে পৌছলো ।

পাহাড়ের মাথায় একটি মঠ। কেল্লা বললেও চলে। চারিপাশে অনেকখানি জায়গা পাথরের পুরু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে একখানি বহুদিনের পুরানো পাথরের বাড়ী এবং চারিপাশে মাঠ ও বাগান ।

চ্যাংশো সব ঘুরে ঘুরে দেখায় : পাঁচিলের কোনখানে মেশিন-গান রেখেছে …কোথায় কোথায় পাহারা থাকে…ছাদের উপরে উঠলে দূরে আকাশের প্রান্তে সাগরের ধূমেলতা চোখে পড়ে…কিছুই আর দেখাতে বাকী থাকে না ।

শেষে বললে—জাপানীরা এই দিকেই এগিয়ে আসছে। এই গড় তারা বোমা মেরে বিধ্বস্ত করে দেবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটার আগে, আমরা যদি কয়েকটা বোমারু প্লেন্, প্লেন্-মারা কামান, আর খান দুই ডুবো-জাহাজ পাই, তাহলে এইখান থেকে জাপানীদের আমি এমন আঘাত করতে পারবো যে তারা সহজে আর এগুতে সাহস করবে না। এখনও হাতে টাকা পেলে সে ব্যবস্থা করা যায়, তোমরা যে টাকার কথা বলেছিলে…

ডেভিড বললে—বেশ, টাকার জোগাড় হয়তো আমি করে দিতে পারবো, কিন্তু একটা কথা কমরেড ··

—কী?

—সাব্‌মেরিনে লড়াই করার আকাঙ্খা আমাদের অনেকদিনের। একখানি সাব্‌মেরিন আমাদের দু'জনের জন্য চাই।

—টাকা হলে সব হবে—চ্যাংশো বললে—আগে টাকার ব্যবস্থা কর দিকি—

শুভস্য শীঘ্রং—খাওয়া-দাওয়ার পর সেই রাত্রেই বৈঠক বসলো। ডেভিড বললে—কমরেড্ ফুসানের চিঠির কথা তোমাদের মনে আছে, সেই চিঠির রহস্য আমি ভেদ করেছি, শুধু স্থানটা নির্দেশ করতে পারিনি; স্থানটি আবিষ্কার করলেই অর্থের অভাব আর থাকবে না।

সকলে উৎসুক হয়ে উঠলো। ডেভিড পকেট থেকে একখানি খাম বাহির করে বললে—এর এক পিঠে বন্ধনী দিয়ে পর পর কয়েকটি নম্বর লেখা ছিল, সেই নম্বরগুলো আমি কেটে ফেলেছি! এখন ফুসানের সেই চিঠির কার্ডখানি খামের মধ্যে রাখলে সেই ফাঁকগুলি দিয়ে কয়েকটি কথা নজরে পড়ে সেইটিই হোল রহস্যের সমাধান।

সরোজ ব্যাপারটা তখনও বোঝেনি, ডেভিড তার হাতে খামখানি এগিয়ে দিলে। সরোজ দেখলে খামখানির কাটা-কাটা জায়গাগুলি দিয়ে চিঠিখানির এক এক লাইনের এক একটি অংশ প্রকাশ হয়ে পড়ছে:

সিয়াংনদীর	আলোক
তীরে	উদ্দেশ্যে
বোধিধর্ম	মুক্তির
মন্দিরে	দেশের
বৌদ্ধমূর্তির	আছে
নীচে	স্বর্ণ

লক্ষ লক্ষ

ডেভিড বললে—ক্রমিক সংখ্যাগুলি কেমনভাবে বসানো ছিল মনে আছে তো? বাঁদিকে ১ থেকে সুরু হয়ে নীচে নেমে এসে ডানদিকে উপরে ১৩ য় গিয়ে শেষ হয়েছে সেইটাই হোল পড়ার নির্দেশ। শব্দগুলি পরপর সংখ্যা অনুযায়ী সাজালে পূরো বাক্যটি এই হবে: 'সিয়াং নদীর তীরে বোধিধর্ম মন্দিরে বৌদ্ধমূর্তির নীচে

লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ আছে দেশের মুক্তির উদ্দেশ্যে আলোক—'এই বোধিধর্ম মন্দিরটা খুঁজতেই আমি বেরিয়েছিলেম প্লেন নিয়ে।

চ্যাংশো উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল, বাধা দিয়ে বললে—আরেকবার চিঠিখানা পড়ে আমায় ভাল করে বুঝিয়ে বলত কমরেড ?

ফাতুই এবার চিঠিখানি ভাল করে চ্যাংশোকে বুঝিয়ে দিলে। চ্যাংশো লাফিয়ে উঠলো, বললে—পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি। বোধিধর্ম বিহার এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল পথ, কাল সকালেই আমরা যাব। টাকাটা যদি পাই—লক্ষ লক্ষ ডলার, কোটি কোটি ডলার,—তাহলে ওই বাঁদরগুলোকে একবার দেখিয়ে দেব আমরাও লড়তে জানি।

তারপর উঠে এসে ডেভিডের দুহাত চেপে ধরলো, বললে—কমরেড, তুমি যা করলে আমাদের দেশ সেজন্য চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে—তোমরা সত্যই চীনের বন্ধু !

চ্যাংশোর চোখে জল টলটল করে উঠলো।

মাতাহারি বললে—টাকাটা পাবার আগেই এতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা ঠিক নয়, টাকাটা আগে হাতে আসুক তবে তো !

—ও-টাকাটা পাওয়া যাবে বলেই মনে হয়—সরোজ বললে।

—কাল সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়ি—ফাতু বললে।

চ্যাংশো বললে—নিশ্চয়ই, দেরী করলে তো আমাদেরই ক্ষতি। উচিত ছিল আজ এখনই বেরুনো, কিন্তু তোমরা সবাই পরিশ্রান্ত—

রাত্রে কিসের যেন একটা শব্দে সরোজের ঘুম ভেঙে গেল। মনে হোল কে যেন তার কপালের উপর একখানি হাত রেখেছে। সরোজ সন্তর্পণে চোখ মেললো, সত্যই কে তার মাথার কাছে বসে। ধড়মড় করে উঠে বসলো, জিজ্ঞাসা করলে—কে ?

—হাস্‌স্‌ !

—কে তুমি ?

—হাস্‌স্‌স্‌—আস্তে।

সরোজ দৃঢ়ভাবে তার একখানি হাত চেপে ধরলো—তুমি কি জন্য এই সময় আমাদের ঘরে ঢুকেছ, নিশ্চয়ই তোমার কোন বদ্‌-মতলব আছে।

এবার মেয়েলী গলায় পরিষ্কার ইংরাজী শোনা গেল—চেঁচামেচি করলে

তোমাদেরই ক্ষতি হবে, চুপি চুপি তোমার সঙ্গীদের আগে জাগাও তারপর সব কথা হবে।

ইতিমধ্যে ডেভিডের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, বললে—কি হয়েছে?

—আমিই কিছু বুঝতে পারছি না, তা তোমাকে বলবো কি?—সরোজ বললে।

—কিচ্ছু বুঝতে হবে না,—মেয়েলী গলা আবার শোনা গেল,—আগে তোমাদের সঙ্গীদের ডেকে তোলো, তারপর সব আমিই বলবো।

ডেভিড তখনই ফাতু আর মাতাহারিকে ডেকে তুললো।

অপরিচিতা এবার বললে—তোমরা আজ যাকে গুপ্তধনের প্ল্যান দিয়েছ, সে আসল চ্যাংশো নয়, সে একজন ছদ্মবেশী জাপানী গুপ্তচর।

—সত্যি?

—সত্যি কি মিথ্যে, তা আমি মুখের কথায় বোঝাতে চাই না, আমি হাতে হাতে প্রমাণ করবো; সেই জন্যই তোমাদের জাগালেম, আমার সঙ্গে এসো, তাহলেই সব দেখতে পাবে—এসো—

মেয়েটি অগ্রসর হোল, তার হাতে ছিল একটি হাত-বিজলী আলো। সরোজরা তার অনুসরণ করলো যন্ত্রচালিতের মত।

বিরাট বাড়ীটি নিদ্রায় আচ্ছন্ন, মৃত্যুর স্তব্ধতায় থম্‌থম্ করছে। নিজের পদশব্দ প্রতিধ্বনি তুলে ভয় খাইয়ে দেয়, মনে হয় কে যেন পিছনে অনুসরণ করছে।

উঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে একখানি ঘর। তার দেওয়ালের গায় একটি লোহার সিন্দুক। মেয়েটি সেই সিন্দুকের হাতল ধরে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিলে, ঘট্ করে সিন্দুকের পাল্লাটি খুলে গেল, ভিতরে একখানি ঘরের মত দেখা গেল, মেয়েটি বললে—এসো—

পরপর সিঁড়ি নেমে গেছে, তারা নামতে স্থুরু করলো।

চারিপাশে ঘন অন্ধকার ঘোরতর হয়ে উঠেছে। তার উপর ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। নামতে নামতে মনে হয় অন্ধকার যেন বুকের উপর চেপে বসছে। প্রতি নিঃশ্বাসে মনে হয় ফুস্‌ফুসের মধ্যে যেন বাতাসের বদলে যাচ্ছে খানিকটা জল। তথাপি তারা নিঃশব্দে এগিয়ে চললো।

সিঁড়িটা দুপাক ঘুরেই এমন একটি জায়গায় এসে থেমেছে যেটাকে ঠিক ঘর বলা যায় না। সরু একটা গলিপথ। তারই একপাশ দিয়ে একটা আলোর সঙ্কেত দেখা যায়; চলতে চলতে কণ্ঠস্বরের রেশ কাণে এল—কে যেন কার উপর তর্জন

করছে। একটি ভেজানো দরজার সামনে এসে তারা দাঁড়ালো, সেই দরজার ফাঁক দিয়েই আলোর টুকরো বাইরে এসে পড়েছে। ঘরের ভিতর থেকে এবার স্পষ্ট শোনা গেল : গুপ্তধনের হদিশ্ তুমি দিতে চাওনি, কিন্তু ফুসানের নির্দেশলিপি আমার হস্তগত হয়েছে।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—তুমি বিশ্বাস না করলেও আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, আর একটু পরেই সেই টাকা আমার মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে, তারপর সেই টাকা জাহাজে চড়ে যাবে কোথায় জানো? জাপানে! হাহাঃ হাঃ! আর তোমার কি হবে জান ত? এই ঘরের মধ্যে অনাহারে সকলের দৃষ্টির অজ্ঞাতে জীবন্ত সমাধি—বহু নিপ্পনীকে তুমি খুন করেছ, তার যোগ্য পুরস্কার পাবে!

—আর তুমি চীনাদের খুন করনি?

—আমি খুন করেছি তার পিছনে ছিল বড় আদর্শ। আমরা চাই সমগ্র এশিয়াকে নতুন আদর্শে সভ্য করে তুলতে। যারা আমাদের এই মহৎ কাজে বাধা দিচ্ছে, তারা সমগ্র এশিয়াবাসীর শত্রু—তাদের মৃত্যু ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে?

—তোমরা আমাদের সভ্য করে তুলতে এসেছ? হাহাহাঃ।

—তোমাদের সভ্য করতে আমরা চাই না, আমরা চাই তোমাদের লুঠ করতে, তোমাদের নিঃস্ব করে নিপ্পনকে এশিয়ার সম্রাজ্ঞী করতে।

—কিন্তু একজনও চীনা যতদিন বাঁচবে ততদিন তা সম্ভব নয়!—অগ্রগামী মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকলো, তার দুহাতে দুটি পিস্তল।

ঘরের মধ্যে যেন একটি বোমা ফাটলো, যে লোকটি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল সে চমকে উঠলো; পরক্ষণেই দপ্ করে আলোটা দিলে নিভিয়ে। চারিপাশ অন্ধকার। মেয়েটির হাতের দুটি পিস্তল কট্‌কট্ করে দুবার জ্বলে উঠলো, তারপর কিছুক্ষণ সব চুপ চাপ, কোথাও এতটুকু সাড়া শব্দ নেই, কারুর নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায় না।

মেয়েটি এবার হাত-বিজলী আলোটি জাললে, সেই আলোর ঝল্‌কানিতে দেখা গেল একটি লোক হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। ফাতু ও সরোজ এগিয়ে গিয়ে তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিলে। লোকটি উঠে বসলো, তার মুখের পানে তাকিয়ে সরোজ চমকে উঠলো, বললে—চ্যাংশো!

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ, ইনিই আসল চ্যাংশো, আর যাকে তোমরা গুপ্তধনের

হদিশ্ দিয়েছ, যাকে তোমরা চ্যাংশো বলে জানতে, সে এর নকল, একজন জাপানী গুপ্তচর !

পিস্তলধারিণী চ্যাংশোর পাশে বসে পড়লো, বললে—তুমি কিছু খাবে কমরেড ?

—কমরেড কিউ না ?

—হ্যাঁ।

—জল আছে ? একটু জল দাও—কমরেড কিউ জলের বোতলটি চ্যাংশোর মুখে ধরলো।

ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে চ্যাংশো একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে —তুমি পরপর তিনবার আমার জীবন বাঁচালে কমরেড কিউ।

—সে কথা এখন থাক—কিউ বাধা দিয়ে বললে—এখন তুমি চলতে পারবে ? ওই পলাতক জাল জাপানীটাকে এখনই আমাদের অনুসরণ করতে হবে, আর দেরী করা যায় না।

—নিশ্চয়ই পারবো—বলে চ্যাংশো উঠে দাঁড়ালো, তারপর ছহাতে চোখ ঢেকে আবার বসে পড়লো, বললে—না, তোমরা যাও আমার মাথা ঘুরছে !

মাতাহারি বললে—বেশ তাহলে আমি থাকি এঁর কাছে, তোমরা যাও, আমরা পিছনে যাচ্ছি।

আবার সেই অন্ধকার। হাত-বিজলীর আলোয় দেখা গেল দীর্ঘ এক সুঁড়ি-পথ চলে গেছে, ছদিকের পাথরের দেয়াল শ্যাওলা ধরে কালো হয়ে গেছে। ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। কতদিন সে পথে লোক চলে নি। বিজলী আলো সেই অন্ধকারে হারিয়ে যায়। চলতে চলতে মনে হয় অন্ধকার যেন বুকের উপর চেপে বসছে। মাথাটা কেমন যেন ভারী-ভারী লাগে, পাছুটিও যেন গুরুভার হয়ে ওঠে। একটা শীতালুভাব ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে তোলে, কিছুতেই তাকে আয়ত্ত করা যায় না, মুখে ও কপালে একবার হাত বুলিয়ে নেয়, মনে হয় জামাটা যেন ভিজে উঠেছে।

মনকে আয়ত্তে আনার জন্য সরোজ কথা বলে, জিজ্ঞাসা করলে—এ-পথে আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

—বোধিধর্ম মন্দিরে—কিউ উত্তর দিলে।

—বোধিধর্ম মন্দিরে ?

—হ্যাঁ। সেকালে বৌদ্ধ-ধর্মের বিধান-অনুযায়ী বর্ষাকালে তিনমাস মঠ থেকে

কেউ বাইরে বেরুতেন না, তখনকার দিনে এইটাই ছিল বৌদ্ধ-স্থবিরদের মঠ থেকে মন্দিরে যাতায়াত করার সংক্ষিপ্ত পথ। তবে কিছুদিন থেকে এই পথ আমরা ব্যবহার করছি আমাদের গেরিলা সৈন্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে।

ফাতু বললে—কিন্তু জাপানীরাও তো এ-পথ জানে দেখছি, নাহলে ওই জাপানী গুপ্তচরটি এই পথে পালালো কেমন করে ?

সেই সুঁড়িপথের দীর্ঘ অন্ধকারের মাঝে কাউকেই দেখা গেল না। ফাতু বললে—তোমাদের সকলের কাছে পিস্তল ঠিক আছে ?

সরোজ ও ডেভিড তাড়াতাড়ি পিস্তল বাহির করতে গেল, কিন্তু পিস্তল কই ? কোমরের খাপটি তো খালি, পিস্তল নেই। সমস্বরে তারা দুজনে বলে উঠলো—কই, পিস্তল তো নেই !

হাহাহাঃ—অট্টহাসির শব্দ সুঁড়িপথের বাতাসকে কাঁপিয়ে তুললো।

ফাতু বললে—না থাক্‌, কমরেড কিউয়ের কাছে আছে দুটো, আমার কাছে একটা ; তাইতেই এখন কাজ চলবে—এখন চল আমরা ক্ষিপ্রপদে ওই হাস্য-রসিকটীকে অনুসরণ করি।

কমরেড কিউ তাদের নিবৃত্ত করে বললেন—না না তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই, এ-পথে কখন্ কি বিপদ ঘটবে কিছুই বলা যায় না !

যেমন ধীর পদক্ষেপে তারা চলছিল তেমনি ভাবেই চলতে লাগলো।

—হাত মাথার উপর তোলো !—অন্ধকারের বুকে সহসা কার ধারালো গলা শোনা গেল। ক্ষণেকের জন্য বজ্রাহতের মত সবাই বিমূঢ় হয়ে পড়লো, তারপর কিউ ও ফাতু পকেটে হাত ভরলো পিস্তল বাহির করার জন্য।

—পিস্তল বের করলেই মৃত্যু ! পকেট থেকে হাত বের করে নাও !

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে নিষেধক হিসাবে পিস্তলের শব্দ শোনা গেল, একটি আগুনের ঝিলিক এসে লাগলো, সরোজদের মাথার উপর সুঁড়িপথের ছাদে।

—পকেট থেকে হাত বের করে নাও ! অন্যথা তোমাদের অগ্রগামিনী পিস্তলের গুলিতে নিহত হবে।

শত্রু অদৃশ্য। পিস্তল হাতে থাকলেও তার সঙ্গে মুখোমুখি যুঝবার কোন সম্ভাবনা নেই, কাজেই পকেট থেকে হাত বাহির করে নিতে হোল।

—মাথার উপর হাত তোলো !

সকলে মাথার উপর হাত তুললো।

—অগ্রসর হও !…ডাইনে…

সকলে ডাইনে বেঁকে খানিকটা যেতেই দপ্ করে চারিপাশে আলো ঝল্মল্ করে উঠলো, উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সারি সারি লোক, তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে আছে তাদের মুখের পানে। এতক্ষণ তারা যেন সরোজদেরই আগমন প্রতীক্ষা করছিল। তাদের মুখের উপর যতরাজ্যের নিষ্ঠুরতার ভয়াবহ ইঙ্গিত প্রকাশমান।

ঠিক সেই সময় চারিপাশ অট্টহাসিতে সচকিত হয়ে উঠলো—হা হা হাঃ!

তারপর শোনা গেল : এই মৃত্যুগুহায় তোমাদের জীবন্ত সমাধি হোল। ওই যে মমিগুলি তোমাদের চারিপাশে দাঁড়িয়ে আছে, ওরা ওঁৎ পেতে আছে তোমাদের প্রাণান্তের প্রতীক্ষায়। অন্ধকারে অক্টোপাশের মত ওরা তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করবে, আতঙ্কে তোমাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে। বাণে-বেঁধা পাখীর মত তোমরা ছট্ফট্ করবে···সামান্য একটু বাতাসের অভাবে তিল তিল করে তোমাদের মৃত্যু ঘটবে। তারপর তোমাদের অমন সুন্দর দেহগুলো পচে পোকা কিল্ বিল্ করবে, ইঁদুরে ছিঁড়ে খাবে। এই মঠের অর্থে লোভ করার উপযুক্ত শাস্তি তোমরা পাবে। আর আমি তখন সাগরের ঢেউয়ে নাচতে নাচতে গিয়ে পৌছাবে আমার সোনার নিপ্পনে।

কণ্ঠস্বরের বারেক বিরতি ঘটতেই সরোজ বলে উঠলো—তারপর?

—তারপর! হে হে হেঃ! তারপরেও শুনবে? তবে শোন : নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, বাতাসের অভাবে প্রাণ আঁকু-পাঁকু করে উঠছে, বাহিরে যাবার জন্য চারিপাশের পাথরের দেওয়ালে তোমরা মাথা ঠুকে মরছ। চারিপাশের মমিগুলো খিল্খিল্ করে হাসছে। জলের অভাবে তোমাদের দেহ ঝিম্ ঝিম্ করছে, বাতাসের অভাবে মাথার মধ্যে কেমন যেন শির শির করছে, প্রতি পদে তোমাদের পা টল্ছে, কথা বলতে জিব জড়িয়ে যাচ্ছে তালুতে। তোমাদের সে এক মস্ত আনন্দের দিন। হে হে হেঃ!

সরোজ আবার প্রশ্ন করলো—তারপর?

—তারপর কত শত বছর পরে, যদি সত্যই কোন অনুসন্ধানী এই টুটেন্খামেনের কবর একদিন আবিষ্কার করে, তখন তোমাদের কঙ্কাল-খানিও তার নজরে পড়বে না, থাকবে পাথরের মেঝের উপর এক একটি 'ফসিল্' চিহ্ন। তাই দেখে কতজন কত-কি কল্পনা করবে, কিন্তু সত্যি কথা কেউ জানবে না, হে হে হেঃ।

—হা হা হাঃ—সরোজও এবার সেই হাসিতে যোগ দিলে, তারপর বললে—

তোমার ভবিষ্যৎ-বাণীর জন্য ধন্যবাদ মিষ্টার মার্কিরো। শুধু কথা শুনে আর মমি দেখে ভয় পাবার মত ছেলে-মানুষ আমরা নেই। আর তোমার ভবিষ্যৎ-বাণীর এক জায়গায় একটু ভুল হয়েছে, আর ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলেই সেই ভুল তুমি বুঝতে পারবে। উপর থেকে আমাদের সাহায্য আসতে এর চেয়ে বেশী সময় লাগবে না। তাই আমার সবিনয় নিবেদন তুমি অন্ততঃ আর ঘণ্টাখানেক আমাদেরকে তোমার গল্প শোনাও। চীনদেশে আসার সময় থেকে নানারকম-ভাবে তুমি আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেছ, আজ শেষবারেও তুমি নিশ্চয়ই আমাদের বঞ্চিত করবে না।

কিন্তু এবার মার্কিরোর দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। শোনা গেল পাথরের মেঝের উপর পা-ফেলার শব্দ। কে যেন চলে যাচ্ছে।

—এই অন্ধকারে আমাদের একলা রেখে পালিয়ে গেলে বন্ধু!—উঁচু গলায় কথা কয়টি বলে সরোজ হা হা করে হেসে উঠলো।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন শোনার চেষ্টা করে বললে—যাক্, আপদটা তাহলে সত্যিই বিদায় হয়েছে, এবার আমরা ধীরে-সুস্থে এখান থেকে বেরুবার উদ্যোগ করি—

ফাতু বললে—তোমার উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করি, তুমি কি করে জানলে ও মার্কিরো?

—কেন, জাহাজে যখন ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তখনই দেখেছিলেম ওর ইংরাজী উচ্চারণে কতকগুলো বিশেষত্ব আছে। 'এস'গুলোকে ও 'ডবল এসের' চেয়েও বেশী জোর দিয়ে উচ্চারণ করে। এখানেও প্রথমে কাণে বাজছিল কিন্তু মনে করতে পারছিলেম না, সেইজন্যই 'তারপর' 'তারপর' বলে সময় নিচ্ছিলেম।

ডেভিড বললে—তারপর ওপর থেকে সাহায্য আসার কথাটা…

সরোজ হেসে বললে—ও যদি কাঠের পুতুলগুলোকে মমি বলে ভয় দেখাতে পারে আমি আত্মরক্ষার জন্য দুটো মিছে কথা বলতে পারি না?

—কাঠের পুতুল?—ডেভিড বিস্ময় প্রকাশ করলো।

—হ্যাঁ কাঠের পুতুল—সরোজের বদলে কমরেড কিউ জবাব দিল—এগুলো সবই কাঠের পুতুল। তখনকার দিনে এই মঠটি এই অঞ্চলের একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এখানে যাঁরা মহাস্থবির থাকতেন তাঁদের মৃত্যুর পর ভক্তেরা সাধারণতঃ তাঁদের এক একটি কাঠের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে বিশেষ বিশেষ দিনে তাঁর কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করতো।

—তা সরোজ এ কথা জানলে কেমন করে ?

—এই ইতিহাস আমি জানতেম না সত্যি—সরোজ বললে—তবে এই অন্ধকারে একটা পুতুলকে পরীক্ষা করে দেখে এগুলো যে মমি নয় তা বুঝে নিয়েছি, আঙুলের টোকা মারতেই খট্‌খট্ করে কাঠের মত শব্দ হোল। যাক সে কথা, কমরেড কিউ টর্চের আলোটা একবার ধরো, আমরা এগুই।

—আলো ধরার আর উপায় নেই, ব্যাটারী শেষ হয়ে গেছে। আসবার সময় দেখে আনিনি।

—যাক্, অন্ধকারেই আমরা এগুবো—

কিন্তু ক'পা যেতেই একটা পুতুলের সঙ্গে সরোজের ধাক্কা লাগলো। সরোজ সরে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সেই পুতুলটা, এবং তার ধাক্কায় আরো কয়েকটি পুতুল হুড়মুড় করে পড়লো। সরোজই পড়ে গেল সবার আগে। মাথায় তার কম লাগেনি। মাথায় হাত বুলিয়ে দেখলে, সত্যি ফেটে গেল না তো।

ডেভিড বলে উঠলো—উঃ, সয়তানের আড্ডা !

ফাতুর গলা শোনা গেল—আমায় একটু ধরতো কমরেড্, তিনটে পুতুল একেবারে আমারই ঘাড়ের উপর পড়েছে।

পুতুল-পড়ার খট্‌খট্ শব্দ বাহিরেও গিয়েছিল, মার্কিরোর অট্টহাসির ধমকে সুঁড়িপথের ছাদ কেঁপে উঠলো—হা হা হাঃ !

সরোজও কি ভেবে তার চেয়ে জোর গলায় হেসে উঠলো—হা হা হাঃ।

দপ্ করে মার্কিরোর হাসি নিভে গেল।

ডেভিড বললে—ব্যাটা এখনও আমাদের পিছনে আছে !

কমরেড কিউ বললে—আমরা এখন কি অগ্রসর হতে পারি ?

—নিশ্চয় ! নিশ্চয় !!

—তা'হলে একে একে আমার হাত ধরে এসো দিকি—

ক'পা এসে একটা মোড় ফিরতেই দেখা গেল একটা স্তিমিত আলোর শিখা। আলোটি ক্রমশঃ দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সুঁড়িপথের শেষের দিকে।

পা টিপে টিপে আরেকটু অগ্রসর হয়ে ভালো করে ঠাহর করে সরোজ বললে—মার্কিরো না ? পিঠে অতো ভারী বাক্‌সের মত কি একটা বহে নিয়ে যাচ্ছে ?

কিউ বললে—গুপ্তধন। যার সন্ধানে তোমরা এতদূর ছুটে এসেছ, ওটি তাই।

ডেভিড লাফিয়ে উঠলো, বললে—আমাদের চোখের সামনে দিয়ে যথা-সর্বস্ব নিয়ে ও চলে যাবে আর আমরা দাঁড়িয়ে তাই দেখবো ? এসো এখনই ওকে……

কিউ বাধা দিয়ে বললে—অতো ব্যস্ত হয়ো না কমরেড। ওই বাক্সটার ভিতর এখন আছে শুধু হাজার খানেক সেন্ট আর অজস্র পাথরের টুকরো। মূল্যবান যা কিছু ছিল তা ক'দিন আগেই আমরা সরিয়ে রেখেছি।

সরোজ বললে—এই কদিন ধরে তাহলে মিছামিছিই আমরা এত পরিশ্রম করলেম, গুপ্তধন আবিষ্কার করার গৌরবটুকুও পেলেম না।

মার্কিরো সুড়িপথের আরেক দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। যে আলোর আভাটুকু ছিল তা জমাট অন্ধকারের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। অমন অন্ধকারে কিউ কিন্তু এতটুকু বিচলিত হোল না। দেয়ালে হাত দিয়ে অন্ধের মত হিসাব করতে করতে এক জায়গায় এসে থামলো, বললে—এই হচ্ছে আপনাদের গুপ্তধনের গুপ্তগৃহ, এরই উপরে হচ্ছে বোধি-ধর্ম মন্দির। এখানে আমাদের খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। উপরে উঠতে হলে একটা আলো চাই। এখনই চ্যাংশো আর আপনাদের সঙ্গিনীটি হয়তো মশাল নিয়ে এসে পড়বে।

সত্যই অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল সুঁড়িপথ দিয়ে মশাল-ধারী দুটি লোক ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

এবার সরোজদের ভারতে ফিরে যাবার কথা। ফাতু বললে—এদেশে তোমাদের যে অভিজ্ঞতা হোল, ভারতে তার কিছু প্রচার হওয়া দরকার, এবং সেই দরকার এখনই, সেইজন্যই তোমাদের আশু ভারতে ফিরে যাওয়া উচিত। তোমরা এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যেভাবে বলতে পারবে সেভাবে আর কোন ভারতবাসী বলতে পারবে না। কিন্তু যাবে কোন পথে সেই হচ্ছে কথা…

চ্যাংশো বললে—সেজন্য ভাব্‌বার কি আছে। এখান থেকে প্লেনে বরাবর সমুদ্র, তারপর সেখানে কোন বৃটিশ বা মার্কিন জাহাজ ধরলেই চলবে।

সরোজ বললে—কিন্তু প্লেন ?

—চঞ্চল হবার কোন হেতু নেই। এখান থেকে অল্প দূরেই জাপানীরা প্লেনের একটা আড্ডা করেছে। আজ রাত্রে তোমরা তৈরী থেকো, আমি তোমাদের সেখানে নিয়ে যাব'খন !

রাত্রির অন্ধকারে ছোট্ট দলটি বেরিয়ে পড়লো। চাঁদিনী রাত। চলতে বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়তে হোল না। তবে পাহাড়ী পথ, অল্প চললেই শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

প্রায় দু'মাইল আসার পর একটি ছোট বন পার হয়ে তারা একটা খাড়াই পাহাড়ের কিনারায় এসে পড়লো। চ্যাংশো বললে—ওই দেখ!

নীচে যেখানে উপত্যকা সমতলক্ষেত্রে নিজেকে বিস্তার করে দিয়েছে, সেখানে সারি সারি অসংখ্য প্লেন। রূপালী পাখাগুলি চাঁদের আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছে যেন এক ঝাঁক পাখী রোদে মেলে ধরেছে ভিজে ডানাগুলো। প্লেনগুলোর পিছনে কতকগুলি তাঁবু।

বিচক্ষণভাবে সব দেখে নিয়ে সরোজ বললে—এখান থেকে প্লেন চুরী করা তো খুব কঠিন কথা।

ডেভিড বলে উঠলো—তাও আবার একখানা নয় দুখানা। প্রত্যেকটা মোনোপ্লেন।

—যদি একখানা নিয়ে তোমরা পালাতে পার তো দুখানা নিয়েও পারবে—সে কথা নয়, এখন যা বলি শোন। তোমরা এইখানে অপেক্ষা কর, আমরা ওদিকে যাই। ওদিক থেকে আমরা ওদের দিকে কয়েকটা বোমা ছুঁড়বো, জাপগুলোর দৃষ্টি তখন ওই দিকেই যাবে। তোমরা সেই অবসরে এদিক থেকে দুখানি প্লেন দখল করে ভেসে পড়বে আকাশে।

ফাতু বিদায় নিয়ে বললে—গুড্‌ লাক্‌! গড্‌ স্পীড্‌!

তারপর সরোজ ও ডেভিডকে সেখানে রেখে তারা আবার বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটা পাইন গাছে ঠেস্‌ দিয়ে সরোজ ও ডেভিড বসে রইল। এই প্রকাণ্ড চত্বরটি ঘুরে চ্যাংশোরা ওদিকে যাবে, সময় একটু লাগবে বৈকি।

বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি আসে। মনে হয় যেন স্থবির হয়ে গেছে। দেহটা এই পাইনগাছের মতই শিকড় চালিয়ে দিয়েছে মাটিতে আর মনটা ঘুরছে চারিপাশে, কিন্তু দেহটাকে টেনে নিয়ে যাবার শক্তি তার নেই। সময় যেন অসহনীয় হয়ে ওঠে।

কোন এক সময় ওদিকে শব্দ উঠলো—বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌! আলোর চমক ও পাহাড়ের কম্পন, ধূলো ও ধোঁয়া, তার পরেই জাপানীদের হৈ-চৈ।

তাদের দিকে কেউ তখন নেই, শাস্ত্রীরা সবাই তখন ইতস্ততঃ বোমা ছুঁড়ছে এবং ক্লিক্‌ ক্লিক্‌ করে জাপানী বন্দুক গর্জে উঠছে সেই অদৃশ্য বোমা-নিক্ষেপীদের রুখবার জন্য।

সরোজ ও ডেভিড বিনাবাধায় দুখানি প্লেনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। পেট্রোল

ট্যাংক ভর্তি আছে দেখে, প্রপেলার ঘুরিয়ে দিয়ে এক-লাফে প্লেনের ভিতরে উঠে বসলো। আধ মিনিটের মধ্যে প্লেন দুখানি লাফিয়ে উঠলো আকাশে। তারপর একপাক ঘুরে পাহাড়ের খাড়া দেয়ালটা পাশ কাটালো।

নিজেদের দুখানি প্লেন আকাশে উঠে যেতে দেখে জাপানীরা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি, তার পরেই তাদের বন্দুক গর্জে উঠলো—কট্ কট্ কট্ কট্ কট্ কট্!

সরোজরা তখনও বন্দুকেও নাগালের বাহিরে যায় নি। হঠাৎ একটি বন্দুকের গুলি ডেভিডের পেট্রোল ট্যাংক ফুটো করে দিলে। দপ্ করে প্লেনখানি জ্বলে উঠলো আচম্বিতে। তারপর মাথাটা নীচু করে হুড়মুড় করে পাহাড়ের গায় এসে পড়লো মুখ থুব্ড়ে।

সরোজকে ফিরতে হোল।

সরোজ যখন নাবলো তখন জাপানীরা জ্বলন্ত প্লেনখানির ভিতর থেকে অর্দ্ধদগ্ধ অচেতন ডেভিডকে কোন রকমে টেনে বাহির করছে। ডেভিডের সেই বীভৎস দেহের পানে সরোজ তাকাতে পারলো না, দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নার আবেগে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

জাপানী সেনারা চারিপাশ থেকে সরোজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হৈ চৈ করতে করতে সকলে মিলে তাকে টেনে নিয়ে চললো 'হাঙারের' দিকে।

হাঙারের পিছন দিকে একটি 'শেডের' নীচে দুজন জাপানী বসে কথা বলছিল, সরোজকে এনে হাজির করলো তাদের সামনে। একজনের জামার বাহুতে অনেকগুলি 'ষ্ট্রাইপ্' আর কোটের বুকে কয়েকটা রঙীন 'ব্যাজ' লাগানো ছিল; সেই বোধ হয় এখানকার অধিনায়ক। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই তার পার্শ্বচর বলে উঠলো—হ্যালো পুরানো বন্ধু, কেমন আছ? এখানে কি মনে করে? তোমার যমজ ভাইটি কোথায় গেল?

সরোজ চিনলো, সে মার্কিরো। পোষাক বদ্লেছে, 'মেক-আপ্' না থাকায় মুখের চেহারাও খানিক-খানিক বদ্লেছে, কিন্তু গলা বদ্লায়নি।

মার্কিরো মৃদু হেসে উপহাস করে বললে—তুমি বার বার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছ কেন বলত? তুমি যে আমাকে এত পছন্দ কর তাতো জানতেম না!

সরোজ কোন জবাব দিল না।

অধিনায়ক জিজ্ঞাসা করলে—তুমি একে চেনো নাকি?

—চিনি না আবার, খুব ভাল করে চিনি। ইনি আমার পুরানো বন্ধু, ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে—বলে মস্ত রসিকতা করা হয়েছে ভেবে মার্কিরো হেসে উঠলো।

অধিনায়ক জিজ্ঞাসু চোখে মার্কিরোর মুখের পানে তাকালো। মার্কিরো সে চাউনির অর্থ বুঝলে, তার উত্তরে গড়গড় করে সে অনেক কথাই বললে কিন্তু সরোজ তার একবর্ণও বুঝলো না। কথা যা কিছু হোল সবই জাপানী ভাষায়।

যারা সরোজকে ধরে এনেছিল, তাদের সঙ্গেও কিছুক্ষণ কত-কি কথা বলে মার্কিরো সরোজের দিকে ফিরলো। বললে—সাঙাং, তোমার যমজ ভাইটি পুড়ে মরেছে শুনে সত্যই আমি দুঃখিত। চারজন সহযোগীর মধ্যে তুমিই এখন একমাত্র অবশিষ্ট আছ। এই রকম যে হবে তা আমি আগে থেকেই জানতেম। অন্যায়কে যারা সমর্থন করে বিধাতার বিধানে তাদের এমনই হয়। সেইজন্যই তোমাকে আমি ফিরে যেতে লিখেছিলেম। তুমি তখন সে কথা শুনলে, আজ তোমাকে এই দুঃখ পেতে হোত না। যাক্, তুমি যখন এবার আমার কাছে এসে পড়েছ, তোমাকে আর পুড়ে মরতে হবে না। তবে হ্যাঁ, কিছুদিন খেটে মরতে হবে। এতদিন তো দেখলে চীনারা কি করতে পারে, এবার তোমায় দেখাবো নিপ্পনীরা কি করতে পারে। তুমি নতুন আলোর সন্ধান পাবে; তোমার চোখ খুলে যাবে। তোমায় এবার আমি সেই উদ্দেশ্যে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কোথায় নিয়ে যাব আন্দাজ করত ?

কিন্তু আন্দাজ করার মত মনের অবস্থা সরোজের তখন ছিল না। শুধু একটি কথা বারবার তার কাণে বাজছিল 'চারজন সহযোগীর মধ্যে তুমিই এখন একমাত্র অবশিষ্ট আছে।' আর বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো আগুনের ছোঁয়া-লাগা ডেভিডের বীভৎস মুখখানি। এখন সে হয়তো তিল তিল করে মরছে, কি যাতনা পাচ্ছে কে জানে ? হয়ত মারাই গেছে এতক্ষণে।

এদিকে সরোজের কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে মৃদু হেসে মার্কিরো তার কথার জের টেনে বললো—বলতে পারলে না তো, তবে শোন : ফিলিপাইনের পূর্ব প্রান্তে অজ্ঞাত অখ্যাত এক দ্বীপে আমরা নৌ-ঘাঁটি তৈরী করছি, প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করার জন্য সেখানে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। এখানে যত বন্দী করছি সব নিয়ে যাচ্ছি সেখানে; দ্বীপান্তর দেওয়াও হচ্ছে, আমাদের কাজও এগুচ্ছে। বেশ মজার বুদ্ধি করা হয় নি, তুমিই বল ? তোমার সঙ্গে যখন দেখাই হোল, আমার ইচ্ছা তোমাকে একবার সেই সব দেখিয়ে আনি।

তোমার একে বন্ধু-শোক, তার উপর অর্থ-শোক, বেশ একটু চেঞ্জ হবে। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, তোমাদের ওই গুপ্তধনের টাকাটা পেয়ে আমাদের যথেষ্ট উপকার হয়েছে, এজন্য আমরা তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ!

এবার সরোজ আর চুপ করে থাকতে পারলে না, বললে—টাকা তুমি পেয়েছ? খুলে দেখেছ কাঠের সিন্দুকে কি আছে?

মার্কিরোর চোখে এবার সন্দেহের ছায়া পড়লো, সেনা-নায়ককে কি যেন বললে। কাঠের সিন্দুকটি সেইখানে একপাশে পড়েছিল; একজন সৈনিকের সাহায্যে সেটা তখনই খুলে ফেলার ব্যবস্থা হোল।

খুলে দেখে বাক্সটি এতদূর বহে আনা বৃথা হয়েছে। ভিতরে হীরা জহরৎ কিছুই নেই, শুধু পাথরের টুকরো আর কয়েকশত সেণ্টে সিন্দুকটি ভর্তি। ব্যাপার দেখে মার্কিরোর মাথায় খুন চড়ে গেল। রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে সে ফিরে এল সরোজের কাছে, চীৎকার করে উঠলো—তোরা সব সয়তান, কিন্তু এবার আর তোর রক্ষা নেই। আমি জানি কি করে সয়তানকে শায়েস্তা করতে হয়, তোকে আমি এখনই চাব্‌কে লাল করে দিচ্ছি। এই চাবুক লাও—

পাশের একটী সৈনিককে মার্কিরো ইঙ্গিত করলে, সে ছুটে গিয়ে তখনই একটা হাণ্টার চাবুক নিয়ে এল। চাবুকটী হাতে নিয়ে বাতাসে হুবার নাচিয়ে সরোজকে আঘাত করার জন্য মার্কিরো এগিয়ে এল।

—গুড়-গুড় গুড়-গুড়—বু-বুম্-বুম্ম্!

রাত্রির অন্ধকারে কয়েকটি কামানের গোলা আলোর ঝিলিক খেলিয়ে দিলে। কাছাকাছি কয়েকটি গোলাও ফাটলো। শোঁ শোঁ করে শিষ্ দিতে দিতে মাথার উপর দিয়ে কয়েকটি গোলাকে ছুটে যেতে দেখা গেল। মার্কিরোর হাতের চাবুক হাতেই রয়ে গেল, থ' হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল ক' সেকেণ্ড।

ইতিমধ্যে সেনানায়ক লাফিয়ে উঠে ছুঠে ওদিকে চলে গেল। পিছনে জাপানী সেনাদের সোরগোল উঠলো, একটা বিউগিলের ধারালো শব্দ চারিপাশ সচকিত করে তুললো—ভঁপো-ভঁপো ভপ্‌পো-পোঁ—

গুম্-গুম্ গুম্-গুম্ বু-বুম্ বুম্ম্!—প্রতিধ্বনি তুললো দূরের কামান। কাছাকাছি কয়েকটি মেশিন গান তার জবাব দিলে। রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ স্বরু হয়ে গেল।

সরোজ বুঝলে—এই স্থযোগ। পালাবার জন্য সে চঞ্চল হয়ে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে হুজন জাপশান্ত্রী তার হু'হাত ধরে আকর্ষণ করলো। সরোজের

একবার মনে হোল দুজনকে দুই ঘুষিতে ধরাশায়ী করে সরে পড়ে। কিন্তু তাদের পিছনে আরো ক'জন রয়েছে দেখে তাকে সে সংকল্প ছাড়তে হোল।

সামনের একটি টিনের শেডে তাকে বন্ধ করে রেখে জাপানীরা চলে গেল।

অন্ধকার শেডটির মধ্যে একটু জায়গা বেছে নিয়ে সরোজ বসে পড়লো। গুম্ গুম্ করে কেবলই কামানের আওয়াজ হচ্ছে, টিনের শেডের টিনগুলো ঝন্‌ঝন্ করে কাঁপছে। সরোজ টীনের গায়ে হেলান দিয়ে ঝিমুতে সুরু করলো।

বুম্‌ম্ করে আচম্বিতে গোলা এসে ফাটলো। টিনের শেডের খানিকটা উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেল আকাশের পানে, আর বাকী শেডটী হুড়মুড় করে এসে পড়লো সরোজের উপর। একটা অব্যক্ত আর্তনাদ করে সরোজ জ্ঞান হারালো।

সরোজ চোখ মেললো, মেলে সে বড় কম বিস্মিত হোল না; চোখের সামনে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে, দিব্যি নরম বিছানায় সে শুয়ে আছে। সে টিনের শেড নয়, মাথার উপর কালো রঙের কাঠের পাটাতন। তবে কি জাপানীরা তাকে জাহাজে তুলে নিয়ে চললো সেই দ্বীপে? সরোজ কিছুই বুঝতে পারলো না, উঠে বসলো, মাথাটা অত্যন্ত ভারী বোধ হোল। হাত দিয়ে দেখলো মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

ইতিমধ্যে একটী ছায়া পড়লো শয্যার উপর, অত্যন্ত পরিচিত গলায় কে বললো—কি বন্ধু, ঘুম ভাঙলো?

সরোজ মুখ ফেরালো, চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, বলে উঠলো—মাতাহারি!

—হ্যাঁ বন্ধু, আমি! শুধু আমি নয়, আমরা সবাই, ফাতু, কিউ, চ্যাংশো—সব।

—ডেভিড?

—না, কমরেড ডেভিড নেই।

—নেই? খুঁজে দেখেছিলে?

—আমরা সবাই খুঁজে দেখেছি। তোমাকেও যে খুঁজে পেয়েছি তা নেহাৎ অদৃষ্টের জোর বলতে হবে। তবে ওদের এবার যে মার দিয়েছি, তা ওরা সহজে ভুলবে না। ওদের উনিশখানা বোমারু প্লেন এবার আমাদের হাতে এসে পড়েছে।

মাতাহারি উল্লসিত স্বরে আরো অনেক কথাই বলতো, সরোজ তাকে বাধা

দিয়ে বল্‌লে,—আচ্ছা, আমাকে একবার সেখানে নিয়ে যেতে পার ? আমি নিজে একবার খুঁজে দেখবো !

ওদিক থেকে ফাতু এসে পড়েছিল, জিজ্ঞাসা করলে—কাকে খুঁজে দেখবে, কমরেড ?

—ডেভিডকে।

—কমরেড ডেভিডকে আমরা অনেক খুঁজেছি বন্ধু, ওখানকার প্রত্যেক হত ও আহত লোককে উল্টে পাল্টে দেখেছি, প্রত্যেকটা শেডের মধ্যে তল্লাস করেছি, যেখানে যেখানে তাকে পাওয়া সম্ভব কোন জায়গা বাদ দিইনি, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পায়নি। তাকে খুঁজতে খুঁজতে একটি শেডের নীচে এই জিনিষটা কুড়িয়ে পেয়েছি, তোমাকে দেবার জন্য রেখেছিলেম এই দেখ—ফাতু সোনার চেনে ঝুলানো একটা 'ক্রশ' সরোজের হাতে দিলে।

ক্রশটার নীচে একটি 'ডি' খোদাই করা আছে। সরোজ দেখেই চিনলে ডেভিডের গলায় ছিল ওটা। মানুষটা আজ কোথায় হারিয়ে গেছে, কিন্তু তার কণ্ঠলগ্ন ধাতুর টুকরোটি হারায়নি। যার জিনিষ সে নেই কিন্তু জিনিষটা ঠিকই রয়ে গেছে।

সরোজ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ক্রশটার পানে। তার দু'চোখ জলে ভরে উঠলো। চোখের সামনে ক্রশটা ক্রমশঃ ঝাপ্‌সা হয়ে অস্পষ্ট হয়ে এল। বন্ধুর শেষ স্মরণিকাটি সরোজ দুহাতে চেপে ধরলো বুকের উপর।

কোন এক সময় সরোজ একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল; তন্দ্রার ঘোরে সে স্বপ্ন দেখলো: এক নদীর তটে এসে দাঁড়িয়েছে, নদীর ওপর নিবিড় অন্ধকার; সেই অন্ধকারেও একটা সংকীর্ণ পথ দেখা যাচ্ছে, সেই পথ দিয়ে চলেছে এক দল যাত্রী, তাদের মধ্যে ডেভিডও আছে। চলতে চলতে হঠাৎ ডেভিড পিছু ফিরলো, মুখখানির মাঝে মাঝে পোড়া-ঘা জ্বল জ্বল করে উঠলো, মৃদু হাসতে চেষ্টা করে সরোজের উদ্দেশ্যে সে বললে—'দেখছ তো আমার মুখের চেহারা, এর প্রতিশোধ তোমাকেই নিতে হবে বন্ধু ··' সরোজ কি বলতে গেল, কিন্তু ডেভিডকে আর দেখা গেল না, অন্ধকারের বুকে তখন সে হারিয়ে গেছে।

সরোজের ঘুম ভেঙে গেল। ডেভিডের মুখখানি তখনও তার চোখের সামনে ভাস্‌ছে, ডেভিডের কথাগুলো বাজছে তার কাণে। সরোজ বিছানার উপর উঠে বসলো, আপন মনে বলে উঠলো—নিশ্চয় প্রতিশোধ নেব ডেভিড, প্রতিশোধ নেবই।

কাছে ছিল মাতাহারি, সরোজের শয্যার পাশে অপেক্ষা করার ভার নিয়েছিল সে। কাছে এসে বললে—কি কমরেড, আমায় কিছু বলছ ?

—তোমাকে !—সরোজ খানিকক্ষণ মাতাহারির মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তারপর বল্‌লে—না, তোমাকে তো আমি কিছুই বলি নি !

—এই যে কি বলছিলে ?

—ও কিছু না, তুমি ফাতুকে একবার ডেকে দিতে পার ?

মাতাহারি উঠে গেল।

ফাতু এলে সরোজ বললে—এই মাত্র ডেভিডকে দেখলেম, সে আমাকে বলে গেল প্রতিশোধ নিতে ! নাহলে তার মৃত আত্মার তৃপ্তি হবে না।

—কি করতে হবে বল ?

সরোজ এবার চুপ করে কিছুক্ষণ ফাতুর মুখের পানে চেয়ে রইল, কি করতে হবে সে কথা তো সে এখনও ভাবেনি। বললে—আমায় একটু ভাব্‌বার সময় দাও বন্ধু !

—বেশ, পরেই বলো।

—আর তুমিও ভেবে দেখো, কি আমরা করতে পারি।

ফাতু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

তারপর সরোজের ভাব্‌বার পালা। কি সে করবে ? কি করে এমন প্রতিশোধ নেওয়া যায়, যা চিরদিন জাপানীদের জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে ?

ভাবতে ভাবতে সহসা সরোজ চীৎকার করে উঠলো—ফাতু, ফাতু, কমরেড !

ফাতু ছুটে এল।

সরোজ বললে—কমরেড, একখানা সাবমেরিণ চাই। যে কোন রকমেই হোক্। টাকা তো আমরা পেয়েছি, তাই দিয়ে রুশিয়া হোক আমেরিকা হোক কি বৃটেন হোক—যে কোন দেশের কাছ থেকে একখানা সাব্‌মেরিণ কেনার ব্যবস্থা কর। সেই সাব্‌মেরিণ নিয়ে আমরা সমস্ত চীন সমুদ্র তোলপাড় করে তুলবো, যাতে একখানিও জাপানী জাহাজ আর চীনের বন্দরে এসে না ভিড়তে পারে। ডেভিডের মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিতে পারলে আমি সুস্থির হতে পারছি না।

ফাতু সরোজের কাঁধে একটী হাত রেখে বললে—অতো চঞ্চল হয়ো না বন্ধু, তুমি যেখানে আছ সেইটাই একটী সাব্‌মেরিণ।

—এটা সাব্‌মেরিণ !

—হ্যাঁ। তুমি তো আজ সাত-আট দিন অচেতন হয়ে পড়ে আছ। মাঝে মাঝে দু-দশ মিনিট তোমার জ্ঞান হোত, আবার তুমি অচ্ছন্ন হয়ে পড়তে, ইতিমধ্যে আমরা এই সাব্‌মেরিণখানি যোগাড় করেছি।

—কিনলে ?

—না। কেড়ে নিয়েছি। হোয়াঙ-হো নদীর মোহনায় চিলি উপসাগরে এই জাহাজখানি অপেক্ষা করছিল। এর সঙ্গে আরেকখানি জাহাজও ছিল। একদিন মাঝ রাতে সুযোগ বুঝে আমরা ক'জন এদিকে সোরগোল তুললেম। কেউ জাপানী কেউ-বা চীনা ভাষায় চীৎকার করে উঠলো, বার কয়েক বন্দুকেরও আওয়াজ করা হোল। জাপানী খালাসীগুলি ভাবলো নিশ্চয়ই ওদিকে লড়াই বেধেছে, তাড়াতাড়ি তারা ছুটে গেল ব্যাপার কি দেখবার জন্য, সেই অবসরে আমরা সাব মেরিণ দুখানি আক্রমণ করলেম। বিশেষ কেউ ছিল না, মিনিট দশ পনেরোর মধ্যেই দুখানি সাব্‌মেরিণ আমরা দখল করে ফেললেম। একখানি জাহাজকে সেইখানেই ডুবিয়ে দিতে হোল, তার কয়েকটা যন্ত্র ভেঙে বিগড়ে ছিল, সে সব সারাতেই বোধ হয় ওরা তীরে ভিড়েছিল। অপর জাহাজখানি নিয়ে আমরা সরে পড়লেম, তারই মধ্যে তুমি এখন আছ।

সরোজের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললে—এই সাব্‌মেরিণ আমাদের, ও-কে (O. K.) !

সরোজ ফাতুর ডান হাতখানি প্রীতি ভরে চেপে ধরলো।

ফাতু বল্‌লে—তুমি কখনও সাব্‌মেরিণের ভিতর দেখছ ?

সরোজ মাথা নেড়ে বল্‌লে—প্রত্যক্ষ দেখেনি, তবে বায়োস্কোপের ছবিতে দেখছি অনেকবার।

—চলো, তোমাকে সব দেখিয়ে আনি।

সরোজকে সঙ্গে নিয়ে ফাতু ও মাতাহারি সাব্‌মেরিণের ভিতরটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায় : প্রথমেই পরিচালন-কক্ষ। এই ঘরটি ডুবো জাহাজের ঠিক মাঝে অবস্থিত। এর সামনে টর্পেডো ঘর, আর পিছনে রান্নার ঘর ও বেতার-বার্তার ঘর। পরিচালন কক্ষ থেকেই ডুবো জাহাজ পরিচালনা করা হয়। 'ষ্টীয়ারিং গীয়ার', 'হাইড্রোপ্লেন গীয়ার', সুইচ্ বোর্ড, কম্‌পাস্, ম্যাপ, কোড্‌বই প্রভৃতি সব থাকে এই ঘরে। আর থাকে ডুবো জাহাজের চোখ পেরিস্‌কোপ্। এই ঘর থেকে পেরিস্‌কোপের চোঙটী বরাবর উঠে গেছে ডেকের উপর।

পরিচালন-কক্ষের মাথায় ডেকের উপর একখানি ছোট ঘর আছে, তার নাম

'কনিং-টাওয়ার। সেই ঘরের ভিতর লোহার মই আছে, ওইটাই সাব্‌মেরিণের ভিতরে আসার ও বাইরে যাবার একমাত্র পথ।

পরিচালন-কক্ষের সামনের ঘরখানি অন্যান্য ঘরের চেয়ে বড়। এটী টর্পেডো ঘর। এক পাশে ব্রাকেটের উপর সারি সারি টর্পেডো সাজান, টর্পেডো ছোঁড়ার দুটী চোঙ্, আর একদিকে 'এয়ার-সিলিণ্ডার্স্।'

ফাতু বল্‌লে—এই টিউবের মধ্যে টর্পেডো ভরে, সিলিণ্ডার্সে যে বাতাস আছে তার চাপ দিলেই টর্পেডো বাইরে গিয়ে পড়বে। তারপর জলে একবার পড়লে, তখন নিজের জোরেই ছুটবে নির্দিষ্ট দিকে।

বেতারবার্তা-ঘরের পিছনে ইঞ্জিন ঘর। ভাসন্ত ও ডুবন্ত অবস্থায় চালাবার জন্য দু'রকম ইঞ্জিন আছে এই ঘরে।

ফাতু বললে—নীচে আরেকটী তলা আছে সেখানে আর যাব না, সেখানে দেখবার কিছু নেই। সেটিকে তুমি ট্যাংকের তলা বলতে পার। এই ট্যাংকগুলো জলে ভর্তি হলেই জাহাজ ডুবে যাবে, আবার বাতাসের চাপে জল বের করে দিলেই জাহাজ হাল্কা হয়ে ভেসে উঠবে। এই ট্যাংকগুলির উপরেই ডুবো জাহাজের যত কারসাজি। যে জাহাজ যত তাড়াতাড়ি এই ট্যাংকগুলি ভর্তি করতে আর খালি করতে পারে, সেই জাহাজ তত সহজে শত্রু পক্ষের ক্ষতি করতে পারে।

সরোজের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলে—এরা পরিচালক এখন কে, তুমি না আর কেউ?

—আমি আর চ্যাংশো। চ্যাংশো আগে যন্ত্র-বিজ্ঞানী (মেকানিক্যাল্ ইন্‌জিনীয়ার) ছিল, কলকব্‌জার ব্যাপার সে আমার চেয়ে ভালো বোঝে, তারই উপর ইঞ্জিন-ঘরের ভার আছে।

সরোজ ফাতুর দু'খানি হাত চেপে ধরলো, বললে—তুমি অসাধ্য সাধন করেছ ফাতু, তোমাকে আমি কি বলে যে প্রশংসা করবো, তা ভেবে পাই না।

—এখনও প্রশংসা করার মত কিছু করিনি বন্ধু, আগে দু-একখানা জাপানী জাহাজ ডুবোই, তখন প্রশংসা করো।

—দু-একখানা নয় বন্ধু, দুশো খানা। এই একখানা সাব্‌মেরিণ নিয়ে আমরা দুশো খানা জাপানী জাহাজ ডুবোবো। ডেভিডের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো, আয়েষা ও রণজিতের তর্পণ করবো, না হলে আমি মানুষ নামের অযোগ্য। ভারতবাসী কি শুধু ভীরু কাপুরুষ, তাদের মাঝে কি সিংহ-শিশু জন্মায় না? আমি দেখিয়ে দেব আমরা বাঘের বাচ্ছা!

সরোজের দু চোখে আগুনের ফুল্‌কি দেখা দিল।

জাহাজ দুলে উঠলো, কুল কুল করে জলের একটা শব্দ হোল, ফাতু বললে—ওই ট্যাংক ভর্তি হচ্ছে, জাহাজ এবার জলে ডুবতে সুরু করলো।

কমরেড কিউ ছুটে এসে বললে—একখানি জাপানী জাহাজ দেখা গেছে।

সরোজরা তাড়াতাড়ি ফিরে এলো পরিচালন-ঘরে। ফাতু পেরিস্‌কোপের 'আই-পীসে'র উপর ঝুঁকে পড়লো, ক'মুহূর্ত পরে বাক্‌-নলটী মুখে দিয়ে বলে উঠলো—এই ঠিক আছে···উত্তর-পূবে হাজার গজ······

জাহাজ চলতে সুরু করলো, প্রথমে একটী ঝাঁকানি খাওয়া ছাড়া আর কিছু টের পাওয়া গেল না।

ফাতু বললে—একখানি জাপানী ডেষ্ট্রয়ার, দুমিনিটের মধ্যে বাছাধনকে শেষ করে দিচ্ছি। আরেঃ, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন কমরেড, আরো তো একটা পেরিস্‌কোপ রয়েছে—ওই যে—

ফাতু সরোজকে দু'নম্বর পেরিস্‌কোপটি দেখিয়ে দেয়। তার 'আইপীসের' উপর চোখ রাখতেই সরোজের সামনে ভেসে উঠলো গোল চাকার মত ঢল্‌ঢলে সমুদ্র আর ফিকা নীল আকাশ। সেই আকাশ ও সমুদ্র যেখানে গিয়ে মিশেছে তারই পাশ দিয়ে একখানি জাহাজ মাথার-উপর ধোঁয়ার একটি রেখা টেনে এগিয়ে চলেছে। মাথার উপর রক্ত-সূর্য-লাঞ্ছিত পতাকা।

ক্রমশঃই জাহাজখানি কাছে আসতে লাগলো, সাব্‌মেরিণটী ঘুরে এল জাহাজের সামনের দিকে। যখন আর প্রায় পাঁচ-ছ'শো গজ দূর আছে, এমন সময় ফতুর গলা শোনা গেল—মোটর থামাও···এক নম্বর টিউব ভর্তি কর···ছাড়ো······

স্যাঁৎ করে একটা শব্দ হোল, তারপরেই দেখা গেল একটি টর্পোডো ঝক্‌মকে টিনের মাছের মত জলের সমান্তরালে পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে সামনের জাহাজখানির দিকে।

কয়েকটি সেকেণ্ড······

তারপরেই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দে জল তোলপাড় করে তুললো—টিনের মাছটি ডেষ্ট্রয়ারের গায়ে লেগে ফেটে পড়লো। শুধু ফাটলো না, জাহাজখানির একটি অংশকে ভেঙেচুরে চারিপাশে ছড়িয়ে দিলে।

সরোজ বলে উঠলো,—হায় হায়, একটা ভালো ক্যামেরা থাকলে একখানি ছবি তুলে নিতাম। আই-পীসের উপর ক্যামেরার ফোকাস্‌ করলেই একখানি চমৎকার ছবি উঠতো।

ফাতু বললে—যাই বল এতদিনে জাপানী টর্পেডো সত্যই জাপানীদের কাজে লেগেছে, হাহাঃ।

আবার দুজনে আইপীসের উপর চোখ রাখলোঃ ডেষ্ট্রয়ারখানিতে ততক্ষণে আগুন ধরে গেছে। ক'খানি জীবনতরী জলে নাবানো হচ্ছে। ডেকের উপর দিয়ে লোকজন এদিক ওদিক করছে। জাহাজের গতি গেছে থেমে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আরেক বিস্ফোরণ। ইঞ্জিন-ঘর অথবা বারুদ-ঘর আগুনের ছোঁয়া লেগে ফেটে পড়লো বোধহয়। সমস্ত জাহাজখানি ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল। একখানি জীবনতরী সেই আলোড়ন সইতে না পেরে ক'জন আরোহী শুদ্ধ উল্টে গেল। সরোজ বলে উঠলো—ঠিক হ্যায়!

—সমুদ্রে এই আমাদের প্রথম সাফল্য—ফাতু চীকার করে উঠলো—চ্যাং-হ্বা-মিন-কুও!

সাব্‌মেরিণের সকলে সমবেত কণ্ঠে স্বর তুললো—চ্যাং-হ্বা-মিন কুও!

তারপর বিধ্বস্ত ডেষ্ট্রয়ার ও তার নাবিক-দলকে পিছনে ফেলে সাব্‌মেরিণটী জলের ভিতর দিয়ে যথাপূর্ব অগ্রসর হোল। জলের উপর পেরিস্‌কোপের দুটী ছোট চোঙ্‌ চিক্‌মিক্‌ করতে লাগলো শুধু।

তারপর ঘণ্টাকয় যথেষ্ট উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কেটে যায়। শুধু উত্তেজনাই নয় আনন্দও আছে—শত্রুর সর্বনাশ করার আনন্দ।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পর পর তিনখানি জাপানী জাহাজ ডুবলোঃ দিগ্বলয়ের প্রান্তে ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা দেখতে পেলেই জলের উপর সাব্‌মেরিণের চোখ সজাগ হয়ে ওঠে, সন্তর্পণে জাহাজখানির কাছে এগিয়ে যায়—হাজার গজের মধ্যে এসে পাশাপাশি সাব্‌মেরিণ রেখে আদেশ দেয়—'টর্পেডো ছোড়ো!' বিস্ফোরকে ভরা টিনের মাছটী ছুটে যায়—তারপরেই জাহাজের গায় প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ এবং ধীরে ধীরে জাহাজ ডুবি!

জাপানীদের কাছে এ একেবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। স্থলযুদ্ধে কত সুবিধা পেয়ে ও সংখ্যায় কত বেশী হয়েও যে-চীনেরা ক্রমশঃ হটে যাচ্ছে পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে, তারা আজ আবার কোন সাহসে জলে এসে নামলো? তাদের না ছিল একখানি ভালো যুদ্ধ-জাহাজ, না ছিল জোরালো নৌ-বাহিনী, আজ তারা আবার সাব্‌মেরিণ পেলে কোথা থেকে? বৃটিশ ও মার্কিণ নৌ-বহরের মত শক্তিশালী

জাপানী জল-বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান করা তো সহজ কথা নয়? এর মধ্যে তাদের চিরশত্রু রুশের নিশ্চয়ই কোন কারসাজি আছে।

জাপ এড্‌মিরালদের কপাল কুঁচকে উঠে—চব্বিশ ঘণ্টায় তিনখানি রসদ বোঝাই জাহাজ-ডুবি কি সহজ কথা!

জাপ সংবাদ অফিস ডোমেই-এজেন্সি থেকে সারা বিশ্বে সংবাদ প্রচারিত হোল : চীন ও রুশের মধ্যে নতুন সামরিক চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তির ফলে রুশিয়া চীনকে নব্বুইখানি সাব্‌মেরিণ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ইতিমধ্যে দশখানি সাব্‌মেরিণ চীনাদের হস্তগত হয়েছে, আগামী ছ'মাসের মধ্যে বাকীগুলিও তারা পাবে। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চীন সাগরে এই সব ডুবো জাহাজের সঙ্গে আমাদের কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। সাব্‌মেরিণ পরিচালনায় দক্ষতা না থাকায় চীনারা কোন সুবিধা করে উঠতে পারে নি। আমাদের সুদক্ষ নৌবাহিনী ইতিমধ্যেই শত্রুপক্ষের দুখানি সাব্‌মেরিণ জলমগ্ন করেছে, এবং আর কয়েক-দিনের মধ্যেই 'তুঙ্‌হাই' (চীন সাগর) এর সমস্ত জলপথ আমরা নিষ্কণ্টক করার আশা রাখি।

সারা বিশ্বের সংবাদ-পত্র পাঠকেরা এই কথাই বিশ্বাস করলো।

তারপর দিন দুই আর একখানিও জাপানী জাহাজ চোখে পড়লো না। সারাটা দিন শুধু চুপ করে জলের নীচে ডুবে থাকা। সাব্‌মেরিণের ভিতরে গুমোট বাতাসে প্রাণ আই-ঢাই করে উঠে, স্যাঁৎ-সেঁতে আবহাওয়ার মধ্যেও গায় ঘাম দেখা দেয়। তথাপি শত্রুপক্ষের চোখে পড়ার ভয়ে দিনের আলোয় জলের উপর ভেসে ওঠার উপায় নেই। জলের উপর তারা ভেসে ওঠে রাত্রির অন্ধকার যখন গভীর হয়, যখন কালো জলের বুকে সাব্‌মেরিণের কালো দেহ সহজে ঠাহর করা যায় না। তখন ডেকের উপর বসে বসে মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত বাতাসে তারা বুক-ভরে নিঃশ্বাস নেয়, দেহ ও মনকে সতেজ করে পরবর্তী সারাটা দিনের জন্য।

সরোজ একসময় হেসে বললে—দুদিন ধরে একখানিও জাহাজের দেখা নেই তুংচি, ওরা কি শেষ পর্যন্ত আমাদের ভয়ে জলপথ ছেড়ে দিলে নাকি?

ফাতু বললে—জলপথ ছেড়ে যাবে কোন পথে? আকাশে উড়ে যেতে হলে যে পেট্রল খরচ হয়, তত পেট্রল যোগাবে কে? বছর দুই লড়াই চালাবার ফলে ওদের দেশে তো অত্যন্ত অর্থাভাব দেখা দিয়েছে, তার উপর আবার নতুন খরচ

করার শক্তি ওদের কোথায় ? এই জলপথেই ওদের আসতে হবে, তা সে আজই হোক আর দুদিন পরেই হোক !

ফাতুর কথাই সত্য। সেদিন শেষরাতে তখনও তারা ডেকের উপর বসে গল্প করছে, এমন সময় দূরে আকাশের গায় কয়েকটা মিট্‌মিটে আলো দেখা গেল, ফাতু বললে—সবাই নীচে চলো, এখনই জাহাজ ডোবাতে হবে !

ডেক থেকে সকলে নেমে আসে, ব্যালাষ্ট-ট্যাংকে জল ভরার শব্দ শোনা যায়, মিনিটখানেকের মধ্যেই জাহাজখানি জলের নীচে অন্তর্হিত হয়। তারপর তারা অগ্রসর হয় সেই আলোর দিকে।

দুখানি জাহাজকে ঘিরে চারখানি ডেষ্ট্রয়ার এগিয়ে আসছিল। দৈত্য পলিফেমাসের একক চোখের মত ডেষ্ট্রয়ারের সামনে এক একটা জোরালো সন্ধানী আলো জলের বুকে আধমাইল জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও এতটু ফাঁক নেই। মাস্তুলের মাথায় দাঁড়িয়ে একটি লোক বাইনোকিউলার চোখে দিয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে চারিপাশে। পেরিস্‌কোপের চোঙটা তার নজরে পড়তে পারে, সেটাকেও জলের নীচে ডুবিয়ে ফেলতে হোল। সাব্‌মেরিণ কিন্তু সমভাবেই এগিয়ে চললো ডেষ্ট্রয়ারগুলোর দিকে।

ওদিকে কিন্তু ডেষ্ট্রয়ারের শব্দধারক যন্ত্রে সাব্‌মেরিণের শব্দ ধরা পড়েছে। পেরিস্‌কোপের চোঙ্ দেখতে না পেলেও সাব্‌মেরিণটা যে জলের নীচ দিয়ে তাদের দিকেই আসছে, শব্দ উত্তর-উত্তর জোরালো হচ্ছে শুনে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ একখানি ডেষ্ট্রয়ারের কম্যাণ্ডার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো, আদেশ করলে—ডেপ্‌থ্ চার্জ !

বুম্ বুম্ বুম্ !

পাশের ডেষ্ট্রয়ারগুলিতেও তখন সেই আদেশের প্রতিধ্বনি উঠলো—ডেপ্‌থ্ চার্জ ছাড়ো !

বুম্ বুম্ বুম্ !

চারিপাশের জলে মাতামাতি সুরু হয়ে গেল। ডেপ্‌থ্ চার্জের বিস্ফোরণে জলস্তম্ভের পর জলস্তম্ভ শান্ত সমাহিত জলরাশিকে উত্তাল করে তুললো।

—বুম্ !—সংঘাত ও আলোড়নে ডুবো জাহাজের ভিতরকার সব আলো নিভে গেল।

—বুম্ !—আরেক বিস্ফোরণে কম্পাস গেল বিগড়ে।

সতর্ক হবার আগেই গোটা দুই ডেপ্‌থ চার্জ সাব্‌মেরিণটার মাথার উপর ফাটলো। সরোজ চীৎকার করে উঠলো—নাবো নাবো, শিগ্‌গীর নাবো!

নীচের সবকটি পাম্প তখনই খুলে দেওয়া হোল, কুল কুল করে ট্যাংক্‌গুলি ভর্তি হতে সুরু হোল, ডুবো জাহাজও ডুবতে লাগলো গভীর জলে।

একেবারে দু'হাজার ফুট নীচে নেমে ইঞ্জিন বন্ধ করে তারা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। জাপানীদের ডেপ্‌থ চার্জ তখনও মাথার উপর ফাটছে বুম্‌ বুম্‌ করে, তবে অতটা গভীরতায় ডুবো জাহাজখানিকে আঘাত করতে পারছে না এই যা সুবিধা।

কিছুক্ষণ কেটে গেল।

ইতিমধ্যে খানিকক্ষণ ঠুক্‌ঠাক্‌ করে চ্যাংশো আলো সারিয়ে ফেললে।

আলো জ্বললেও কারুর কোন কাজের তাড়া দেখা গেল না। শব্দধারক যন্ত্রে তখনও ডেষ্ট্রয়ারের ইঞ্জিনের রেশ শোনা যাচ্ছে।

কোন এক সময় চ্যাংশো এসে বললে—কম্পাস্‌ সারান গেল না।

ফাতুর মুখে চিন্তার রেখা পড়লো, বললে—না সারানো গেলে আর কি করা যাবে!

আদেশ দিলে—ওপরে ভেসে উঠো।

কিছুক্ষণের মধ্যে পেরিস্‌কোপের চোঙ্‌টি আবার জলের উপর ভেসে উঠলো। উষার অস্পষ্ট আভা তখন দেখা দিয়াছে আকাশের গায়, সেই আলোয় দেখা গেল দিগ্বলয়ের শেষ সীমায় দুখানি ডেষ্ট্রয়ারের জোরালো সন্ধানী আলো তখনও জ্বলছে। 'আই-পীসের' উপর চোখ রেখে ফাতু বললে—ওরা ভেবেছে 'কনভয়' দিয়ে সুরক্ষিত করলেই ওদের জাহাজ রক্ষা পাবে, আমি কিন্তু ছাড়ছি না!

আদেশ করলে—বাঁ দিকে ফিরে ওদের সোজা অনুসরণ কর!

সহসা অতর্কিতে কাছাকাছি একটা কলকল শব্দ পেয়ে সকলে সচকিত হয়ে উঠলো। ফাতুর সামনে আই-পীসের উপর ভেসে উঠলো আরেকটা পেরিস্‌কোপের ছায়া। ক্রমশঃই সেটা এগিয়ে আসছে, কাছে—আরো কাছে।

আর যাই হোক, ওটা যে শত্রুপক্ষের সাব্‌মেরিণ একথা বুঝতে ফাতুর এক মুহূর্ত দেরী হোল না, বাক্‌-নলে আদেশ করলে—সামনের দিকে···এঁকে বেঁকে··· দ্রুত···

সরোজ জিজ্ঞাসা করলে—কী ব্যাপার তুংচি, কোন জলজন্তু নাকি?

—সাব্‌মেরিণ। শত্রুপক্ষের।

কথা শেষ হতে না হতে ঘটাং করে এক ধাক্কা এসে লাগলো। প্রচণ্ড সংঘাতে সরোজদের সাব্‌মেরিণটি এক পাক ঘুরে গেল। আলোগুলো আবার সব নিভে গেল। ভিতরের মানুষগুলোও এদিক ওদিকে ছিট্‌কে পড়লো, কিন্তু কারুর মুখ দিয়ে একটুকু শব্দ বেরুলো না।

আধুনিক সাব্‌মেরিণ একপাক ঘুরে আবার ঠিক হয়ে গেল। ঘরের চারিপাশে গদি আঁটা ছিল, আর চারিপাশে জিনিষপত্র ষ্ট্র্যাপে বাঁধা ছিল, কোন ক্ষতি হোল না, আঘাতও লাগলো না কারুর এতটুকু।

সরোজ সামনের জানালাটি খুলে দিলে। পুরু কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা গেল : সাগরের কালো জল আলোয় আলো হয়ে গেছে। প্রথম আঘাত করে সাবমেরিণটি পিছিয়ে গেছে, জল-ভেদী জোরালো আলো ফেলে দেখে নিচ্ছে তাদের অবস্থাটা। তারপর হয়তো এখনই ছুটে এসে আবার আরেক আঘাত করবে। জাপানীরা সাব্‌মেরিণ দিয়েই সাব্‌মেরিণ ঘায়েল করার মতলব করেছে বোধ হয়।

এবার সরোজ আদেশ দিলে—পিছিয়ে যাও! তারপর ভেসে ওঠো, একবারে জলের উপরে!

পিছিয়ে এসে উপরে ভেসে উঠতে উঠতে শত্রু সাব্‌মেরিণটি ছুটে এসে আবার আঘাত করলো। তবে এবারকার আঘাতটা তেমন গুরুতর নয়। সরোজরা খানিকটা উপরে উঠে পড়ায় শত্রুপক্ষের লক্ষ্যভ্রষ্ট হোল, তারা পিছলে এসে পড়লো সরোজদের নীচে। সরোজদের একটা ঝাঁকানি লাগলো শুধু আর কিছুই নয়।

সরোজ তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলে—ট্যাংক্ ভর্তি কর, তাড়াতাড়ি নীচে নাবতে থাক, ওই সাবমেরিণটা যেন আমাদের নীচেই থাকে!

হুস্ হুস্ করে সরোজদের ডুবোজাহাজ ডুবতে স্থরু করলো।

জাপানীরা এমন ব্যাপার প্রত্যাশা করেনি। তাদেরকে নিয়ে যে চীনা ডুবোজাহাজখানি ডুবতে স্থরু করবে একথা তারা ভাবতেই পারেনি। ব্যাপার স্থবিধা নয় দেখে তাদের কম্যান্‌ডার তখনই আদেশ দিলে—সব কটা ট্যাংক্ এখনই খালি করে ফেল, তারপর 'হোরাইজেণ্টাল্ রাডারের' সাহায্যে লম্বালম্বি ভাবে জাহাজখানিকে দাঁড় করিয়ে ফেল জলের মধ্যে।

জলের মধ্যে একটি সাব্‌মেরিণ দিয়ে আরেকটা সাব্‌মেরিণকে চেপে রাখা সহজ নয়, তাছাড়া সরোজরা একেবারে নবিশ। দেখতে দেখতে জাপানী ডুবো-জাহাজটা তাদের জাহাজের নীচে একটি চুরুটের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে

তারপর পিছ্‌লে পাশ কাটায়। সরোজরা বোঝে, ওকে ধরে রাখার উপায় নেই। ফাতু বল্‌লে—ছাড়ো টর্পেডো—

সরোজ বললে—না না, এখন স্থবিধা হবে না, একটু তফাতে সরে যাক আগে।

জাপানী সাব্‌মেরিণটী বরাবর উপর দিকে উঠতে থাকে কিন্তু বেশীদূর যেতে না যেতেই সরোজ ব্যাটারী চার্জ করে। টিউবের মধ্যে টর্পেডো ভরাই ছিল, স্‌-স্‌-স্‌ করে শুধু একটা শব্দ ওঠে তারপরেই বুম্‌ম্‌!

জাপানী ডুবোজাহাজটিকে আর জলের উপর মাথা তুলতে হোল না, টর্পেডোটি ফাটা মাত্রই একটা ডিগবাজী খেয়ে লট্‌পট্‌ করতে করতে জলের নীচের দিকে নামতে স্থরু করলো। সে বিস্ফোরণের ঢেউ সরোজদের সাব্‌মেরিণেও ধাক্কা দিলে। সরোজ বললে—ঠিক হ্যায়! ও কে. (O. K.)!

তাদের পাশ দিয়ে জাপানী ডুবো-জাহাজখানি নীচে নেমে গেল, তার ভিতর থেকে গোলযোগের একটা মৃদু রেশ ক্ষণেকের জন্য তাদের কাণে এসে বাজলো শব্দধারক যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। অতোগুলি মানুষের আসন্ন সলিল সমধি—তা হোক না তারা শত্রু—সরোজকে বারেক বিচলিত করে তুল্‌লো। তারপরেই ফাতুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—সারফেস্‌ ষ্টেশন, ওপরে ভেসে ওঠো।

হুস্‌ হুস্‌ করে ট্যাংকগুলো খালি হতে স্থরু হোল।

পেরিস্‌কোপটি জলের উপর ভেসে উঠলে দেখা গেল: খানিক আগে সূর্য উঠেছে, তার রক্তিমাভার রেশটুকু এখনও সাগরের বুক থেকে মিলিয়ে যায়নি। দিক সীমার শেষ অবধি প্রশান্ত নিরবচ্ছিন্ন জলধি। ডেষ্ট্রয়ারগুলি আর কোনদিকেই দেখা যায় না।

কাছাকাছি জলের উপর বুদ্বুদ উঠতে লাগলো। তারপর এক ঝলক তেল, তারপর আবার বুদ্বুদ। ফাতু ও সরোজ পাশাপাশি দুটি আইপীসের মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেই দিকে। একেকটি বুদ্বুদ ফেটে যাচ্ছে, তার জায়গায় আবার নতুন বুদ্বুদ ফুটে উঠছে। জাপানী সাব্‌মেরিণটি তাহলে সত্যই ডুবেছে। ডুবে-যাওয়া ডুবো-জাহাজের দুর্দান্ত মানুষগুলির শেষ নিঃশ্বাস অসীম জলরাশির বুকে কয়েকটি বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছু নয়। অনন্ত কালের ইতিহাসে খণ্ড খণ্ড মানব জাতির বিজয় অভিযানের অহঙ্কারও বুঝি এমনই ক্ষণস্থায়ী।

কিছুক্ষণ পরে বুদ্বুদও আরও ওঠে না। ভাসমান খানিকটা তেল জলের বুকে দোল খেতে থাকে, তার উপর সূর্যকিরণ পড়ে রামধনুর রং ফলায়। মনে হয় মৃত্যুশীল মানুষের দুর্বল অহমিকা দেখে ও যেন বিধাতার বিদ্রূপের হাসি।

কিছুক্ষণ পরে ফাতুর আদেশ শোনা গেল—চালাও!

সাব্‌মেরিণের ইঞ্জিন আবার ঝিক্ ঝিক্ করে সাড়া তুললো।

সাংহাই বন্দর।

বন্দরের চারিপাশে ডেষ্ট্রয়ার আর গানবোট, তটের উপর বড় বড় বিমান-ধ্বংসী কামান। চীন আক্রমণ করে সবার আগে জাপানীরা এই বন্দরটি দখল করেছে, এবং ভালভাবে সুরক্ষিতও করেছে। চীনে আসার এইটিই এখন তাদের প্রধান প্রবেশ্‌-পথ।

ডেষ্ট্রয়ারের পাহারায় যুদ্ধাস্ত্র বোঝাই চারখানি জাহাজ এসে পৌঁছলো বন্দরে। তখন সন্ধ্যা হতে বেশী দেরী নেই। তু'খানি জাহাজ খালাস করতে করতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কিন্তু বন্দরে একটি আলোও জ্বললো না। কদিন ধরে মাঝে মাঝে চীনা-প্লেন এসে হানা দিচ্ছে, সেই জন্যই আলো নিষিদ্ধ। তাও তু-দশখানা প্লেন এলে আকাশ যুদ্ধের সুবিধা হয়, চীনারা কিন্তু আসে একা-একা। অথচ একখানি প্লেন এসে যে ক্ষতি করে যায়, দশখানি প্লেনেও অনেক সময় সে ক্ষতি করতে পারে না। তারা যেন মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়েই আসে।

কিন্তু আলোর অভাবে তো আর কাজ বন্ধ থাকতে পারে না, কাজেই মাথা-ঢাকা ছোট ছোট হাত-লণ্ঠন নিয়ে জাপানী সেনারা জাহাজ থেকে সমভাবেই মাল নামাতে থাকে।

সেই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বন্দরের অদূরে কখন যে সরোজদের সাব্‌মেরিণটী ভেসে উঠেছে, জাপানীরা তা জানতেও পারেনি। সে অন্ধকারে তা লক্ষ্য করাও সম্ভব নয়।

সরোজ বললে—কামান দাগি?

ফাতু বললে—পাগল নাকি! একটী গোলা পড়ামাত্রই ওরা সন্ধানী আলো ফেলে আমাদের দেখে নেবে, তারপর চারিপাশ থেকে আমাদের ঘিরে ধরবে, তখন ডুবেও রেহাই পাওয়া যাবে না। সেই সব ভেবেই আমি যা মতলব করেছি সে-ই ভালো, আমি নেবে যাই, তোমরা সন্তর্পণে এখানে জলের নীচে অপেক্ষা করতে থাক, আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি।

—তুমি যে ফিরে আসবেই তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই।

—যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনের কোন নিশ্চয়তা তো থাকে না বন্ধু, মানুষ যুদ্ধ করতে আসে মরবার জন্যই—মৃত্যুকে এখানে সহজভাবে গ্রহণ করাই ভালো।

—ওটা মানুষের জ্ঞানের কথা বন্ধু, মনের কথা নয়—যে মরলো সে তো ফুরিয়ে গেল, কিন্তু তার আত্মীয়-বন্ধু যারা রইল তাদের মন তো সেটাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না।

—এ তো পুরাণো কথা বন্ধু। বুদ্ধদেব আড়াই হাজার বছর আগে জগতকে জ্ঞানের আলো দিয়ে গেলেন, যিশু মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে জাগাবার জন্য ক্রুশে ঝুললেন, কিন্তু মানুষের মন এতদিনেও তার স্বভাব ছাড়েনি। আজও লোভী মানুষ পরস্পরের দিকে কামান দাগছে, আজও নিরীহ ছেলেমেয়েদের উপর বোমা ফেলতে এতটুকু বাধছে না। এদের কামানের সামনে বুক পেতে দিলে এরা শিখবে না, এদের হাত থেকে কামান কেড়ে নিতে হবে, তবে এরা শিখবে। এবং এই কামান কাডতে যারা যাবে, তাদেরকে খালি হাতে অহিংসার বাণী নিয়ে গেলে চলবে না, তাদেরকেও কামান নিয়ে যেতে হবে। আমরা সেই জন্যই লড়ছি। যাক্ ভাই, চললেম,—

সরোজ বললে—তোমার সঙ্গে আমি গেলে ভালো হোত!

—তা হয় না বন্ধু, তুমি আমাদের সম্মানিত অতিথি। একে একে সবাই গেছে, তুমি একা অবশিষ্ট আছ, তোমায় কখনও আমি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি! যদি ফিরে আসি তো আবার দেখা হবে—চাং-হ্বা-মিন-কুও!

সকলের কাছে বিদায় দিয়ে ফাতু কণিং-টাওয়ারের ঢাক্‌না খুলে নিঃশব্দে জলে নেবে গেল।

কয়েকমুহূর্তের মধ্যে সাব্‌মেরিণটি আবার জলের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল, পেরিস্‌কোপের মাথাটি শুধু চিক্‌চিক্ করতে লাগলো জলের উপর।

অন্ধকার জলরাশি ঠেলে নিঃশব্দে ফাতু এগিয়ে চললো। যে জাহাজখানি থেকে মাল নাবানো হচ্ছিল, তার পিছনের একখানি জাহাজ থেকে একটি চেন ঝুলছিল, ফাতু এসে সেই চেনটী ধরলো। কোন শব্দ হোল না, কেউ জানতেও পারলো না।

চেন ধরে ফাতু উপরে উঠতে স্বরু করলো।

পোর্টহোলের পাশ দিয়ে চেনটি বরাবর উপরের ডেকে চলে গেছে। প্রথম পোর্টহোলের পাশে এসে ফাতু থামলো। শিকলে ঝুলতে-ঝুলতে কোমরে বাঁধা একটি পলিতা আর কয়েকটি ডিনামাইট্ ষ্টিক্ বাহির করলে। পলিতার এক প্রান্তে ষ্টিকগুলো জড়িয়ে পোর্টহোলের ভিতরে ঝুলিয়ে দিলে। তারপর সিগারেট-লাইটার বাহির করে পলিতার আরেক প্রান্তে আগুন ধরিয়ে দিলে। অন্ধকারে জাহাজের

পাশে অকারণে একটি আলো জ্বলে উঠতে দেখে দু-এক জন জাপ-শান্ত্রীর সেদিকে দৃষ্টি পড়লো কিন্তু ব্যাপারটা কি তা ভালো করে বোঝবার আগেই, আলোর শিখা অদৃশ্য হয়ে গেল। যারা সে আলো লক্ষ্য করেছিল তারা অপেক্ষা করতে লাগলো আবার আলোটি দেখার জন্য।

একে একে মুহূর্ত-কয় কেটে গেল, আলোটি আর জ্বললো না, তার-পরেই সহসা প্রচণ্ড এক শব্দ তুলে, জাহাজখানির ভিতর থেকে আগুন ছিট্‌কে পড়লো চারিপাশে।

বুম্ বুম্ বুম্।—জ্বলন্ত পলতার স্পর্শে ডিনামাইটের ষ্টিক্‌গুলি একটির পর একটি ফাট্‌তে লাগলো।

জাহাজখানির ভিতরে ছিল যুদ্ধের রসদ, যত গুলি গোলা আর বোমায় বোঝাই। আগুনের ছোঁয়া পেয়ে সব ফাটতে সুরু করে দিলে একসঙ্গে।

একটা প্যাকিং কেস্ ফাটে। তারপর আবার একটা। তারপর আবার এক বিস্ফোরণ। তারপর আবার!

এক বাণ্ডিল চীনা-পট্‌কায় একসঙ্গে আগুন দিলে যেমন হয়, এও ঠিক তেমনই। একটী করে প্যাকিং-কেস্ ফাটে আর গুলি গোলা ছিট্‌কে যায় যার যেদিকে সুবিধা। দু-একটা আকাশে উঠে যায় হাউই বাজীর মত, কোনটি আবার লাফিয়ে গিয়ে পড়ে পাশের জাহাজে। দেখতে দেখতে পাশাপাশি আরো দুখানি জাহাজে আগুন ধরে যায়

আগুনের দীপ্তিতে সমস্ত সাংহাই বন্দর আলোয় আলো হয়ে গেল, সাগরের জলও বহুদূর পর্যন্ত তরল আগুনের মত লালে লাল হয়ে উঠলো। চারিপাশের জাহাজগুলি বিপদ কাটাবার জন্য তাড়াতাড়ি একটু তফাতে সরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো, আগুন নিভাবার জন্য সোরগোল পড়ে গেল চারিদিকে।

ফাতু তখন সকলের অলক্ষ্যে সাবমেরিণে ফিরে চলেছে। খানিকটা ডুব-সাঁতার কাটছে, মাথাটা এক-একবার জলের উপর তুলছে, দু-একটা নিঃশ্বাস ফেলার জন্য, তারপর আবার ডুব।

পেরিস্‌কোপের মধ্যে দিয়ে সরোজ দেখলে ফাতু আসছে। কাছাকাছি এলে সরোজ আদেশ দিলে—সারফেস্ ষ্টেশন—ভেসে ওঠো।

জাহাজ জলের উপর না ভাসলে তো আর ফাতু ভিতরে আসতে পারবে না।

ওদিকে একখানি ডেষ্ট্রয়ার থেকে দুজন জাপ সৈনিক ফাতুকে দেখতে পেয়েছিল! জ্বলন্ত জাহাজের আলোয় ফাতুকে অনুসরণ করতে তাদের দৃষ্টি এতটুকু বাধলো

না। তারপর যখন তিমি মাছের পিঠের মত একটি সাব্‌মেরিণের কনিং-টাওয়ার ক্রমশঃ ভেসে উঠতে দেখা গেল, তখন তারা আর সবাইকে ডেকে দেখালে। কম্যাণ্ডিং অফিসার তখনই আদেশ দিলে—'ডেপ্‌থ্‌ চার্জ' চালাও!

এক মিনিটের মধ্যে ডেকের দুটি ছ' ইঞ্চি কামানের মুখ থেকে 'ডপ্‌থ্‌চার্জ' ছোড়া স্বরু হোল।

কনিং টাওয়ার ও ডেকের খানিকটা ভেসে উঠেছে, কনিং-টাওয়ারের ঢাক্‌না খুলে ফাতু সবে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় হাতুড়ির মত একটি ডেপ্‌থ্‌-চার্জ ঘুরতে ঘুরতে এসে ফাটলো একেবারে কানিং-টাওয়ারের গায়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সংঘাতে কনিং-টাওয়ারের খানিকটা তুব্‌ড়ে গেল, ফাতু মুহূর্তমধ্যে কোথায় যে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো তা আর দেখাই গেল না। সাব্‌মেরিণটা থর থর করে কেঁপে উঠলো।

বুম্‌ম্‌—সঙ্গে সঙ্গে আবার এক ডেপ্‌থ্‌-চার্জ। পেরিস্‌কোপের দুটী চোঙই উড়ে গেল, ভিতরের যন্ত্রপাতি কোথায়-কি বিগড়ে গেল, সাব্‌মেরিণটি একপাক ঘুরে গেল জলের মধ্যে।

চালক আর কোন আদেশের অপেক্ষা না করেই ট্যাংকগুলির ভাল্‌ভ্‌ খুলে দিলে। জাহাজ নীচে নামতে স্বরু করলো।

বুম্‌—বুম্‌—ভুস্‌স্‌—ভুস্‌স্‌—ছলাৎ—বুম্‌!

চারিপাশে ডেপ্‌থ্‌-চার্জ ফাটতে লাগলো, তবে এবার আর কোনটি প্রত্যক্ষ আঘাত করতে পারলো না তাই রক্ষা। কিন্তু খানিকটা জলে নামতেই দেখা গেল কনিং-টাওয়ারটা শুধু তুব্‌ড়েই যায় নি ভেঙ্গেও গেছে, কনট্রোল-রূমের ঢাক্‌নার ফাঁক দিয়ে ছল ছল করে ভিতরে জল ঢুকছে।

সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। সরোজ বললে—এখন উপায়?

চ্যাংশো বললে—এতটুকু জল যদি কোন রকমে ব্যাটারিতে ঢোকে তাহলেই হাইড্রোক্লোরিন গ্যাস জন্মে আমাদের সকলকেই আধঘণ্টার মধ্যে এই পৃথিবী থেকে ছুটি দিয়ে দেবে। ডুবে লুকিয়ে থাকার আর উপায় নেই। অর্থাৎ এখন দুটি মাত্র পথ খোলা আছে—হয় শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করা, না হয় শত্রুকে আক্রমণ করা, বেশ - বলে চারিপাশে সকলের উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে বললে—বন্ধুগণ, তোমরা কি চাও—শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করে কুকুরের মত বাঁচতে চাও, না শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে বীরের মত মরতে চাও?

—আমরা মুখোমুখি লড়াই করতে চাই—সমস্বরে উত্তর হোল।

—জাতির জন্য, মাতৃভূমির জন্য তোমরা প্রত্যেকে মরতে প্রস্তুত আছ ?

—প্রস্তুত আছি !

—ও. কে.—চ্যাংশো আদেশ দিলে—সার্‌ফেস্ ষ্টেশন ! তুসারি জাহাজের মাঝখান দিয়ে চালাও বরাবর বন্দরের দিকে—

তিমি মাছের মত সাব মেরিণটির কালো পিঠ জলের উপর ভেসে ওঠে, বরাবর অগ্রসর হতে থাকে বন্দরের দিকে। বহ্নিমান জাহাজের আলোয় স্যব্‌মেরিণটির গায় নিজেদের চিহ্ন ও সংখ্যা দেখে জাপানীরা বিমূঢ় হয়ে যায়—তাদের ডুবো জাহাজের উপরেই তারা ডেপ্‌থ্‌-চার্জ ছুঁড়ছে ! এমন ভুল যে একেবারে হয়না তা নয়, গত যুদ্ধে ইংরাজ ও ফরাসী নৌবহরের এমন অনেক ভুলের কথা জানা যায়। তারা আর একবার তার পুনরাবৃত্তি করলো !

সাব্‌মেরিণখানি যে চীনারা হস্তগত করেছে সে খবর তারা জানতো না।

নির্বিবাদে সাব্‌মেরিণটি তুসারি ডেষ্ট্রয়ার ও জাহাজের মাঝে এসে পড়লো। সরোজ আদেশ দিলে—চার্জ !

স্‌স্‌স্ স্‌স্‌স্ করে টর্পেডোগুলো পিছলে পড়তে লাগলো জলে, তীক্ষ্ণ তীরের মত ছুটে গিয়ে ফাটতে লাগলো দুপাশে জাহাজের গায়—বুম্ বুম্ বুম্ !

এবার জাপানী জাহাজগুলি চমকে উঠলো। যাদের গায় টর্পেডো ফাটলো তারা নিজেদের নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লো, অপর জাহাজ থেকে কামান দাগলো—বুমা বুম্, বুমা বুম্, বুম্ !

সরোজরা এজন্য তৈরীই ছিল, সরোজদেরও ডেকের উপর থেকে দুটি সাড়ে তিন ইঞ্চি কামান গর্জে উঠলো—বুমা বুম্, বুমা বুম্, বুম্ ! তার সঙ্গে জলের সমান্তরালে টর্পেডোও ছুটলো জাপানী জাহাজগুলির দিকে—স্‌স্‌স্ বুম্‌ম্ !

বিস্ফোরণ, বিস্ফোরণ, আর বিস্ফোরণ ! কাণ ফাটানো আওয়াজ ··চোখ ধাঁধানো আলোর জৌলুষ···গন্ধকের পীতাভ ধোঁয়া···কার্ডাইটের তীব্র গন্ধ ·· জলের ছিটা এসে লাগছে গায়···দু-একটী লোহা কাঠ কাচের টুকরোও মাঝে মাঝে এসে পড়ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওই কামানের গোলাটি এখনই বুঝি তাদের উপর এসে পড়লো। মৃত্যুর সঙ্গে যেন মুখোমুখি দেখা হচ্ছে প্রতিটি নিমেষে।

সরোজ বেপরোয়া কামান চালিয়ে যায়।

সারি সারি জাপানী জাহাজ, সোজাসুজি গোলা গিয়ে পড়ে একটির পর একটি। লক্ষ্য ঠিক করার জন্য সরোজকে এতটুকু কষ্ট স্বীকার করতে হয় না।

বুম্‌ম্‌—সামনের ডেষ্ট্রয়ারের একটি কামান একেবারে কাং হয়ে পড়লো, তিনজন গোলন্দাজ ছিট্‌কে গেল আঘাত পেয়ে।

বুম্‌ম্‌—পাশের জাহাজের একটি চিম্‌নী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বুম্‌ম্‌—ওদিককার জাহাজের উপর-ডেকের একটি অংশ ভেঙে পড়লো।

সরোজ আবার গোলা ছোঁড়ার আগে সামনের একখানি ডেষ্ট্রয়ার থেকে একটি গোলা এসে পড়লো একেবারে সরোজদের ডেকের উপর। তারপর আরেকটি। তারপর আবার, আবার। কামানের পাশে বারুদের বাক্‌সটায় দপ করে আগুন জ্বলে উঠলো; পরক্ষণেই আরো কয়েকটি গোলা সাব্‌মেরিণের ডেকটিকে বিধ্বস্ত করে দিলে। দেখতে দেখতে সমগ্র সাব্‌মেরিণটি একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হোল। বারুদের বাক্‌সগুলি বুম্‌ বুম্‌ করে ফাটতে সুরু করলো। কোথায় কি ভেঙে পড়লো, কে যে কোথায় গেল, কি যে হোল, কিছুই আর ঠিক রইল না। শুধু সাব্‌মেরিণের প্রত্যেকটি মানুষ ক্ষণেকের জন্য মৃত্যুকে উপলব্ধি করলো। আর বাহিরে থেকে দেখা গেল একটা ভয়ানক প্রচণ্ড দুর্যোগ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আগুনের স্পর্শ পেয়ে ইঞ্জিনটি ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হোল। সাব্‌মেরিণটা দু'টুকরো হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে ডুবতে সুরু করলো।

তিনখানি বহ্নিমান জাহাজ তখনও জ্বলতে থাকে। সেই রক্তিম আভায় লাল জলের বুকে খানিক পরে সাব্‌মেরিণের আর চিহ্নমাত্র দেখা যায় না, শুধু সাব্‌মেরিণটির জায়গায় ভেসে-ওঠা একরাশ তেলের উপর রামধনুর রঙ ফুটে ওঠে। আর দেখা যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ছিন্নভিন্ন দেহ। মনে হয় ওদেরই খুনে বুঝি সাগরের জল লাল হয়ে উঠেছে।

—শেষ—

এই লেখকের অন্যান্য বই

কিশোর গ্রন্থাবলী ১ম—	২৲
কিশোর গ্রন্থাবলী ২য়—	১৷০
আমাদের গান্ধিজী—	৩৲
স্বাধীনতার সংগ্রাম—	৩৲
পৃথিবীর ইতিহাস—	১৲
বিশ্ব-সাহিত্য—	১৲
কমরেড লেনিন—	২৲
প্রিয়দর্শী অশোক—	৸০
আবিসিনিয়া ফ্রণ্টে—	১৷৷০
মহানগরীর পথ—	১৲
তন্ত্র-গুম্ফা—	৸
আফ্রিদী সীমান্তে—	৸
চক্রান্ত— ...	৸
ষ্ট্যালিনগ্রাড—	৸
যত রাজ্যের রূপকথা—	১৷
গল্প হলেও সত্যি ১ম—	
গল্প হলেও সত্যি ২য়—	
এই দেশেরই মেয়ে—	১৲